রবীন্দ্রনাথ: কাব্য বিচারের ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের উপর একটি পরিকল্পিত বিস্তৃত আলোচনার মুখবন্ধ স্বরূপ। গ্রন্থটি মুখে-মুখে বলা, যার ফলে কোথাও কোথাও বক্তব্যের অহেতুক বিস্তার ঘটেছে। সময়ের অভাবে মুদ্রণকালে পরিমার্জনা করা সম্ভবপর হয়নি।

মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দ-ব্যবহারের বিচিত্র তাৎপর্য পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিলো। সে-সূত্রে রবীন্দ্রকাব্যের বিষয়-বৈচিত্র, ভারতীয় প্রাচীন কাব্য-ধারার সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং এতদসম্পর্কিত অন্যবিধ আলোচনাও এসেছে।

সমগ্র আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক কবি-কর্মের ভূমিকা-স্বরূপ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় — সৈয়দ আলী আহসান

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র সেন
শ্রদ্ধাভাজনেষু

রবীন্দ্রনাথ

⊙

কাব্য-বিচারের ভূমিকা

১

যে কবি মহৎ কবি বলে স্বীকৃত এবং সর্বত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চিত সে কবির কাব্য পরীক্ষা করা দুরূহ কর্ম। কাব্য পরীক্ষা একটি বিচার, একটি মীমাংসা এবং শব্দ-প্রয়োগ-বিধির মধ্যে জীবনের অবস্থিতি আবিষ্কার। যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি তাকে মূলতঃ শ্রদ্ধার সঙ্গে দূরেই সরিয়ে রাখি। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই দেব-বন্দনার স্তোত্রের মতো। মনে রাখতে হবে যে কবি মহাপুরুষ নন, দেবতা নন অথবা ভগবানও নন সুতরাং বিশ্লেষণ-পরাঙ্মুখ হয়ে কবিকে আবিষ্কার করা যায় না। কবিকে আবিষ্কার করতে হবে তাঁর শব্দ-প্রয়োগের মধ্যে যে শব্দ-প্রয়োগ দ্বারা তিনি একটি রসাবেশ সৃষ্টি করেছেন। বিদেশে কবিকে একই সঙ্গে শিল্পী এবং স্রষ্টা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। তাই শিল্পীর দক্ষতা পরীক্ষা করতে তাঁদের কখনও দ্বিধা হয় না। রবীন্দ্র-আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাংলা ভাষার একজন কুশলী কবি। সুতরাং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে হবে। বক্তব্যের দ্বারা কবির রহস্য নির্ণয় করা যায় না অথবা কবিতার তাৎপর্য আবিষ্কার করা যায় না, বক্তব্যের যা আলম্বন অর্থাৎ যাকে অবলম্বন করে বক্তব্য অভিষিক্ত হয়েছে সেই শব্দকে পরীক্ষা করেই কবিতার তাৎপর্য নির্ণয় করতে হয়। যেমন দেহকে অগ্রাহ্য করে চিত্তের স্থিতি নেই তেমনি শব্দকে অগ্রাহ্য করে বাণীর প্রকাশ নেই। গৌতম বুদ্ধ দেহ এবং চিত্তকে 'পরস্পরসাপেক্ষ বলেছেন। তিনি বলেছেন যে দেহ হচ্ছে চিত্তের আলম্বন এবং চিত্ত হচ্ছে দেহের আলম্বন। বস্তুতঃ এই আলম্বন গ্রহণ এবং তার প্রতি চিত্তের ধারণার উপরই চিত্তের কুশলাকুশল নির্ভর করে। বুদ্ধের বিবেচনায় চিত্ত রূপ, শব্দ এবং গন্ধের অবলম্বনে উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, চিত্তের অনুভূতি দেহের উপর নির্ভরশীল আবার দেহের বিবিধ প্রকার বিবেচনাও চিত্তের অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন দেহ এবং

চিত্ত, কবিতার ক্ষেত্রে তেমনি শব্দ এবং ভাব, অর্থাৎ শব্দকে অবলম্বন করেই ভাবের উৎপত্তি এবং শব্দকে সর্বতোভাবে গ্রাহ্য করেই ভাবের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ তদগত কবি ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সজাগ কুশলী শিল্পী ছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরীক্ষা করতে যেয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কবিতা শব্দ ব্যবহারের কৌশল এবং দক্ষতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই পরীক্ষা দ্বারাই আমরা প্রমাণ করতে পারব যে রবীন্দ্রনাথ কবিতার ক্ষেত্রে যথার্থ অসাধারণ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচারের পূর্বে আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে যে তিনি মানব জীবনের উন্মোচন, বিকাশ এবং জীবন-যাত্রায় প্রকৃতির দাক্ষিণ্যকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করেছিলেন। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই সজীব এবং প্রাণবন্ত। শৈশবে যে পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন সে পরিমণ্ডল তাঁকে শিখিয়েছিল যে সকল প্রাণী, মাটি, বৃক্ষলতা, আকাশ এবং বৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে জীবন্ত থাকে। এই বাণী তিনি পেয়েছিলেন বেদ এবং উপনিষদ থেকে। বেদের সকল স্তোত্রই হচ্ছে প্রকৃতির বন্দনা, যেমন অগ্নির বন্দনা, বৃষ্টির বন্দনা, সমুদ্রের বন্দনা। বেদে অগ্নির শুধু যে দাহিকা শক্তি আছে তাই নয়, রাত্রিকালে অগ্নি শোভনরূপ বিশিষ্ট এবং ঊষাকালে অভিমানী এবং বেদে বলা হয়েছে যে অগ্নি হচ্ছে সকল যজ্ঞের দীপ্যমান সম্পাদক। জলের কথা বলা হয়েছে যে জলে অমৃত আছে এবং ঔষধ আছে। অতএব হে ঋত্বিক সকল আপনারা সত্বর হোয়ে জলের স্তুতি করুন। আরো বলা হয়েছে, যেমন সারথি পরিশ্রান্ত অশ্বকে ঘাস, জল প্রভৃতি প্রদান করে পরিতৃপ্ত করে তেমনি প্রসাদ-আকাংখায় স্তোত্র দ্বারা বরুণ দেবকে প্রশংসা করতে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের নিবিড়তা এ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে আমরা আমাদের শরীরের সমস্ত বর্ণ পশুপক্ষী এবং বৃক্ষলতায় স্থাপন করেছি। এক কথায় বলা যায় যে বেদের বক্তব্য হচ্ছে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের কোনও অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ জন্ম-সূত্রেই বেদের মন্ত্রকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক পরীক্ষায় দেখা যাবে যে শৈশব থেকে বেদ, উপনিষদ এবং সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ়-তম সম্পর্ক ঘটেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সম্পর্কের স্বাদকে

রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, এ কথা বললে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল্যায়ন করা হয় না, তার কারণ তিনি প্রকৃতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নি। মনে রাখতে হবে যে, যে প্রকৃতি জীবনের উৎস মূল, সেই উৎসমূলকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করতে গিয়েছিলেন এ দিক থেকে তিনি বৈদিক ঋষির মত।

স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ও রূপময় এই পৃথিবীর আরম্ভ থেকে বতমান সময় পর্যন্ত যে বিচিত্র কুশলতায় প্রকৃতি অজস্র ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল, কবি তাঁর জীবনের প্রথম সজাগ দৃষ্টিপাতে সেই ঐশ্বর্যকে অবলোকন করেছিলেন। এই ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে বৃক্ষলতা, নদী, পাহাড়, আকাশ এবং এদের বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাসে। সৃষ্টির এই যে শোভা, এই শোভার মধ্যে মানুষের একটি অংশ আছে— মানুষ এই শোভার সঙ্গে সংযুক্ত, সে এই শোভাকে অবলোকন করে এবং তার মাধুর্য নির্ণয় করে, এই শোভায় শোভমান হয়ে সে তার জীবনকে পরিদৃশ্যমান করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একে বলেছেন যে একটা বিশেষ সৃষ্টিধর্মে প্রকৃতি বহু বিচিত্র রূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু অন্তরে তার প্রকাশ যখন অনুভব করবার চেষ্টা করি তখন একটি মাত্র অস্তিত্বের সাড়া পাই। এই অস্তিত্বই কবির প্রেরণা এবং পরম দেবতা। এই বোধও রবীন্দ্রনাথের এসেছিল বেদ এবং উপনিষদ থেকে যেখানে সমস্ত পুণ্যের মূলে একটি বিরাট সত্তা জাগ্রত, তা হচ্ছে পৃথিবীর বিচিত্র অস্থির অস্তিত্বের মধ্যে যিনি নিত্য তাঁকে অনুভব করা।

এই বোধও এসেছে একদিকে যেমন বেদ অধ্যয়ন থেকে অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতির বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করে। এই বিপুল পৃথিবীর অস্থির পরম্পরার মধ্যে একটি নিত্যের চির প্রকাশ আছে তা হচ্ছে আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের কবি-কীর্তিতে এই নিত্যকে আবিষ্কারের বহুবিধ কৌশল আমরা লক্ষ্য করি। দেবালয় যেমন মানব-সত্তাকে মুছে দেয়না, তেমনি নিত্যও অস্থিরকে মুছে দেয় না। এদের উভয়ের মধ্যে একটি নিবিড় সংযোগ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বিচারে অন্য একটি তথ্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, তা হচ্ছে অনুভূতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থের আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আমাদের সজীব দেহ কতকগুলি বোধের

শক্তি নিয়ে জন্মেছে, যেমন দেখার বোধ, শোনার বোধ, ঘ্রাণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পর্শের বোধ, এই গুলিকে বলে অনুভূতি। এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভাল মন্দ লাগা, আমাদের সুখ-দুঃখ।" যে কোনও কবির জন্য অনুভূতির সব কটি স্তরই গুরুতর ভাবে প্রয়োজন। এই অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করতে পারেন বলে একজন কবি কবি। যদি প্রকাশ করতে না পারতেন তবে কেউ কবি হতে পারতেন না। আমাদের এই দর্শনের অনুভূতি, শ্রবণের অনুভূতি, ঘ্রাণের অনুভূতি, স্বাদের অনুভতি এবং স্পর্শের অনুভূতি একত্র করে আমরা কবি। "আমাদের চোখ আছে বলে আমরা দেখতে পাই এবং সে দেখাকে চিত্তে লালন করি এবং অবশেষে বোধের সমগ্রতায় তাকে প্রকাশ করি। সুতরাং কাব্য-সৃষ্টিতে নয়ন-প্রসাদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পাই বলেই আমরা সচেতন এবং দেখতে পাই বলেই আমরা কুশলী নির্মাতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের বিপুল সম্ভারের মধ্যে এই দেখার উপঢৌকন এনেছেন বহুবার বিচিত্রভাবে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে আমি রবার্ট ফ্রষ্ট-এর একটি কবিতার উল্লেখ করতে চাই, যেখানে প্রবল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই দেখার উপর—সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে দেখা এবং সকল চেতনাকে একাগ্র করে দেখা। কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে:

He saw her from the bottom of the stairs
Before she saw him. She was starting down,
Looking back over her shoulder at some fear.
She took a doubtful step and then undid it
To raise herself and look again. He spoke
Advancing toward her : "What is it you see
From up there always—for I want to know".
She turned and sank upon her skirts at that,
And her face changed from terrified to dull.
He said to gain time : 'What is it you see ?'
Mounting until she cowered under him,
"I will find out now—you must tell me, dear."
She, in her place, refused him any help
With the least stiffening of her neck and silence.
She let him look, sure that he wouldn't see
Blind creature ; and a while he didn't see.
But at last he murmured, "Oh", and again,
"Oh".
"What is it—what ?" she said.
"Just that I see."

কবিতাটি সদ্য সন্তানহারা জনক-জননীর বেদনা দ্বারা অভিষিক্ত। কবিতাটিতে কবি একটি বিপুল বেদনার মধ্যে একটি একাগ্র অবলোকনকে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুবিধ কবিতায়, বিশেষ করে "সোনার তরী", "চিত্রার" যুগে সব কিছুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পরীক্ষা করবার সময় আমাদের বস্তু নির্ণয়ে কবির এই বিশেষ কৌশলকে অনুভব করতে হবে। একটি গানে কবি বলেছেন "যখন থাক আঁখির কাছে তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভ'রে আছে"। একটি কবিতায় বলেছেন:

"তব স্পর্শ, তব প্রেম, রেখেছি যতনে—
তব সুধাবাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি সব দেহমন
পূর্ণ করি, রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি, বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালিয়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে।"

রবীন্দ্রনাথের কবি চেতনায় সমকালীন অপেক্ষা চিরকালীন বোধ প্রবল। কবি যদি বিশেষ সময় এবং কালের পরিধিতে যে সমস্ত চৈতন্য বর্তমান, সেগুলোকে অতিক্রম করে চিরায়ত কতকগুলি অনুভূতিকে লালন করেন তবে আমরা বলতে পারি যে কবি সমকালীন চৈতন্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে একটি সর্বকালীন চৈতন্যকে ঘোষণা করেছেন। কথাটি আর একটু স্পষ্টভাবে বলা দরকার। মানুষের মধ্যে জীবন এবং জগৎ সম্পর্কিত যে সমস্ত বোধ আছে সেগুলি একই সঙ্গে সনাতন এবং সাময়িক। সনাতন বোধের দ্বারা মানুষ সর্বযুগের সর্বকালের মানুষের সঙ্গে একত্রিত হচ্ছে আবার প্রাত্যহিক জীবনের সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে সেই বোধ একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ চৈতন্যের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে। যেমন মাতৃস্নেহ অথবা নরনারীর প্রেম, এগুলো একই সঙ্গে সনাতন এবং সাময়িক। মাতৃস্নেহের অনিবার্যতা এবং সর্বকালীনতার কথা আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, আবার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ, মাতৃস্নেহ বিশেষ পরিবেশে বিশেষ অর্থবহ হয়ে

দাঁড়ায়, অর্থাৎ মাতৃ-স্নেহের একটি প্রকাশ্য আচরণীয় দিক আছে, আবার অপ্রকাশ্য অনুভূতির দিক আছে। তেমনি নরনারীর প্রেমের যেমন একটি প্রকাশ্য বিশেষ দেশীয় আচরণীয় দিক আছে, তেমনি অপ্রকাশ্য সর্বকালীন দিক আছে। রবীন্দ্রনাথ মানবানুভূতির এই সর্বকালীন তাৎপর্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কবি-প্রাণের যে অবাধ স্ফূর্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেই অবাধ স্ফূর্তির উৎস-মূলে আমরা বিশেষ দেশের অথবা অঞ্চলের মনুষ্য জীবনের সাধারণ কর্মচৈতন্যকে পাইনা। আমরা সেই ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অলৌকিক ভাবাবস্থা আবিষ্কার করি। আরো স্পষ্টভাবে কথাটা ব্যাখ্যা করলে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-জীবনের গণ্ডি এবং সংসারের দ্বারা বিচলিত না হয়ে একটি বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন যে সত্য অবিনশ্বর, সুন্দর এবং সর্বসময়ের, অর্থাৎ তিনি অন্তরের মধ্যে একটি উপলব্ধিকে জাগ্রত রাখতে চেয়েছেন যে উপলব্ধি হচ্ছে কবির "একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত গগনে" অথবা "নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি"। রবীন্দ্রনাথের সর্বকাব্যব্যাপী চিরকাল একই একাগ্র লক্ষ্য, একটি বিশেষ তন্ময়তার মধ্যে রূপ-সৃষ্টির প্রয়াস। যে কথা তিনি একটি কবিতায় বলেছিলেন "মনে হলো সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা বলিবারে"। এই ভাবে সর্বকালীন বোধকে প্রকাশ করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনও কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, কখনও রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন, কখনও স্বপ্নের, কখনও রহস্যের। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের সব সময় চেষ্টা ছিল সর্বজনীন মানব-প্রাণের নিগূঢ় চৈতন্যের উদ্বোধন করা। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতায় আমরা বিশেষ কোনও মাতৃ-মূর্তি পাইনা অথবা বিশেষ কোনও প্রেমিক বা প্রেমিকাকে পাইনা, আমরা তার পরিবর্তে পাই নিখিল মানব প্রাণের অপূর্ব অনুভূতি--রসসঞ্জাত মূর্তি। এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাব অথবা কবি প্রকৃতি। এই কবি স্বভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি কখনও কোনোও বিশেষকে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেননি, তিনি চেষ্টা করেছেন নির্বিশেষকে কল্পনায় একটি দিব্য মূর্তি দান করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে। ইংল্যাণ্ডের রোমাণ্টিক কবি-স্বভাবের যা বৈশিষ্ট্য, অজ্ঞাতকে তাৎপর্যময় করা অথবা অনুভূতির স্বাদকে নির্মাণ করা, রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য তাই। এর ফলে কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল এবং পার্টিকুলার-এর মধ্যে যে বিবদ-

মান অবস্থা তা থেকে কবি মুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ কবি শান্ত নিশ্চিন্ততায় ইউনিভার্সালকে আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। আদি নেই, অন্ত নেই, অপরিসীম পরিপূর্ণতার যে অতলতা রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা সেই অতলতাকে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছে। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের আবেগগুলো সর্ব-মুহূর্তেই দেশ-কালের অতীত হতে চেয়েছে, বিশেষ করে কতকগুলো বিশিষ্ট মানববোধের ক্ষেত্রে, যেমন, মমতা, প্রেম, হিংসা ইত্যাদি। এককালে প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ সৌভাগ্যের উচ্ছলতায় মানববোধগুলোকে যেভাবে বিশিষ্টের দ্যোতনা-মুক্ত করে সর্বকালীনতায় উজ্জীবিত করেছিলেন, রবীন্দ্র-নাথের কবি-কীর্তিতেও তারই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেভাবে উনিশ শতকের নতুন চেতনার জয়ধ্বনি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর কবিতায় সেই রকম কোনও যুগের জয়ধ্বনি করেননি—তিনি জয়ধ্বনি করেছিলেন সর্বকালীন কতকগুলি চৈতন্যের, যার ফলে তিনি অতি সহজেই অংশীদার হয়েছিলেন মধ্যযুগের বৈষ্ণব চেতনার রূপকের এবং সমগ্র বাংলা কাব্যের অতীতের।

একটি ভাষার কাব্যধারায় কোনও কবিই একাকী নন অর্থাৎ উক্ত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনও কবিকেই বিশ্লেষণ করা চলেনা। তাঁর বিশিষ্টতা, তাৎপর্য এবং শ্রোত্রবোধ যে ভাষার তিনি কবি সে-ভাষার অতীতের সকল কবিদের কাব্যকীর্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। ইতিহাসের দিক থেকেই এ সম্পর্ক নয়, কবিতার সৌন্দর্যবোধের দিক থেকেও এ সম্পর্ক নিগূঢ়। যখনই একটি ভাষায় একজন মহৎ কবির আবির্ভাব ঘটে তখনই সঙ্গে সঙ্গে নতুন নিরিখে অতীতের প্রধান প্রধান কবিদের মূল্যায়ন আরম্ভ হয়। বাংলা কবিতায় একবার বিরাট চাঞ্চল্য এসেছিলো মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবের সময়। মধুসূদনের কাব্য পাঠ করে আমরা নতুন তাৎপর্যে কৃত্তিবাসকে আবিষ্কার করেছিলাম, আরও আবিষ্কার করেছিলাম নতুন লালিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তাদের। মধুসূদনের শব্দ-ব্যবহার, উপমা রূপক প্রয়োগ বাংলা কবিতার জন্য বহুলাংশে নতুন ছিল। এই নতুনত্বের স্বাদ পেয়ে আমরা পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে মধু-সূদনকে অতীতের কবিদের সঙ্গে তুলনা করেছি। এই তুলনায় অতীতের কবিরা নতুন বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন, যার ফলে সমগ্র বাংলা কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের নতুন বিবেচনা আরম্ভ হয়েছিল। বিশেষ করে কৃত্তিবাসের

রামায়ণ যা এতদিন পর্যন্ত বটতলার পুঁথি হিসাবে গ্রাহ্য ছিল মধুসূদনের আবির্ভাবের পর তা নতুন তাৎপর্যে উন্মোচিত হোল। এভাবে "ব্রজাঙ্গনা" সৃষ্টির ফলে বৈষ্ণব পদাবলী নতুন আলোকে উদ্‌ভাসিত হোল। আমরা শ্রী রাধিকাকে আরো অন্তরঙ্গভাবে পেলাম অথবা বলা যায় একটি নতুন পরিমণ্ডলের মধ্যে পেলাম। ঠিক এইভাবে রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে নতুন শক্তি নিয়ে প্রকাশিত, তখন রবীন্দ্রনাথের কারণে সমগ্র বাংলা কবিতায় একটি নতুন বিবেচনা আরম্ভ হোল। আমরা বৈষ্ণব গীতি-কবিতাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। সংস্কৃত কাব্যও নতুনভাবে রূপময় হোল। একে টি. এস. ইলিয়ট বলেছেন, "What happens when a new work of art is created is something that happens simultaneously to all the works of arts which preceded it. The existing monuments form an ideal order among themselves, which is modified by the introduction of the new, "the really new" work of art among them. The existing order is complete before the new work arrives : for order to persist after the supervention of novelty, the whole existing order must be, if ever so slighty, altered ; and so the relations, proportions, values of each work of art toward the whole are readjusted : and this is conformity between the old and the new."

অর্থাৎ যখন একটি নতুন শিল্প সৃষ্টি হয় তখন এই শিল্পের পূর্ববর্তী সকল শিল্পের মধ্যে একই সঙ্গে একটি নতুন কিছু ঘটে। এতদিন যা ছিল একটি বিশেষ শৃংখলা এবং বিবেচনার মধ্যে আবদ্ধ, সেখানে নতুন একটা কিছু সংযোজনার ফলে এতদিনের শৃংখলার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসতে বাধ্য। নতুন সৃষ্টি যতদিন আসেনি ততদিন একটি বিশেষ শৃংখলিত ধারাক্রম ছিল, নতুন শিল্প সংযোজনার ফলে ধারাক্রমের অল্প কিছু পরিবর্তন ঘটবেই। এই ভাবে নতুন এবং পুরাতনের মধ্যে নতুন মূল্যায়ন হয়ে নতুনভাবে তুলনা আরম্ভ হয় এবং প্রতিটি শিল্প-সামগ্রীর নতুন তাৎপর্য আবিষ্কৃত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ফলে বাংলা কাব্যে এই বিপুল প্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের কারণে আমরা আমাদের কাব্যের অতীতকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করলাম এবং

কবিতার যে স্রোতোধারার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল সেই স্রোতো-ধারায় আবার নতুন করে প্রবাহিত হলাম। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বিচারের সময় সমগ্র বাংলা কাব্যের অতীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে। এই সম্পর্ক নির্ণয় না করে রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে বিবেচনা করা সম্ভবপর হবেনা। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা কবিতার অতীত সম্পর্কে আমরা যথার্থরূপে সজ্ঞান ছিলাম না। এই অতীত এক একটি রূপমণ্ডলে আমাদের সামনে আবির্ভূত হতো, আমরা সমগ্রভাবে আমাদের কাব্যের অতীতকে প্রত্যক্ষ করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠের ফলে আমাদের মানসলোকের পরিবর্তন ঘটল এবং আমরা সমগ্র বাংলা কাব্যকে একটি ক্রমধারার মধ্যে আবিষ্কার করতে শিখলাম। এটা সত্য যে যুগে যুগে ভাষার পরিবর্তন ঘটে, এটা অধিকতর সত্য যে যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটে, এক যুগে যা গ্রহণযোগ্য এবং রুচিসম্মত, অন্য যুগে তা হয়তো নীতি বিরোধী কিন্তু তৎসত্ত্বেও একট ভাষার কাব্যধারার অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত একটি নিগূঢ় রহস্যময় সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক কবিতার ধ্বনির সাহায্যে নির্মিত কাব্যের মানস প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠের ফলে আমাদের কাব্য-বোধের প্রসার ঘটেছে। আমরা পূর্বে যে সমস্ত চিন্তা এবং আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠের ফলে সেই আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হলাম। এই যে নূতন করে আমাদের মধ্যে একটি বোধের প্রসারতা ঘটলো এটা ঘটলো রবীন্দ্রনাথের কারণে। এর ফলে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অতীতের কাব্যধারার সম্পর্কে আমাদের বিবেচনার আমূল পরিবর্তন হোল। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাংলা কাব্যের উপর এইভাবে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিবেচনার অন্য একটি উপায় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অপরিমিত গানের সম্ভারকে তার কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে পরীক্ষা করা। সুরে এবং শব্দে তাঁর গানগুলির মধ্যে তিনি তাঁর কবি-হৃদয়কে যেভাবে উন্মোচিত করেছিলেন অন্য কোনও সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিজেকে সেভাবে উন্মোচিত করেননি। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতকে আমরা বিবেচনায় আনিনা। রবীন্দ্র-নাথ নিজেকে অত্যন্ত সহজে এবং নিশ্চিন্তে গানের মধ্যে প্রকাশিত রেখেছেন

যার ফলে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের অন্তরঙ্গ সুর তাঁর গানের মধ্যে আমরা ব্যাপকভাবে পাই। বিশেষ করে প্রেমমূলক গানের মধ্যে এটা অসম্ভব সত্য। এমনিতে প্রেমের কবিতা অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত, অনেক সময় আচ্ছন্ন, কিন্তু গানের কল-গুঞ্জনের মধ্যে তাঁর কবি-চিত্তের উন্মোচন অত্যন্ত ঐকান্তিক এবং সত্য। তিনি তাঁর গানের মধ্যে যে রাগিনী নির্মাণ করেছেন সে রাগিনী প্রাণের ঐকান্তিক রাগিনী। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিবেচনা করতে যেয়ে তাঁর গানের এই সম্পদকে আমরা যদি বিবেচনায় না আনি তাহলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিবেচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথের গান শুধু সুর নয়, রবীন্দ্রনাথের গান একই সঙ্গে সঙ্গীত এবং বাণী। সুরকে তিনি শব্দের মধ্যে আবর্তিত করেছেন আবার শব্দকে সুরের দ্বারা সচকিত করেছেন। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের গান মূলত রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ। অবশ্য ধ্রুপদী রাগ-রাগিনীর উপর রচিত রবীন্দ্রনাথের গানের সম্ভার যে নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় ততটা নয় যতটা রবীন্দ্রনাথের বাণীপ্রধান গানগুলো। রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা আমাদের প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করি। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত যে মানব-জীবনধারা সেই জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ করি এবং মানবের প্রতিদিনকার আশা আকাংখা এবং নিবেদনকে প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মনকে তাঁর গানের মধ্যে একাকার করতে চেয়েছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতা অপূর্ব। প্রথম জীবন থেকে সুরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবল আকর্ষণ ছিল। সঙ্গীতের অনুশীলন তো তাঁদের পারিবারিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত ছিল। এবং প্রথম জীবনে প্রতিদিন তিনি একটি সঙ্গীতের পরিমণ্ডলের মধ্যে জেগে উঠতেন। এর ফলে আমরা লক্ষ্য করি যে তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা মূলত ধ্বনিপ্রধান। 'ভানুসিংহের পদাবলী' এবং 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে' এই ধ্বনির বিচিত্র কল্লোল আমরা অনুভব করতে পারি। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ধ্বনি-সম্পদ আছে এবং একটি ভাষার কাব্য-সৌন্দর্য পরীক্ষা করতে গেলে সে ভাষার ধ্বনিগত তাৎপর্যকে নির্ণয় করতে হয়। কবি মধুসূদন তাঁর কালে বাংলা ভাষার একটি বিশেষ ধ্বনি-মাধুর্য আবিষ্কার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সময় নতুন করে বাংলা শব্দের ধ্বনি-মাধুর্য আবিষ্কার করেছিলেন যার ফলে 'ভানুসিংহের পদাবলী' অথবা

'সন্ধ্যা সঙ্গীত' অথবা 'প্রভাত সঙ্গীত' কুশল কাব্য-সৃষ্টি হিসেবে যতটা দুর্বল হোক না কেন সুর-মাধুর্যের দিক থেকে এগুলোকে কোনও ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ধ্বনির সচেতনতা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি এবং এই ধ্বনির মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বাংলা কবিতার সঙ্গে একটা বিশেষ প্রাণ-চৈতন্যে সম্পর্কিত। প্রাথমিক পর্যায়ে লক্ষ্য করি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দগুলো অপরিচিত কোনও অভ্যাগত নয়, তারা একটি পরিচিত আত্মীয়লোক থেকে এসেছে। কবিতার ভাষাকে একজন সমালোচক প্রাথমিক পর্যায়ে primitive language বলেছেন বা আদিম ভাষা। এই আদিম ভাষার স্বভাব হচ্ছে কল্পনার উপর নির্ভরশীলতা, যুক্তির উপর নয়। ভাষা তার আদিমতায় সব কিছুকেই ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে চায়। তাই তখন ভাষা বিশিষ্ট অর্থদ্যোতক না হয়ে সাধারণ অর্থদ্যোতনা বহন করতে যেয়ে তার আদিম রূপে অতীতের সঙ্গে অতি সহজেই সম্পর্কিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কাব্যধারার মধ্যে এই সম্পর্কটি অত্যন্ত উজ্জল। ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথ শব্দের এই আদিম বন্ধন থেকে বেরিয়ে এলেন অনবরত নতুন নতুন শব্দ গ্রহণ করে এবং নতুন ভাবে উপমা রূপককে নির্মাণ করে, যার পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'চিত্রা' থেকে আরম্ভ করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের এই আদিম ভাষা যা অতীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে সম্পর্কিত করেছিল সেই আদিম ভাষার প্রবাহ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ দূরে কখনও সরে যাননি। এই ভাষার অনুকরণ তাঁর শেষ দিককার রচনার মধ্যেও স্পষ্ট। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য-ধারার ঐতিহ্যের সঙ্গে একটি আদিম সুরমূর্চ্ছনায় সম্পর্কিত। তাই কবিতা ও গানের ছন্দ ও সুরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বাংলা কাব্যধারার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত পাব।

কবিতায় সর্বকালীনতা বস্তু কি তা ব্যাখ্যা করা খুব সহজ নয়। তার কারণ যে কোনও বোধ, বিশিষ্ট একটি চেতনা হতে উদ্ভূত হয়ে সর্বকালীন চেতনায় রূপান্তরিত হয়, আবার সর্বকালীন চেতনাকে অবলম্বন করে একটি সবজন-গ্রাহ্য বোধ নির্মাণ করা যেতে পারে। আর একটু ব্যাখ্যা করলে কথাটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। আমি যদি বলি গোলাপ সুগন্ধ ছড়ায় তাহলে কথাটি কোনও বিশিষ্ট বোধের বিজ্ঞপ্তি আনল না। তার

কারণ কথাটি যেমন গোলাপের জন্যও বিশিষ্ট নয় তেমনি সুগন্ধের জন্যও বিশিষ্ট নয়। গোলাপের পরিবর্তে অন্য কোনও ফুলের নাম দিলেও চলতো। অথবা ধরা যাক রংএর কথা। অশোক পুষ্প লাল আমরা জানি। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখলেন "হে অশোক কোন রাঙ্গা চরণ চুম্বনে। মর্মে মর্মে শিহরিয়া হলি লালে লাল।" চরণ দুটিতে বিশিষ্ট কোনও বর্ণের দ্যোতনা নেই অথবা অশোক পুষ্পকে অন্য কোনও পুষ্প থেকে বিচ্ছিন্ন করে চেনা যায় এমনি কোনও ইঙ্গিত এখানে নেই। অশোকের পরিবর্তে অন্য কোনও ফুলের নাম করলেও চলত। এ সমস্ত উক্তি বিশিষ্ট কোনও দ্যোতনা আনেনা এবং এগুলো সঙ্গে সঙ্গে সর্বকালীন কিছু ভাবের প্রকাশ ঘটায়। এভাবে বিশিষ্টতা এবং সর্বকালীনের মধ্যে সহজেই পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। একজন কবি একটি বনভূমিতে অনেক গাছ দেখতে পান যেমন আমরা দেখতে পাই। তিনি সেখানকার একটি গাছের বর্ণনা দিতে পারেন যে গাছটি অন্য সকল গাছের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হবে। আবার কবি ইচ্ছে করলে বনভূমির একটি বিশেষ গাছকে অন্য গাছগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তার প্রতিনিধিত্ব দূর করে তাকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করতেও পারেন। একজন কবি গাছকে প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করলেন এবং অন্যজন একটি গাছকে বিশিষ্টরূপে আবিষ্কার করলেন। এই দুই বিবেচনার মধ্যে চিরকাল একটি পার্থক্য থাকবেই। আমাদের বাংলা কবিতায় বিশিষ্টের চাইতে প্রতিনিধিত্ব রূপের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এর ব্যতিক্রম নেই। শুধু বস্তু বর্ণনার ক্ষেত্রেই যে এই প্রতিনিধিরূপ প্রবল তাই নয়। মানবজীবনে কতকগুলি অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সর্বকালীন ও সর্বদেশের সাধারণ চৈতন্যের দোসর হয়েছে।

কবি কীটস-এর যে দুটি কবিতা কাব্যক্ষেত্রে বিশেষ ও নির্বিশেষ, বিপরীতধর্মী এই দুটি আবেগকে প্রমাণ করবার জন্য উপস্থিত করা যায় তা হচ্ছে 'Ode to a Nightingale' এবং 'Ode on a Grecian Urn' প্রথম কবিতাটিতে একটি রহস্যময় রোমাণ্টিক বেদনাবৃত্তি আছে যেখানে কবির বক্তব্য কোনও বিশেষ পাখীকে নিয়ে নয় কিংবা বিশেষ কোনও সুরকে নিয়ে নয় কিন্তু সেখানে কবির বক্তব্য হচ্ছে মূলত তাঁর চিত্তের একটি বিশেষ অনুভূতির উদ্‌ঘাটন, যে অনুভূতি হচ্ছে একটি রোমান্টিক অনুভূতি যার কোনও দেশ কাল অথবা সময় নেই। কবিতাটির প্রারম্ভিক স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত করা যায়:

My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense. as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk :
'Tis not through envy of thy happy lot
But being too happy in thine happiness,—
That thou, light-winged Dryad of the trees,
In some melodious plot
Of beechen green, and shadows numberless,
Singest of summer in full-throated ease.

এখানে কবি একটি বিনম্র ক্লান্তিতে অভিষিক্ত চিত্তের পরিচয় উপস্থিত করেছেন। কবির ভাষায় "a drowsy numbness pains my sense।" কবির সমগ্র বক্তব্যটি কোনও বিশেষকে অবলম্বন করে নয়, বরঞ্চ একটি সর্বকালীন রহস্যময় ক্রম-অচৈতন্যতাকে অবলম্বন করে কবিতাটি একটা যুগের যৌবনের চিত্তদাহনের প্রতিনিধিত্ব করছে। কবিতাটির সৌন্দর্য সম্পর্কে আমরা সন্দিহান হইনা কিন্তু কবিতাটি কোনও বিশেষকে চিত্রায়িত করছেনা, অনবরত একটি নির্বিশেষকে আশ্রয় করতে চাচ্ছে। অন্য পক্ষে 'Ode on a Grecian Urn' একটি বিশেষকে নিয়ে লেখা এবং কবি তাঁর শব্দের মধ্যে একটি বিশেষকে নিগূঢ়ভাবে চিহ্নিত করে তাকে সর্বকালীন বোধের রাজ্যে উপনীত করেছেন। কবিতাটি গ্রীস দেশীয় একটি চিত্রিত মৃতের ভস্মাধারকে অবলম্বন করে লেখা, যার গাত্রে অনেকগুলো ছবি আঁকা আছে। কবি সেই ছবিগুলোকে বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোকে চিরকালীন রস-সম্পদ-যুক্ত করেছেন। তিনি নিগূঢ়ভাবে ভস্মাধারকে দেখেছেন এবং কবিতাটি পাঠ করলে একটি বিশেষ অবলোকন আমরা আবিষ্কার করি। কবিতাটির এক জায়গায় তিনি বলেছেন "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter।" এ কথাটি যদিও দেশকাল অতিক্রান্ত একটি সর্বকালীন বোধের পরিচয় বহন করে তবু মনে রাখতে হবে, যে সত্য থেকে তিনি এ বোধে উপনীত হয়েছেন সেই সত্য বিশিষ্টার্থক। ভস্মাধারের গায়ে উৎকীর্ণ বাঁশরী বাদকের ছবি থেকে কবি এ কথাটি বলেছেন। কবির একটা বিশেষ দেখা একটি সর্বকালীন চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

কবিতাটির অন্য এক জায়গায় কবি একটি প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে একটি চিরকালীন প্রেমময়তার স্বাদ উপস্থিত করতে চেয়েছেন। ভস্মাধারের গায়ে উৎকীর্ণ প্রেমিক যুগল তাদের প্রণয়-লিপ্সাকে চরিতার্থ করতে পারছেনা—চরিতার্থতার পথে তারা অগ্রসর হয়েছে মাত্র। এই চিত্র থেকে কবি বলেছেন যে তারা অনন্তকাল ধরে এ অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ প্রেমের যে শাশ্বত রূপ তা তিনি একটি আকাংখার মধ্যে চিহ্নিত দেখতে পেয়েছেন। এভাবে বলা যায় যে, বিশেষ একটি পাত্রের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্র-দর্শনের বিশেষ ঘটনা থেকে কবি নির্বিশেষে পোঁছেছেন। এ ভাবে আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আমরা দেখতে পাব যে কবি কখনও নির্বিশেষকে অবলম্বন করে তাঁর অনুভূতির ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করতে পারেন, আবার কখনও বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষে পোঁছবার চেষ্টা করতে পারেন। এদুটি পদ্ধতি কাব্য ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার মধ্যে এই নির্বিশেষকে অধিকাংশ সময় অবলম্বন করেছেন এবং এই নির্বিশেষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাঁর সমস্ত বক্তব্য বিভিন্ন আবেগে অভিসিক্ত হোয়ে রূপলাভ করেছে। "বলাকা" কাব্যগ্রন্থের "চঞ্চলা" কবিতাটির কথা ধরা যাক। এখানে কবি একটি গতিশীল নদীকে উপলব্ধি করে একটি দ্রুত ধাবমানতাকে এবং সচলতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। নদীটি কোনও বিশেষ নদী নয়, নদীটি একটি বক্তব্যের উপলক্ষ মাত্র। কবিতাটির আরম্ভের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি।

"হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া ওঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে,
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদবুদের মতো।"

যে কোনও নদী অথবা স্রোতোধারা নিয়ে এ কবিতা রচিত হতে পারতো। এখানে নদীর বিশেষ কোনও পরিচয় নেই। কাব্য বিচারে নদী এখানে একটি গতিময়তার প্রতীক। যেমন কীট্‌স-এর 'Ode to a Nightingale' কবিতায় nightingale পাখী কোনও বিশেষ পাখী নয়, তেমনি এখানে কোনও নদী বিশেষ নদী নয়। যে কোনও নদী। এই নির্বিশেষকে গ্রহণ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি বিশ্বজনীনতার ব্যঞ্জনা এসেছে, রহস্য এসেছে এবং জীবনতত্ত্ব নির্মিত হয়েছে। অবশ্য কখনও কখনও তিনি বিশেষকে যে গ্রহণ করেননি তা নয়। সেখানে তাঁর কবিতার স্বাদ অন্য রকম। যেমন "পদ্মা" কবিতাটি—

"হে পদ্মা আমার
তোমায় আমায় দেখা কত শত বার"

কবিতাটিতে বিশেষ অনুভূতি চিত্রিত হয়েছে। কবির সঙ্গে পদ্মা নদীর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তিনি এই নদীর বুকে বহুবার বোটে করে বেড়িয়েছেন। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত তিনি দেখেছেন, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখেছেন, আবার রাত্রিতে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে দেখেছেন—এক কথায় পদ্মার সঙ্গে তাঁর একটি আত্মীয়তা ঘটেছিল। সেই যে আত্মীয়তা যা কবির ব্যক্তি-জীবনকে আলোড়িত করেছিল এককালে, সেই আত্মীয়তার বিশিষ্ট কথাগুলো এই কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এই কবিতাটিতে কোনও নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা নেই, কিন্তু বিশেষের ব্যঞ্জনায় এর মধ্যে একটি মহার্ঘতা এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিশ্লেষণের পূর্বাহ্ণে এ তথ্যটি মনে থাকা দরকার যে কবি নির্বিশেষকে নিগূঢ়তম ব্যঞ্জনায় উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তাই তাঁর কবিতার ধ্বনি-বিন্যাসের মধ্যে, শব্দ ব্যবহারের রহস্যময়তার মধ্যে, আমাদের বোধের অতীত অতিন্দ্রীয়লোককে তিনি জাগ্রত করতে প্রয়াসী ছিলেন। নিম্নে "গীতাঞ্জলী" কাব্যগ্রন্থের "কলিকা" কবিতার প্রথম দু'টি স্তবক উদ্ধৃত করছি। দেখা যাবে যে এখানকার প্রতিটি কথাই একটি মধুর অস্পষ্টতায় মায়াময় এবং রহস্যময়:

"মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।

উতরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।
সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা,
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।"

দেখা যাবে যে বিশেষকে সূক্ষ্মতম অনুভূতি দ্বারা নির্বাচিত করে প্রকাশ করার দিকে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিলনা, রবীন্দ্রনাথ সর্বদা একটি অনির্ণেয় গভীর রহস্যকে জানতে চেয়েছেন, সে রহস্য দেখার হতে পারে, স্পর্শের হতে পারে, স্বাদের হতে পারে অথবা আত্মার হতে পারে। বিভিন্ন বাক্ প্রতিমার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এ রহস্যকে আলোকিত করেছেন এবং আমাদের জন্য, পাঠকের জন্য, পাঠক চিত্তের জন্য একটি গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণ করেছেন। বহু পূর্বে "নিষ্ফল কামনা" কবিতায় এ রহস্যের উদ্‌ঘাটন আছে-

"যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের

নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।
তাই চেয়ে আছি।

প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাংখা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব—
তাই এ ক্রন্দন।"

কবিতার অর্থ নির্ণয় করতে হলে দেখা যাবে, যে শুধু মাত্র গদ্য বাচন-ভঙ্গীতে তাকে বিন্যস্ত করলে তার অর্থ পাওয়া যায় না। সমগ্র কবিতাটি শব্দ ব্যবহারে এমন একটি অবয়ব নিয়ে গড়ে ওঠে যে শুধুমাত্র শব্দার্থেই তার বক্তব্য ধরা যায় না। আমরা প্রথমেই একটি কবিতায় যে অবস্থার সম্মুখীন হই তা হচ্ছে ধ্বনি-বিন্যাস ও উৎপ্রেক্ষা। এই ধ্বনি-বিন্যাস এবং উৎপ্রেক্ষাকে বিবেচনা করেই কবিতার তাৎপর্য নির্ণয়ে অগ্রসর হতে হয়। দেখা যাবে, একটি কবিতায় কবি শব্দের বিশেষ বিন্যাসে বাক-প্রতিমা নির্মাণ করেছেন, উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে চিত্তের গভীরতম উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন, প্রতীক ও পুরাণের সাহায্যে তাকে বিগত এবং বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কবিতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হবে বাক-প্রতিমা গঠন, উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ, প্রতীক এবং পুরাণের ব্যবহার। মানুষ হিসাবে আমাদের অনুভূতিগুলি অসম্ভব রকমের সূক্ষ্ম। সেই অনুভূতিকে শুধু মাত্র একটি সাধারণ শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। বিশেষ রূপ-বিন্যাসের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করতে হয়। আমাদের জীবনে স্পর্শের অনুভূতি, স্বাদের অনুভূতি, ঘ্রাণের অনুভূতি, শ্রবণের অনুভূতি শব্দে তুলে ধরতে হলে কবিকে উৎপ্রেক্ষার সাহায্য নিতে হয়, প্রতীকের সাহায্য নিতে হয়, বাক-প্রতিমা নির্মাণ করে চিত্তের নিগূঢ়তম বোধকে প্রকাশ করতে হয়। কথাটি বলা যত সহজ প্রকাশ করা তত সহজ নয়। অন্ধকার রাতে সাপের শীতল গায়ে হাত লাগলে শরীরে যে শিহরণ জাগে সেই শিহরণকে কবি কি করে প্রকাশ করবেন? এই স্পর্শের সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হলে কবিকে চলবেনা, তাঁকে সেই স্পর্শের শীতলতা, ত্রাস এবং সমগ্র

শরীরের আশংকা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা এবং বাক-প্রতিমার সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনও উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লিখতেন তখন বিশেষকে নিয়ে অগ্রসর হননি বলেই তাঁকে শব্দের দ্বারা বাক-প্রতিমা নির্মাণ করতে হয়েছে, উপমা উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে নিগূঢ়-তম উপলব্ধি প্রকাশ করতে হয়েছে এবং পুরাণ ও প্রতীকের সাহায্যে বাংলা কাব্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়েছে। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য নির্বিশেষ, অস্পষ্ট ও রহস্যময় হলেও তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না, কেননা কবির বাণীভঙ্গী বিশেষ প্রতীকরূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় যেমন—

> "জ্বলিতেছে জল তরল অনল,
> গলিয়া পড়িছে অম্বরতল
> দিগ্বধু যেন ছল ছল আঁখি
> অশ্রুজলে"

রবীন্দ্রনাথ এখানে শব্দের সাহায্যে একটি দৃশ্যপট উন্মোচন করেছেন যেখানে উৎপ্রেক্ষা আছে, উপমা আছে, প্রতীক আছে এবং সব কিছু মিলিয়ে একটি বাক-প্রতিমা আছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে তিনি যে শুধু নির্বিশেষের কবি এই বললেই যথেষ্ট হয়না, সেই নির্বিশেষকে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য তিনি যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সেই কৌশলগুলো বিবেচনা করতে হয়।

আমরা যাকে বাক-প্রতিমা বলছি তার ইংরেজী শব্দ হচ্ছে image, কেউ কেউ একে রূপকল্প বলেও অভিহিত করেছেন। কবি শব্দের দ্বারা এই যে বাক-প্রতিমা গঠন করেন, এই গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্যে শুধু যে কাব্য-গত তাৎপর্য থাকে তাই নয়, এর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যও থাকে। মন-স্তত্ত্বে ইমেজ (image)-কে একটি মানসিক অবস্থার পুনর্বিন্যাস অথবা অতীতের কোনও অভিজ্ঞতা বোঝায়। সব ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা যে দৃষ্টির অভিজ্ঞতা হবে তার কোনও মানে নেই। শুধু দেখার কথা বললেই একই দৃশ্য বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিচিত্রিত হয়। যদি অতীতের কোনও ঘটনা বর্ণনা করতে বলা হয় দুজন লোককে, তাহলে এক এক জন এক এক রূপে তা বর্ণনা করবেন। এতেই বোঝা যায় যে রূপকল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির মানসিকতা অন্য ব্যক্তির মানসিকতা

থেকে ভিন্নরূপে সক্রিয়। তাই আমরা বলতে পারি যে ইমেজ বা বাক-প্রতিমা সব ক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। আমরা যখন পুরাতন কোনও দৃশ্য স্মরণ করি, পুরাতন কোনও ঘটনাকে স্মরণ করি তখন সেই স্মরণ করার মধ্যে কত বিচিত্র অনুভূতি যে একত্রিত হয় তা আর বলবার নয়। দেখার অনুভূতি, স্বাদের অনুভূতি, সমস্ত অনুভূতি একাকার হয়ে একটি বস্তুকে আমাদের স্মরণে আনে।

তাহলে বলা যায়, যে কোনও রূপকল্প অথবা বাকপ্রতিমা যে দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে তাই নয়, তা দৃশ্যের অতীতকেও আভাসে প্রতি-বিম্বিত করে থাকে। আমরা যাকে মানসচক্ষু বলি সেই মানসচক্ষুতে দৃশ্যের অতীত চিত্রায়িত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথমাবধি এই অরূপকে, এই দৃষ্টির অতীতকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেঃ

"আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধু পান
দুঃখের রসের মাঝে অমৃতের পেয়েছি সন্ধান।"

অথবা

"ভাঙো ভাঙো উচচ করো মোর ভগ্নস্তূপ
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ
রয়েছে উজজ্বল হয়ে। সুধা তাকে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে ভালবাসিয়াছি।
সেই ভালবাসা মোরে, তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতি-শেষে অবশিষ্ট রবে, তার ভাষা
হয়ত হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লান স্পর্শ লেগে,
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যু পরপারে।"

মানব জীবনে দেখার অনুভূতিটা প্রাথমিক এবং সবাপেক্ষা প্রবল। আমরা দেখতে পাই বলে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করতে পারি এবং দেখতে পাই বলেই আমাদের স্মৃতিগত বিবেচনা আছে। যে কোনও বোধই হোকনা কেন, সেই বোধকে প্রকাশ করবার চেষ্টা যখন একজন কবি করেন তখন

রহস্যময়তা সহ তার মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিগত বিবেচনাও থাকে। আমরা একটি বস্তুর রূপ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাব, তার রহস্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি। আমরা যদি দেখতে না পেতাম, তবে কোনও রহস্যই আমাদের পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব হোতনা। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে মাইকেল মধুসূদনের কবিতায় আমরা দেখেছি যে কবি একটি বেদনার বোধকে বাকপ্রতিমার সাহায্যে চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন। পুত্র-শোকাতুর রাবণ আক্ষেপ করে বলেছেন যে পদ্ম যদি ছিঁড়ে ফেলা যায় তাহলে পদ্মের ডাঁটা পানিতে তলিয়ে যায়, তেমনি হৃদয়-বৃন্তের পুষ্পরূপ পুত্রের মৃত্যুতে হৃদয় শোক-সাগরে ডুবে যায়। এখানে শোকাতুর পিতার হৃদয়-বেদনাকে দৃশ্যগোচর উপমার সাহায্যে আমাদের বোধের প্রকোষ্ঠে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় মধুসূদনের মত এবং মধুসূদনের চাইতেও বেশী বিচিত্র বাক-প্রতিমা নির্মিত হয়েছে, যে সমস্ত বাক-প্রতিমার সাহায্যে কবি জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তাঁর সর্বপ্রকার বিবেচনাকে প্রকাশ করেছেন।

২

মানুষের সংগে পৃথিবীর একটি নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এই অর্থে নিগূঢ় যে আমাদের স্থিতি এবং চলমানতা পৃথিবীকে নিয়েই। ভূপৃষ্ঠে আমাদের অবস্থিতি এবং এই পৃথিবীর আলো বাতাস এবং সৌন্দর্য নিয়েই আমাদের জীবন যাপন। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ পৃথিবীর এই পরিচয়টি প্রবল ভাবে জানত। সেই কারণে বৈদিক যুগের ঋষিরা পৃথিবীকে পরম সত্য বলে জেনেছিলেন, কেননা পৃথিবী ছিল তাঁদের একটি পরম আশ্রয়। তাঁরা কোনও দেবতার স্তব করেননি, তারা স্তব করেছিলেন পৃথিবীর, প্রকৃতিতে যে সমস্ত শক্তি রয়েছে সে সমস্ত শক্তির। অর্থব বেদে পৃথিবীকে মাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পৃথিবী এই কারণে মাতা যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানুষ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে এবং পৃথিবী সর্ববিধ প্রাণীকে ধারণ ও পালন করে। ঋষিরা বলেছেন, যে মানুষের জন্য উদীয়মান সূর্য জ্যোতির দ্বারা অমৃত দান করে সে মানুষ এই পৃথিবীর সন্তান। সত্য সমাবৃত যে পরম পুরুষের অমৃত হৃদয় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সেই পরম পুরুষকে মানুষ আবিষ্কার করে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে। মানুষ যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে সে পৃথিবী কল্যাণময়ী এবং আনন্দময়ী। তাই ঋষিগণের প্রার্থনা, "হে পৃথিবী, আমাকে হিরণ্যের মত দীপ্যমান কর, যেন আমাকে কেউ বিদ্বেষ না করে, আমাকে তুমি পিছনে রেখনা, উর্ধ্বেও পাঠিওনা, নীচেও ফেলে দিওনা। তুমি ঐশর্য্যময়ী মাতা। তোমার অংকেই সকলের আশ্রয় এবং তোমার বক্ষেই সুখের আলয়।" এই দীপ্যমান পৃথিবীকে ঋষিগণ অগ্নিবসনা পৃথিবী বলেছেন এবং প্রার্থনা করেছেন, এ পৃথিবী যেন মানুষকে দীপ্তিময় ও আনন্দিত করে। পৃথিবীতে অনেক পর্বত আছে, অনেক অরণ্য আছে. অনেক সুগন্ধ আছে। মানুষের প্রার্থনা হবে, সকল অরণ্য এবং সকল হিমবান পর্বত আনন্দময় হোক। যে গন্ধ পৃথিবীর মধ্যে সমদ্ভূত এবং যে গন্ধ পদ্মের মধ্যে সমাবিষ্ট, সে গন্ধের দ্বারা পৃথিবী মানুষকে সুরক্ষিত করবে। স্নেহ-বদ্ধ সূর্যের সংগে যে পৃথিবী চিরকাল সংযুক্ত সেই পৃথিবীর সব কিছু মধুময়।

তাই মানুষের প্রার্থনা, আমার দৃষ্টি যেন কখনও শ্রান্ত ও ম্লান না হয়।' রবীন্দ্রনাথ বেদের এই তাৎপর্যকে স্বীকার করেছেন। তাই আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পৃথিবীকে আশ্রয় করবার কি আকুল আকাংখা।

"স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন। মর্ত্যভূমি তাঁর কাছে জননী মাতৃস্বরূপা এবং এই মাতৃভূমির নীলাকাশ, আলো, বাতাস, লোকালয়, সিন্ধুতীরের সুদীর্ঘ বালুকা, পর্বতের শিখরে শুভ্র হিমরেখা এবং তরুশ্রেণীর মধ্যে নিঃশব্দ সূর্যোদয়, এ সমস্ত কিছু পৃথিবীকে মধুর করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বেদের ঋষির মতো পৃথিবীর স্তব করেছেন। পার্থক্য শুধু এখানে যে বেদের ঋষি যখন পৃথিবীর কথা বলেন তখন সকল জীবের আশ্রয় যে পৃথিবী তার কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পৃথিবীর কথা বলেন তখন সেই পৃথিবীকে তাঁর পরিচিত জনলোকের সংগে সম্পর্কিত করে বলেন। বৈদিক ঋষির কাছে পৃথিবী হচ্ছে সকল সৌভাগ্যের উৎস এবং রবীন্দ্র-নাথের কাছে পৃথিবী হচ্ছে সকল মানুষের নিঃসংশয় আশ্রয়। কালের ব্যবধানে তাৎপর্যের এই ব্যতিক্রম ঘটেছে, তা না হলে গভীরতম সত্যে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সংগে বৈদিক ঋষির বক্তব্যের খুব বেশী পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী মানুষের সুখদুঃখময় পৃথিবী, যে পৃথিবীতে বেদনা আছে, আনন্দ আছে, সর্বোপরি আছে মমতা, যে মমতা গড়ে উঠেছে মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে। বেদে মানুষে মানুষে সম্পর্কের কথা বলা হয়নি। সে সময় বলা সম্ভবপরও ছিলোনা। কেননা সেই আদিম যুগে ছিল শুধু একটি বিস্মিত দৃষ্টিপাত: মানুষ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকে দেখেছে, অগ্নিকে দেখেছে, বায়ু প্রবাহ দেখেছে এবং আঘ্রাণ নিয়েছে বিভিন্ন সুগন্ধের। সব কিছু ছিল তাঁর কাছে বিস্মিত অবলোকনের।

বৈদিক যুগে যখন মানুষ অনুভব করতে পারেনি যে পৃথিবীর সংগে তার সম্পর্ক কি, তখন মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর দিকে বিস্মিত নয়নে দৃষ্টিপাত করেছে। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে পৃথিবীর সংগে জড়িত করেনি। সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন দর্শক হিসেবে বিবেচনা করেছে যার ফলে তখনকার মানুষ পৃথিবীর স্তব করেছে, সূর্যের স্তব করেছে, সমুদ্রের স্তব করেছে এবং সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে আকস্মিক

বিপুল শক্তি বলে কল্পনা করেছে। কিন্তু মানুষ যে সকল কিছুরই অংগ, এই অনুভূতি আধুনিক কালের। তাই যখন তারা অগ্নির বন্দনা করত তখন শোভনরূপ দীপ্যমান একটি বস্তুর বন্দনা করত। এই সমস্ত বন্দনার মধ্যে একটি সত্য প্রকাশিত হয়, তা হোল প্রকৃতি হচ্ছে সকল শক্তির মূলাধার। মানুষ তার স্বার্থে এই শক্তিকে উপাসনা করত। রবীন্দ্র-নাথের কাছে প্রকৃতির এই আদিম রূপ লক্ষ্যগোচর হলেও রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের যে নিগূঢ় সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই পৃথিবী এবং প্রকৃতির বন্দনা করেছেন, যা দিয়েই বৈদিক স্তোত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণীভঙ্গীর সাযুজ্য আসে। তবুও পার্থক্য আসে আমাদের অনুভবে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন----

"ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কণকপদ্মখানি,
দেখা দিক ফুটি।
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে দীপ্ত কেশে উদ্বোধনী বাণী
সে-পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য বাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।"

বেদে আদিত্যকে দেবতা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে এই আদিত্য অন্ধকার নিরসন করে আলো প্রকাশ করে এবং অন্ধকারা-বৃত রূপহীন পদার্থের রূপ প্রকাশ করে প্রত্যহ উষাকালের সঙ্গে আবির্ভূত হয়। সেই কারণে আদিত্য হচ্ছে সুন্দর, দিব্য এবং প্রিয়। বৈদিক কবিতায় নিসর্গ-বন্দনা মানুষের বিস্ময়ের প্রকাশ। প্রকৃতিকে নানা রূপকে-উৎপ্রেক্ষায় বেদে প্রকাশ করেছে। যেমন রাত্রি এবং দিন অন্ধকার এবং আলো। একজনের সজ্জা দীপ্তিময়, অন্যজনের সজ্জা কৃষ্ণকায়। এই বর্ণনার মধ্যে মানুষ নেই, অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে এই পৃথিবীতে রাত্রি এবং দিবসের যে প্রাত্যহিক সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের কোনও পরিচয় নেই। অর্থাৎ জীবন এবং জগতে একমাত্র জীবনধারণ ও শক্তি লাভের প্রয়োজন ছাড়া কোনও সম্পর্ক বৈদিক যুগে নির্মিত হয়নি। বৈদিক যুগে মানুষ হয়েছে

দর্শক এবং পৃথিবী বিচিত্র রূপে মানুষের নয়নগোচর হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় আমরা এই পৃথিবীকে যখন নতুন করে দেখি তখন মনে হয় মানুষের যে আবেগ এবং অনুভূতি আছে, যে আবেগ এবং অনুভূতি মমতা, বেদনা এবং আকাংখা নিয়ে দীপ্যমান, সেই আবেগ ও অনুভূতি তিনি সমগ্র পৃথিবীর উপর আরোপিত করেছেন। তাহলে আমরা বলতে পারি, বেদে প্রকৃতির যে দৃশ্যপট নির্মিত হয়েছিল সেই দৃশ্যপটে রবীন্দ্র-নাথ মানুষকে এনেছেন। এই পার্থক্য নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বেদের স্তোত্রের অত্যন্ত নিকটবর্তী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে নির্বিশেষের কল্পনা এবং নির্বি-শেষকে যে রূপ দেবার চেষ্টা, সেই নির্বিশেষকে আমরা সহজেই গ্রাহ্য করতে পারি, কেননা এই নির্বিশেষের পটভূমি বহুদিন পূর্বে এই দেশেই নির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ বৈদিক যুগের প্রকৃতি এবং পৃথিবীর বন্দনাকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে তিনি তাঁর সময়কার মানুষকে এবং পৃথিবীকে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। এই জানার চেষ্টার মধ্যে আমরা দেখি যে মানুষের যে সর্বকালীন অনুভূতি সেই অনুভূতিগুলোকে তিনি জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছেন। পূর্বেই বলেছি, এই সর্বকালীন অনুভূতি হচ্ছে সৌন্দর্যের অনুভূতি, আনন্দের অনুভূতি, মমতা এবং বেদনার অনুভূতি। ইংল্যান্ডের কবি কীট্‌স যেমন প্রাচীন গ্রীসের পটভূমিতে তাঁর সৌন্দর্য, বেদনা এবং আনন্দকে প্রকাশ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বৈদিক যুগের পটভূমিতে তাঁর আনন্দকে, বেদনা ও সৌন্দর্যবোধকে প্রকাশ করেছেন। এই পশ্চাদভূমি না থাকলে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা মূল্যহীন হত, কেননা আমরা নির্ণেয়যোগ্য বস্তুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অনির্ণেয়তে উপস্থিত হই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই অনির্ণেয়কে অনুভব করতে চেয়েছিলেন। তাই এই অনির্ণেয়ের পশ্চাতে যদি বৈদিক বন্দনার রূপ-কল্পনা না থাকত, তা হলে আমরা রবীন্দ্রনাথের অনির্ণেয়কে উপলব্ধি করতে পারতাম না। এবং উপলব্ধি না করতে পারলে অস্বীকার করতাম।

বৈদিক মন্ত্রে ঋষিগণ ব্রহ্মাণ্ড-মহিমা চিন্তা করেছিলেন। তাই অনেক সূক্তে পৃথিবীর প্রশস্তি আছে, দিবারাত্রির প্রশস্তি আছে, আকাশের প্রশস্তি আছে। এই সমস্ত প্রশস্তি নির্মাণ করতে যেয়ে বেদের ঋষিরা ভূমণ্ডলের উর্বরা শক্তির কথা বলেছেন এবং সকল পশু, অশ্ব এবং মানব দলের কথা বলেছেন যারা পৃথিবীতে এসে মিলিত হবে যেখানে সর্ববিধ

শস্য-সমৃদ্ধিও একত্রিত হবে। এই মিলনের জন্যই বেদের আহুতি। সুতরাং যজ্ঞের সময় যাদের মন বিরুদ্ধ ও বিব্রত তাদের প্রণয়ের দ্বারা এক সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ঋষিদের সর্বমুহূর্তে অনুনয়। রবীন্দ্রনাথ বৈদিক সূক্তের পৃথিবীকে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। 'পরশ পাথর' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই বিস্ময়ের একটি চিত্র অংকন করেছেন। যখন আকাশে প্রথম সৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছিল তখন তাকে মনে হয়েছিল যেন কষ্টিপাথরে আঁকা সোনার রেখা এবং সেই সময়কার মানুষ সিন্ধু তীরে দাঁড়িয়ে অতলের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিল এবং এই অপূর্ব সৌন্দর্যের রহস্য আবিষ্কার করতে চেয়েছিল। পৃথিবীর প্রতিদিনের জীবনযাত্রার গ্লানি মানুষকে তখন শঙ্কিত করেনি, তখন নতুন উষালগ্নে সব কিছু ছিল মনোরম, বিস্ময়কর এবং রহস্যময়। এই রহস্যময়তা এবং বিস্ময়কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক কবিতায় তুলে ধরেছেন। "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় এর পরিচয় পাই। আরো পরিচয় পাই "বসুন্ধরা" কবিতায়। "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে বেদমন্ত্রের কথা বলেছেন। বলেছেন যে নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে বেদমন্ত্রের মতো সমুদ্রের ভাষা শোনা যায়। কবিতাটির আরম্ভের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি—

> "হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
> একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
> চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শংকা, সদা আশা,
> সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
> নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
> অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
> ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি।"

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের রহস্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন, যে রহস্য প্রমাণের অগোচর এবং প্রত্যক্ষের বাইরে। মানুষের দৃষ্টিতে যে বিস্ময় জেগেছে বেদে সে বিস্ময় চিত্রিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একই বিস্ময় বিমূর্ত। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি পার্থক্য এসেছে, সেই পার্থক্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের

বর্ণনা মানব-জীবনের মমতার সম্বন্ধে বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য আধুনিক হয়েছে, সঙ্গে বৈদিক নির্ভরতাও অক্ষুণ্ন রয়েছে। যেমন—

"দিক হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাংখারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিতে ব্যাকুলি।"

'বসুন্ধরা' কবিতাটিও অনেকাংশে বেদের মন্ত্রোচ্চারণের মতো। কবি সামগ্রিকভাবে এই ভূমণ্ডলকে আপন সত্তায় গ্রহণ করেছেন। তিনি তার মধ্যে ব্যাপ্ত হতে চান, বসন্তের আনন্দের মতো বিস্তারিত হতে চান, এবং আলোকের বিকীরণ যেমন সর্বব্যাপী তেমনি তার অস্তিত্বের প্রবাহ হবে সর্বব্যাপী। পৃথিবীর সঙ্গে একত্রিত হবার অর্থকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন এভাবে যে, তিনি মৃত্তিকার সঙ্গে একাকার হবেন, শৈবালের সঙ্গে একাকার হবেন, তৃণের এবং বৃক্ষলতার সঙ্গে একত্রিত হবেন, এবং আনমিত শস্য-ক্ষেত্রে যে সূর্যের আলো পড়েছে তার সঙ্গে তিনি একত্রিত হবেন। কবিতায় বক্তব্যটি অত্যন্ত সহজ, স্পষ্ট এবং নিগূঢ় কোনও বিশেষ বোধকে প্রকাশ করেনি। তবুও আমরা এই কবিতার বক্তব্যকে শুধু এই কারণে গ্রহণ করতে পারি যে বেদে পৃথিবীকে যে মাতা বলা হয়েছিল সেই বক্তব্যকে রবীন্দ্র-নাথ তাঁর সমগ্র বিবেচনার পটভূমি করেছেন। এর ফলে বেদের সূক্তের সাথে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের একটি যোগসূত্র নির্মিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের যে প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়, সেই প্রকৃতির রূপ-কল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তার ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন। কবিতাটির আরম্ভ এই ভাবে—

"আমায় ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃণ্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;

দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে,
পূরবে পশ্চিমে---শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে ; যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে, নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে, নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্-দিগন্তরে ; শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃংগে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দে নিভৃতে।’

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে প্রধান ইচ্ছা হচ্ছে তিনি সকল মানুষের সঙ্গে এক হয়ে থাকবেন, অর্থাৎ তিনি কোনও বিশেষ অঞ্চলের মানুষ হতে চাননি, তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের স্বজাতি হতে চান। বেদে এই কথার অনুরূপ কথা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে “হে বিজ্ঞ মানবগণ, তোমাদেরকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয় সম্প্রীতিযুক্ত এবং বিদ্বেষহীন করছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত

বৎসকে ভালোবাসে তোমরা তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে।" একই প্রকৃতির রূপকল্প রবীন্দ্রনাথও নির্মাণ করেছেন। যেমন "খণ্ডমেঘগণ মাতৃস্তন্য পানরত শিশুর মতন পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি", একই রূপকল্প 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় আছে—

"শুভ্রখণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে।"

আমার বক্তব্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় যদি আমরা প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে তাকে সমন্বিত করি। তা না হলে এ কবিতাগুলি সাধারণ বর্ণনা-মূলক সুন্দর কবিতা হয়ে থাকবে, গভীর দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হবে না। শৈশবে যে পরিমণ্ডলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়েছিলেন সেই পরিমণ্ডল প্রাচীন ভারতের তপোবনের পরিমণ্ডল। কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শান্ত স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলকে অনেকাংশে নির্মাণ করেছিলেন। কবি যখন পিতার সঙ্গে শৈশবে সিমলায় গিয়েছিলেন সেখানেই উচচ পর্বতের নির্জনতার স্বাদ পেয়েছিলেন। বৈদিক ঋষিরা প্রচীন ভারতবর্ষের যে পরিচয় দিয়েছেন সেই পরিচয়ের সঙ্গে এই পরিচয়ের মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু এখানেই যে, যে কবি এই পরিচয়কে প্রকাশ করেছেন তিনি আধুনিক জীবনের কবি। তাই তাঁর কবিতায় পারিপার্শ্বিকতা স্থান পেয়েছে এবং মানুষে মানুষের মমতার সম্পর্কের মধ্য দিয়েই এই পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে পৃথিবী হচ্ছে মাতৃস্বরূপা, বেদেও পৃথিবীকে মাতৃস্বরূপা বলে কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু বেদে পৃথিবী এই অর্থে মাতৃস্বরূপা, যে ভূপৃষ্ঠে আমরা জীবন ধারণ করি এবং পৃথিবীর শস্য গ্রহণ করে আমরা বেঁচে থাকি এবং পৃথিবীর আলো এবং বাতাস আমাদের জীবন্ত রাখে, তাই পৃথিবী এক অর্থে মায়ের কাজ করে। মাতা যেমন সন্তানকে অঙ্কে গ্রহণ করেন, স্তন্য দান করেন, এক অর্থে পালন করে বাঁচিয়ে রাখেন, পৃথিবীও সেই অর্থে বাঁচিয়ে রাখে। তাই পৃথিবী মাতৃসমান। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে সংসারের মমতাবন্ধনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত করেছেন। "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতায় তিনি বলেছেন—

"হে জননী পুত্রহারা
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত, আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে, তবু জানি মনে,
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চিরপরিচিতসম—
তার পরদিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি, চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই।"

রবীন্দ্রনাথ মমতার কারণে মমতার বন্ধনে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন। যেহেতু স্বর্গে শুধু মাত্র আনন্দ আছে, এক প্রকার দ্বিধাহীন অনন্ত সময়ে পরিব্যাপ্ত আনন্দ, তাই সেই আনন্দের মধ্যে কবি কোনো নির্ভরতা খুঁজে পাননা। তাঁর কাম্য একান্ত গৃহকোণ, যেখানে আকুলতা আছে, আকাংখা আছে, বেদনা আছে এবং মমতার সমর্থন আছে। সুতরাং দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের কাম্য হচ্ছে একটি সুনিবিড় মমতার আশ্রয় ও গৃহগত সৌজন্য। তাই দেখি অন্য একটি কবিতায় (দিন শেষে) উজ্জ্বল রাজ-প্রাসাদে তিনি যেতে চাচ্ছেন না, তিনি শুধু সমস্ত কর্মের অবসানে একটি নিভৃত বিশ্রাম সন্ধান করেছেন। বেদে পৃথিবীর বন্দনা করা হয়েছে অন্য কারণে। পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন হচ্ছে শক্তি অর্জন করা, উত্তম সুখ লাভ করা এবং ঐশ্বর্যবান হওয়া। তাই ঋষিগণ পৃথিবীর জন্য এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তির জন্য স্তোত্র রচনা করতেন এবং অর্ঘ নিবেদন করে বলতেন যেন পৃথিবী এবং সকল প্রাকৃতিক শক্তি এই সব বন্দনা-গান শ্রবণ করে এবং তদ্দ্বারা প্রশংসিত হয়। বেদে ইন্দ্রের প্রশংসা করা

হয়েছে কেননা তিনি পরাক্রমশালী। বজ্রধর ইন্দ্রদেব অনেক পরাক্রম-সূচক কার্য করেছিলেন। তিনি অহি নামে অভিহিত এক সুরকে বিনাশ করেছিলেন, জলসমূহ ভূমিতে পাতিত করেছিলেন এবং পার্বত্য প্রদেশের রুদ্ধ বহনশীল নদী সকলের কূল ভঙ্গ করে জল প্রবাহিত করেছিলেন। তাই বেদের স্তোত্রে ইন্দ্রের প্রশংসা করা হয়েছে যেন ইন্দ্র তার ক্ষমতার আশ্রয়ে এনে মানুষকে রক্ষা করেন, কেননা তিনি স্থাবর এবং জঙ্গম এই উভয়েরই রাজা এবং শান্ত ও দুর্দান্ত জীবগণের অধিশ্বর। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হলে স্তবকারীরা ইন্দ্রকে আহ্বান করবে এবং ইন্দ্রের শরণাগত হবে যেন ইন্দ্র যুদ্ধে জয়লাভে তাদের সহায়তা করেন। বৈদিক যুগে মানুষ শক্তি কামনা করেছে, আশ্রয় চেয়েছে এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার জন্য জীবজগতে যে সমস্ত সংকট রয়েছে সেই সংকটকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বেদের এই পরিচয় পাইনা, শুধু পৃথিবী এবং প্রকৃতি-বন্দনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বৈদিক ধ্বনির মত একটি তন্ময় মন্ত্র উচচারণ করেছেন কিন্তু পৃথিবীকে যে কারণে তিনি গ্রহণ করেছেন সেই কারণ বৈদিক যুগে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে বড় হল স্নেহ ও মমতার উপঢৌকন। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন মমতার দ্বারাই সুরক্ষিত হয়, তেমনি প্রকৃতি ও প্রাণের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী মমতার দ্বারা লালিত হয় এবং সুরক্ষিত থাকে। তিনি পৃথিবীর কাছে অথবা প্রকৃতির কাছে শক্তি প্রার্থনা করেননি। যথার্থ মাতারূপে পৃথিবীকে বিবেচনা করে তার অংকে আশ্রয় কামনা করেছেন। অনেক পরে লেখা 'পত্রপুট' কাব্যের 'পৃথিবী' কবিতাটি আমরা এখানে বিবেচনা করতে পারি। এই মাতাস্বরূপা পৃথিবীকে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে বন্দনা করেছেন—

"জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিন্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
সব কীর্তির অবসান।
আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসিনি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করবনা তোমার দ্বারে।

তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত
নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে ;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।”

ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত এবং ষড়দর্শনে বেদের উৎপত্তির বিষয়ে নানা মতের সমালোচনা করা হয়েছে। বেদের সঙ্গে উপনিষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপনিষৎ বেদের চরম ও পরম অংশ। উপনিষদে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার পরিচয় আছে। উপনিষৎ থেকে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং এ কারণে উপনিষৎ এবং দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাওয়া যায়। আমরা ঋগ্বেদের কথা উল্লেখ করছি। ঋগ্বেদে দৈবকার্যের অনুষ্ঠান বর্ণিত আছে এবং এই দৈবকার্য মানুষের হিতার্থে। দৈব কার্য হচ্ছে যজ্ঞ এবং প্রার্থনা। ঋগ্বেদে এভাবে আশীর্বাদ কামনা করা হয়েছে নক্ষত্রের কাছ থেকে, সূর্যের কাছ থেকে, অম্বরের কাছ থেকে এবং সাগরের কাছ থেকে। আমরা বেদের এই প্রার্থনাগুলোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার নিঃসর্গ বন্দনার একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করেছি। কিন্তু উপনিষদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর আরো গভীর, নিগূঢ় এবং সার্থক। উপনিষদে বলা হয়েছে, বিশ্বজনীন সমষ্টিগত গতির অন্তর্গত, যা কিছু ব্যষ্টিগত সত্তায় গতিমান সেই সমস্তই ভগবানের আত্মনিবাস। সেই ঈশ্বর প্রদত্ত বস্তুই তোমার ভোগযোগ্য' কারো বিত্তের প্রতি লোভ করোনা। এ মন্ত্র ঈশ-উপনিষদের প্রথম মন্ত্র। এ মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীক্ষা পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের উপর মন্ত্রটি নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। পৃথিবীর সবকিছু ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত। তাই রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে

যা তাঁর কাছে সহজ এবং সত্য তা আনন্দের এবং যা রয়েছে তাঁর চতুর্দিকে তার মধ্যে চিরন্তনকে লাভ করা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে চতুর্দিকে শুধু বিস্ময়কর এবং অনির্বচনীয়কে আবিষ্কার করেছেন। এই অনির্বচনীয়কে আবিষ্কারের প্রয়াস ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ কোনও পৌরাণিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। কোন বিশেষ পূজাপার্বন বিধি তাঁকে অনুসরণ করতে হয়নি এবং তিনি কোনও শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে মানেননি। কেননা রবীন্দ্রনাথের কামনা ছিল চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করা, বিমিশ্র আনন্দ-বোধের মধ্যে আপনাকে জাগরিত করা। এ কথাই তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"এই নীলাম্বর তলে তৃণ-রোমাঞ্চিত ধরণীতে,
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
প্রতি দিবসের পূজা প্রতিদিন করি অবসান
ধন্য হয়ে ভেসে যাক গান।"

বৈদিক মন্ত্র শুধু যে সুন্দর তা নয়, শুধু যে প্রকৃতি-বন্দনাতেই তা পরিসমাপ্ত তাই নয়, এ মন্ত্র তপস্যার মন্ত্র। অর্থাৎ সব অস্তিত্বকে একাগ্র করে দৃশ্যমান জগতকে প্রত্যক্ষ করে এবং সেই দৃশ্যমান জগতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শুধু আত্ম স্বরূপকে আবিষ্কার করা। পৃথিবীতে প্রথম যখন সূর্যের আলো এসে পড়েছিল তখন এই পৃথিবীর প্রাঙ্গণে যে জ্যোতি জেগেছিল সেই জ্যোতির বন্দনা বৈদিক ঋষিরা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই জ্যোতির মধ্যে দেবতার স্বরূপ দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— "যার জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখিছে স্বরূপ।" বৈদিক ঋষিদের মতো রবীন্দ্রনাথও সূর্য বা সবিতাকে লক্ষ্য করে অজস্র বন্দনা গান রচনা করেছেন। "সাবিত্রী" কবিতায় তিনি বলছেন যে "হে সূর্য তুমি মেঘের দুর্যোগকে দূর করো এবং প্রথম প্রত্যূষে যে জ্যোতি নিয়ে তুমি প্রস্ফুটিত হয়েছিলে সে জ্যোতির কণকেপদ্ম আকাশে জেগে উঠুক। তোমার যে দীপ্যমান অগ্নি সেই দীপ্যমান অগ্নির মধ্যে আমার সত্যের ছবি রয়েছে এবং তোমার আবির্ভাবে ঊষালগ্নের তমিস্রা দূর করে যে বাঁশী বেজে উঠে সে বাঁশী আমারই চিত্ত। সে বাঁশীর সঙ্গীতে আমি নিঝরিণীতে কল্লোলের সুর শুনেছি এবং এই কল্লোল আমার সর্বদেহে

সঞ্চারিত হয়েছে। অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবের মধ্যে তোমার বৈভব ছড়িয়ে আছে এবং তোমাকে নিয়েই পৃথিবীর ঐশ্বর্য এবং তোমাকে দিয়েই পৃথিবীর দাক্ষিণ্য"। এই যে রবীন্দ্রনাথের সূর্য-বন্দনার স্বরূপ সেই সূর্য-বন্দনা বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, প্রাচীন ঋষির বাণীতে একটি লোকোত্তর প্রকাশশক্তি আছে। সেই লোকোত্তর প্রকাশ-শক্তি রহস্যময় এবং গভীর। তাই তিনি বলেছেন, তিনি এ লোকোত্তর প্রকাশশক্তির অধিকারী হতে পারেননি—

"বৈদিক মন্ত্রের বাণী কন্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে,
ভাষা নাই, ভাষা নাই।"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আদি যুগে সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন চতুর্দিক অন্ধকার ছিল তখন যে সূর্য জাগল, সেই সূর্য হচ্ছে অনাদি আকাশে—

"আত্ম প্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত
লৌহ-গর্ভ হতে
গোপনে উঠেছে জ্বলি শিখায় শিখায়।"

অগ্নি হচ্ছে সূর্যের প্রাণ-চৈতন্য। বৈদিক মন্ত্রে অগ্নি হচ্ছে রাত্রি কালে শোভনরূপ-বিশিষ্ট এবং উষা কালে অভিমানী। এই অগ্নি মূর্তিদ্বয়কে যজ্ঞে আহ্বান করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষের দিকে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে বৈদিক মন্ত্রকে প্রায় অনুকরণ করে আপন জীবনের শেষ চৈতন্যকে প্রকাশ করে গেছেন। যখনই তিনি সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, পৃথিবীর অজস্র ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, সজীবতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, তখনই নিগূঢ়ভাবে তাঁর অনুভূতি বৈদিক ঋষিদের সঙ্গে একাকার হয়েছে। তিনি তাঁর সর্ব-জীবনের কাব্য সাধনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে তাঁর কবিতা নিঃসঙ্গ কোনও অভিব্যক্তি নয়। তাঁর বক্তব্য ঋষিদের প্রথম সূর্যোদয়ের বন্দনার স্তোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।

পৃথিবীর অনেক কবি প্রকৃতিকে বিচিত্র রূপে গ্রহণ করেছেন। ইংরেজ কবি "ওয়ার্ডসওয়ার্থ" (Wordsworth)-এর কথা আমরা জানি। তাঁর

কাছে প্রকৃতি ছিল একটি পরম অস্তিত্ব যে অস্তিত্বকে তিনি তাঁর প্রেরণা বলেছেন এবং ভগবান বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃতি মানব-জীবনের আশ্রয় এবং মানব-জীবনের লালন ভূমি। তাই এই প্রকৃতির সঙ্গে মিশেই মানুষ তার জীবনের পরম সত্যকে পায় এবং আনন্দকে পায়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিবেচনা বেদের বাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তিনি তাঁর শব্দের মধ্যে, ধ্বনির কল্লোলের মধ্যে প্রাথমিক যুগের মন্ত্রোচ্চারণকে সচকিত করতে চেয়েছিলেন।

উপনিষদের তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রভাবিত করেছিল। তার অর্থ এই যে উপনিষদের মন্ত্রে অগ্নিতে, জলেতে ও বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র অখণ্ড অক্ষয় ঐক্যের যে কথা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় সেই ঐক্যের সন্ধান আমরা পাই। রবীন্দ্রনাথ এই অখণ্ড ঐক্য আবিষ্কার করতে যেয়ে পৃথিবীতে একটি অমৃত-স্বাদ পেয়েছিলেন। নানাভাবে এ অমৃত-স্বাদের কথা তিনি বলেছেন। এ পৃথিবীর সব কিছু তাঁর ভাল লেগেছে। একটি অখণ্ড অনাবিল পৃথিবীর মধ্যে কবি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তাই এ কথা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর:

> "আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে,
> আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

অর্থাৎ কবি-চিত্ত উপনিষদের মর্মে অভিনিবিষ্ট থেকে যে জীবন-তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল সে জীবনতত্ত্ব হচ্ছে অমৃতের এবং মৈত্রীর। বিশ্ব-চরাচরে যে একটি বন্ধন আছে সে বন্ধন হচ্ছে প্রেমের বন্ধন। এ বন্ধনকে একটি মহিমান্বিত অধীনতা বলা যেতে পারে। ঋগ্বেদের মন্ত্রে বলা হয়েছে "হে ইন্দ্র, তোমার শত্রু নেই, তোমার নায়ক নেই, তোমার বন্ধু নেই, তবু প্রকাশের কালে যোগের দ্বারা বন্ধুত্ব কামনা কর।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এ কথাই অন্য ভাবে বলা হয়েছে যে প্রেম-বন্দনার মধ্যে অসীম শক্তিধর সীমার মধ্যে স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়ে। যে বন্দনাকে বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন, ভগবান জীবের মধ্যে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন, সেই পরম গৌরবের উপরই জীবের জীবত্ব। মানুষের পরম অভিমান এই যে ভগবান মানুষকে ছাড়া থাকতে পারেননি, প্রেম-বন্ধনকে তিনি মেনেছেন। পৃথিবীতে চতুর্দিকে যে আনন্দের উপঢৌকন আছে তার মধ্যে মানুষের জন্য অজস্র

সম্পদ লুক্কায়িত রয়েছে। এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-শেষে একটি কবিতায় এভাবে বলেছেন—

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

কবিতাটি বাণীর স্বল্পতায় অথচ অর্থের গভীরতায় বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। দেখা যাবে, কবি একটি সুদৃঢ় প্রত্যয়ে তাঁর জীবনবেদকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। সে প্রত্যয় হচ্ছে এ পৃথিবী মধুময় এবং এর সকল কিছুই মধুময়। আনন্দ ও মধুতে পরিপ্লাবিত এই যে ধরিত্রী, সেই ধরিত্রীতে জন্মগ্রহণ করে কবি চরিতার্থ হয়েছেন। পৃথিবীতে ক্ষয় আছে, পৃথিবীতে পরাজয় আছে, কিন্তু পৃথিবীর সকল ক্ষয়ক্ষতিকে মিথ্যা করে অনন্ত আনন্দ সর্ব মুহূর্তে বিরাজমান। তাই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও কবি এই পৃথিবীর ধূলি স্পর্শ করে বিদায় নিতে চান। এই কবিতার বাণীভঙ্গীর সরলতা, স্পষ্টতা, এবং তীক্ষ্ণ একাগ্রতা কবির নিগূঢ়তম উপলব্ধির ফল। এই উপলব্ধি না থাকলে শব্দগুলো কবির দ্বিধামুক্ত বক্তব্যকে নিশ্চিন্তে ধারণ করতে পারতনা। কবি উপমা অথবা রূপক ব্যবহার করে বক্তব্যকে অলংকৃত করবার চেষ্টা করেননি। এখানকার বক্তব্য নিরলংকৃত ঋজু, যথার্থ আনন্দময়। শব্দ-ব্যবহারের দিক থেকে বিবেচনা করলে এ কবিতাটি বেদের বাণীভঙ্গীর সঙ্গে

তুলনীয়। বৈদিকযুগের ঋষিরা অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও জিজ্ঞাসা ছিল না। পৃথিবীতে বিভিন্ন বৃক্ষলতার অঙ্কুরোদগম, ঊষালগ্নের সূর্যোদয়, সবকিছুই ছিল তাঁদের কাছে একটি বিশেষ অস্তিত্বের প্রকাশ। সে অস্তিত্বকে এক কথায় ব্যাখ্যা করা যায় আনন্দ ও সত্য বলে। একটি নিশ্চিন্ত নিবিড় বোধ থেকে ঋষিদের মুখে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল সে বাণীতে স্পষ্টতা ছিল, তীক্ষ্ণতা ছিল। তাই সে বাণীকে অলংকৃত করে শোভমান করার প্রয়োজন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধাবার শেষ পর্যায়ে আমরা অতীতের এই দীপ্তিময় ভাষাকে আবার নতুন রূপে প্রকাশিত হতে দেখি। আর একটি কবিতা উল্লেখ করছি, কবিতাটির নাম "মুক্তবাতায়ন প্রান্তে" :

"মুক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।
কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকুতি,
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ,
করে থাকে চুপ,
বলে, আমি আনন্দিত—ছন্দ যায় থামি—
বলে, ধন্য আমি।"

এই কবিতাটিতে কবির দ্বিধামুক্ত অনাড়ম্বর বাণীভঙ্গীর পরিচয় পাই। এখানকার বক্তব্য পূর্বের কবিতাটির মত। কবি বলছেন, পৃথিবীর সর্বত্র অমৃতের উৎসধারা প্রবহমান। তৃণাংকুরের সরলতায় ধরিত্রীর প্রাণের আহ্বান পাওয়া যায় এবং চিত্ত যখন এই আনন্দে উদ্ভাসিত তখন সে আনন্দের বাণীরূপ সন্ধান করতে যায়। এই বাণীরূপ সন্ধান করতে যেয়ে সে তার স্তুতি নির্মাণ করে, যে স্তুতিতে সে বলে, আমি আনন্দিত, আমি ধন্য। বক্তব্যের এই যে সহজতা এবং সচ্ছলতা শব্দের আড়ম্বর-

হীনতার কারণে তা সম্ভবপর হয়েছে। কবি একটি অকুতোভয়, একটি বিশ্বাস নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ছন্দ-প্রবাহ, শব্দ-বিন্যাসে এবং কবিতার চরণের গতি দ্বারাই তা ধরা পড়েছে। এভাবেই আমরা দেখি যে রবীন্দ্রনাথ কত সংক্ষেপে অথচ কত প্রগাঢ়তায় তাঁর বিশ্বাসকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই পৃথিবীর চতুর্দিকে যে আনন্দ তা হচ্ছে লীলাময়ের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ মধুর মৈতালীর কথা বলেছেন। এ মধুর মৈতালী হচ্ছে সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে আনন্দ-চেতনায় উদ্ভাসিত তার বোধ। বৈদিক ঋষিরা যে কথা বলেছেন—"'দেবস্য পশ্য কাব্যম" অর্থাৎ এ বিশ্ব হচ্ছে দেবতার কাব্য। রবীন্দ্রনাথও সেই বোধকে গ্রাহ্য করেছিলেন। তাই তিনি সর্বত্র আনন্দকে দেখেছেন, মধুরকে দেখেছেন। যিনি সর্ব মুহূর্তে সুপ্রকাশ, যাকে বেদে আবিঃ বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথও সেই সুপ্রকাশকে আবিষ্কার করেছিলেন। ভূখণ্ডের সর্বত্র যে সবুজের মহামেলা তার মধ্যে স্রষ্টাকে আমরা আবিষ্কার করি যিনি এই সবুজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কবি বার বার বলেছেন বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে আমি দেখছি—এ অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলা হচ্ছে আমার কাজ। কবি বলেছেন :

"আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই,
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই
এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্য স্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।"

বেদের স্তোত্রকে অনুসন্ধান করুন, অথবা উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা উদ্বোধিত হউন, মূলতঃ এ সব কিছু সম্ভবপর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ভাল লাগা এবং ভালবাসার গুণে। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে ভাল-

বেসেছিলেন অপরিসীম তীব্রতার সঙ্গে। এ ভালবাসা সাধারণ দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর ভাল লাগা নয়, এ ভালবাসা হচ্ছে সকল অনুভূতি এবং চিন্তার প্রকরণ দিয়ে মর্মান্তিক তীব্রতার সঙ্গে ভালবাসা। শৈশবে যে ভালবাসার উন্মেষ ঘটেছিল, জীবন-সায়াহ্নে সে ভালবাসার কথা উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথ শেষযাত্রা করেছিলেন। 'সেঁজুতি'র একটি কবিতায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, যখন তিনি পৃথিবীতে থাকবেননা তখন যদি তাঁকে স্মরণ করতে হয় তবে বৃক্ষলতা এবং ছায়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাঁকে স্মরণ করা হবে। চৈত্রের শালবন যেখানে ছায়া বিস্তার করছে সেখানে তাকে পাওয়া যাবে। ঘন কিশলয়ের যে উদার সবুজ, যেখানে রৌদ্র ও অন্ধকার লুকোচুরি খেলে সেখানেও তাঁকে পাওয়া যাবে। এক কথায় প্রকৃতির অগাধ দাক্ষিণ্যের মধ্যে তিনি নিজেকে সর্বকালের জন্য যেন বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই যদি কেউ প্রকৃতিকে ভালবাসে এবং প্রকৃতির সজীবতাকে স্পর্শ করে তাহলেই সে যেন রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করবে, সে যেন রবীন্দ্রনাথের কবি-চৈতন্যের সঙ্গে একাকার হবে।

কবির ক্ষেত্রে কোনো একটি ভালবাসার সামগ্রী যদি না থাকে তবে তিনি কবিতা রচনা করতে পারেন না। তিনিই যথার্থ কবি যিনি ভালবাসতে শিখেছেন হয়ত কোনও মানুষকে, হয়ত কোনো ঘটনাকে। হয়ত ইতিহাসকে অথবা প্রাত্যহিক জীবনের সামগ্রীকে কিন্তু তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেই হবে যদি তাঁকে কবি হতে হয়। কবি যে কোনো একক সামগ্রীকে ভালবাসবেন তাই নয়, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামগ্রীকে আশ্রয় করতে পারেন। শেলী এক সময় "স্কাইলার্ককে" ভালবেসেছিলেন। শেলীর কল্পনায় এ পাখী যদিও সাধারণ শব্দে পাখী নয় তবুও তা অসম্ভব বাস্তব ছিল। ইয়েটস "বাইজানটিয়াম" নামক একটি অসম্ভব দেশের প্রেমে পড়েছিলেন। আবার দেখা যায়, কোনো কোনো কবি ধর্মের বিশ্বাসকে তাঁর একমাত্র প্রেমের অবলম্বন করেন। রবীন্দ্র-কাব্যে আমরা এ ভালবাসাকে পৃথিবীর ভালবাসা রূপে মূর্ত হতে দেখি। অত্যন্ত সংগোপনে রবীন্দ্রকাব্যে রমণীর ভালবাসাও আছে। কিন্তু সকল ভালবাসার আশ্রয় হচ্ছে এই ভূমণ্ডল। এর ফলে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বেদের সূক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত রেখেই ভিন্ন ভাবে বিবেচনা করতে পারি। যে

সময়ে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং যে কালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রসার সেই সময় এবং কালের দাবী ছিল একটি মগ্ন চৈতন্যের। চিন্তার রাজ্যে যখন বিবিধ প্রকার বিক্ষিপ্ততা, যখন এদেশে ঐশ্বর্যের পটভূমির পরিবর্তন ঘটছে, সে সময় রবীন্দ্রনাথ যে শব্দ উচ্চারণ করলেন সেই শব্দ হচ্ছে নির্ভরতার শব্দ। বাংলা কবিতায় এর পূর্বে এত বিপুলভাবে আনন্দকে গ্রহণ করবার প্রয়াস দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ বিপর্যয়ের মধ্যে একটি শান্ত অনাবিল প্রীতির সংবাদ এনেছিলেন, সে সংবাদ হচ্ছে ভালবাসার সংবাদ। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য এবং বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও ভালবাসার মৌলিক আবেগের কারণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত মৌল প্রেরণা-সঞ্জাত। তিনি তাঁর কবিতায় বেদ এবং উপনিষদের ভাব-সত্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কাব্য-মূর্তি নির্মাণ করেননি। বেদ এবং উপনিষদে এসেছে একটি সহজাত প্রবৃত্তির বশে এবং রবীন্দ্রনাথের মৌল উপলব্ধির সঙ্গে তা একাকার হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা সর্বপ্রকার সচেতনতা নিয়েও মৌলিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

দেখা যাবে যে কবি যে-শব্দ ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ তাঁর ভাষা, রীতি, ধ্বনি, ছন্দ, চরণ এবং স্তবকের মাধ্যমে তাঁর উপলব্ধিকে অথবা অনুভূতিকে একটি শান্ত মহিমায় প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কোনো কবির অনুকরণ করেননি। প্রথম জীবনে বলবার আবেগ তাঁর এত তীব্র ছিল, বর্ণনার বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে প্রত্যহ এত নতুন ছিল যে তিনি নতুন নতুন সুরে তাঁর সংবেদনশীল মনের সমস্ত ইচ্ছাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কারণেই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে একটি চলমানতা আছে, একটি সজীবতা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপন মৌলিকতার মধ্যে ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছেন। তিনি বেদ এবং উপনিষদকে অনুসরণ করেননি কিন্তু তার উপলব্ধিকে নিজের উপলব্ধিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কবিতার যে নতুন রূপকল্প নির্মিত হলো সেই রূপকল্পে বৈদিক স্তোত্রের ব্যঞ্জনা থাকতে পারে কিন্তু কবি তা নিজের অন্তরের সামর্থ্য দিয়েই গড়ে তুলেছিলেন। একেই বলা হয় অন্তর্নিহিত প্রাণ-চাঞ্চল্য অর্থাৎ inherent dynamism। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাব এবং রূপের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। রবীন্দ্র-কাব্য আস্বাদনের ক্ষেত্রে তত্ত্বকে আমরা সহজে এড়াতে পারি, তার কারণ

শব্দের মধ্যে কবিতার বাণীমূর্তি গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ধ্বনি, শব্দ, উপমা, রূপক এবং চরণবিন্যাসে সর্বত্র ভাব এবং রূপের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধকে আবিষ্কার করা যায়। একজন সজীব মানুষের দেহের রক্তের মধ্যে যে জীবন-কণিকা আছে সে জীবন-কণিকাকে যেমন রক্তের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি কবিতার ভাবকে রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বৈদিক কবিরা প্রকৃতির ঐশ্বর্য দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা তদগত কন্ঠে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সে উচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে তাঁদের জীবনের বিস্ময়, জিজ্ঞাসা এবং আনন্দ একই সঙ্গে রূপলাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই আমরা ভাব এবং ভাষার এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধকে আবিষ্কার করি। এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের উদাহরণ স্বরূপ "চঞ্চলা" কবিতার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি :

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লওনা কিছু, করনা সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।"

বেদে অথবা উপনিষদের যুগে, ব্যবহৃত শব্দের বর্তমান কালে যে ব্যাপক অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতা আছে, তা ছিল না। আমরা বর্তমানে অতীতের বাণীকে নতুন অর্থ-ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করছি। কিন্তু যখন এই বাণীগুলো গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছিল তখন বর্তমান কালে আমরা যে ভাবে তাকে মহিমময় করছি, সেভাবে তাদের সে মহিমময় রূপ ছিলনা। নিছক কাব্য-কুশলতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে আমরা বলব যে প্রাচীন যুগে শব্দ-সম্ভার ছিল কম এবং শব্দের উপর মানুষের অধিকার ছিল কম। কিন্তু মানুষের উপর শব্দের অধিকার ছিলো প্রচণ্ড। সীমাবদ্ধতাই ছিল সেই শব্দের সৌন্দর্য এবং অলংকার। শব্দ তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একই সত্যকে বার বার সচকিত করেছে, যার ফলে মানুষ অভিভূত হয়েছে এবং বিনীত হয়েছে। আমি এখানে ঋগ্বেদ

সংহিতার প্রথম সূক্তের অনুবাদ উপস্থিত করছি। দেখা যাবে যে একই শব্দকে অল্প কিছু পরিবর্তন সহ বার বার উপস্থিত করা হয়েছে। যার ফলে ধ্বনিগত পুনরাবৃত্তির স্থষ্টি হয়েছে এবং মন্ত্রোচচারণ কালে সম্মোহনের সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে:

১. দেবগণের পুরোহিত, যজ্ঞের দীপ্যমান সম্পাদক, দেবগণের আহবানকারী এবং যজ্ঞ-ফল-স্বরূপ রত্নসমূহের দাতা অগ্নি-দেবকে আমি স্তব করি।

২. পূর্বকালীন ঋষিগণ অগ্নিদেবকে স্তব করতেন এবং আধুনিক ঋষিগণও করে থাকেন। সেই অগ্নিদেব দেবতা সকলকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩. যজমান অগ্নিদেবের কৃপায় প্রতিদিন ধন এবং সম্পদ প্রাপ্ত হউন। ধন এবং সম্পদ থাকলেই কীর্তি লাভ হয় এবং অনেক বীর পুরুষদিগের সাহায্য পাওয়া যায়।

৪. হে অগ্নি, যে রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্য জাতিদিগের হিংসারহিত নির্বিঘ্নে সমাপ্ত যজ্ঞকে আপনি সর্বদিকে সম্যকরূপে রক্ষা করেন, সেই যজ্ঞই কেবল দেবগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত স্বর্গে গমন করে।

৫. যজ্ঞ-নিষ্পাদন দ্বারা কর্মকুশল, কপট-রহিত, অতিশয় কীর্তিবিশিষ্ট হোম-নিষ্পাদক অগ্নিদেব অন্যান্য দেবতার সঙ্গে এই যজ্ঞে আগমন করুন।

৬. হে অগ্নিদেব, হে অঙ্গির, আপনি হবির্দাতা যজমানের যে কল্যাণ করেন তা সত্যিই আপনারই উপযুক্ত।

৭. হে অগ্নিদেব, ভক্তিপূর্বক নমস্কার করে আমরা প্রতিদিন রাত্রিতে প্রকাশমান আপনাকে অর্চনা করতে আপনার সমীপে আগমন করি।

৮. যজ্ঞের রাজা এবং সত্য আর্য্যধর্মের প্রসিদ্ধ রক্ষক এবং যজ্ঞশালাতে হবিঃ দ্বারা বর্ধমান অগ্নিদেবের নিকট আমরা প্রত্যহ পূজার্থে আগমন করি।

৯. হে অগ্নিদেব, পুত্র যেরূপ অনায়াসে পিতাকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই। আপনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে কল্যাণ প্রদানের জন্য থাকুন।

দেখা যাচ্ছে যে প্রথম সূক্তে প্রার্থনার যে একটি যতি-বিভাগ রয়েছে, তার একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সব কয়টি অনুবাক

একে অন্যের সঙ্গে ধ্বনি-সূত্রে এবং শব্দের পুনরাবৃত্তির সূত্রে গ্রথিত। এখানে সীমাবদ্ধতাই শব্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এ ভাষাকে আমরা আদিম ভাষা বলে আখ্যাত করতে পারি। বর্তমান কালের সঙ্গে বেদের যুগের ব্যবধান প্রচণ্ড। কবিতায় এক এক শব্দ এক এক রকম দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত হয়। আবার একই শব্দ বিভিন্ন দ্যোতনায়ও ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কালে কবিতাই হচ্ছে এমন এক বিশিষ্ট প্রচেষ্টা যার সাহায্যে মানুষ একটি অবস্থা নির্মাণ করে, যেখানে সে নিজেকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এই বেঁচে থাকবার কুশলী সাধনায় সে কখনও রহস্যবাদী, কখনও প্রকৃতিবাদী, কখনও যুক্তি-বিরোধী, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে প্রাণময়। কবি তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্তগুলোকে সর্বাংশে ভাস্বর রাখতে চান যা কবিতায় অভিব্যক্ত হয় বিশ্রাম রূপে অথবা আনন্দরূপে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বৈদিক স্তোত্রের ব্যঞ্জনা অথবা উপনিষদের নিগূঢ় রহস্যবাদ যতই থাকুক না কেন তার মধ্যে সর্ব মুহূর্তেই কবির সত্তা-চেতনার প্রতিফলন পড়েছে। এই প্রতিফলনের ফলেই রবীন্দ্রনাথের বাণীভঙ্গী অনন্য। আদিম ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েও সে ভাষাকে নিশ্চিতে গ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ নতুন ধ্বনি ও শব্দের বিবেচনায় নতুন রাজ্য নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় ব্যক্তি-চেতনার প্রকাশটাই প্রধান। যার ফলে প্রাচীন কালের স্তোত্রগুলো একটি চিত্তের অনুভূতিরূপে সুপ্রকাশ হয়েছে।

বেদে সূর্যকে যে ভাষায় বন্দনা করা হয়েছে সে ভাষার সুশৃংখল সীমা-বদ্ধ এবং পুনরাবৃত্তিমূলক একটি ভঙ্গী আছে। এই ভঙ্গীর কারণে এই বন্দনাগুলো একই সূত্রে গাঁথা এবং একই সুর এবং সঙ্গীতে সমন্বিত। যেহেতু বৈদিক কবিদের প্রধান বক্তব্য ছিল শক্তিপ্রার্থনা তাই শক্তি-প্রার্থনার নিমিত্ত যতভাবে সূর্যকে বন্দনা করা যায় ততভাবে তাঁরা সূর্যকে বন্দনা করেছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় পঞ্চাশৎ সূক্তে নিম্নরূপে সূর্যদেবতার বন্দনা করা হয়েছে—

১. সূর্যরশ্মিসকল সেই জাতবেদা সর্বজ্ঞ সূর্যদেবকে সকলের দৃষ্টি-গোচর করাবার জন্য উর্ধেতে বহন করে।

২. যে প্রকার প্রসিদ্ধ তস্করেরা সর্বপ্রকাশক সূর্যদেবের আগমন দেখে পলায়ন করে, তদ্রূপ রাত্রির নক্ষত্র সূর্যের আগমনে প্রস্থান করে অর্থাৎ অদৃশ্য হয়।

৩. প্রদীপ্ত অগ্নিসমূহের ন্যায় সূর্যদেবের রশ্মিসকল অনুক্রমে সমুদয় বস্তু প্রকাশ করে।

৪. হে সূর্য, আপনি আপনার উপাসকদিগের রোগের শান্তিদাতা অথবা মহাবেগশীল সকল প্রাণীর দর্শনীয় ও সর্বপ্রকাশক এবং আপনি ব্যাপ্ত দীপ্যমান অন্তরীক্ষকে সর্বতোভাবে প্রকাশ করুন।

৫. হে সূর্য, আপনি দেবগণের মধ্যে মরুদ্দেবদিগের সম্মুখে উদয় হন, আপনি মনুষ্যদিগের সম্মুখে উদয় হন এবং সমস্ত স্বর্গলোকবাসীদের গোচরীভূত হবার জন্য বলে তাদের সম্মুখে উদয় হন।

৬. হে সকলের পবিত্রীকারক, অনিষ্টনিবারক সূর্য, আপনি প্রাণী সকলকে এবং স্ব স্ব কর্মে প্রবর্তমান লোক সকলকে যে প্রকাশদ্বারা অনুক্রমে প্রকাশ করেন সেই প্রকাশকে আমরা স্তব করি।

৭. হে সূর্যদেব, আপনি দিন এবং রাত্রি উৎপন্ন করে এবং জন্ম-বিশিষ্ট প্রাণী সমূহকে প্রকাশ করে বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষলোকে বিশেষরূপে গমন করেন।

৮. হে সর্বপ্রেরক দীপ্তিমান সকলের প্রকাশক সূর্য, কেশ-সদৃশ তেজ-বিশিষ্ট আপনাকে সপ্তসংখ্যক অশ্বসকল রথে বহন করে।

৯. সর্বপ্রেরক সূর্য সপ্তসংখ্যক দোষ-রহিত অশ্বীদিগকে স্বীয় রথে যোজিত করেছেন, যে অশ্বীসকল রথে যোজিত হলে রথের আর পতনভীতি থাকেনা। স্বযোজিত সেই অশ্বীসকল দ্বারা তিনি যজ্ঞগৃহে গমন করেন।

১০. আমরা অন্ধকারাতীত, তেজস্বী উৎকৃষ্টতর দেবতাদিগের মধ্যে দানাদিগুণবিশিষ্ট সূর্যকে উপাসনা করে সেই সূর্যের উত্তম জ্যোতি প্রাপ্ত হই।

১১. হে সকলের হিতকর দীপ্তিযুক্ত সূর্য, অদ্য আপনি উদয় হয়ে এবং উচ্চতর অন্তরীক্ষলোকে আরোহণ করে আমার হৃদয়গত রোগ এবং শরীরগত বাহ্য হরিদ্বর্ণ রোগ নাশ করুন।

১২. আমরা হরিদ্বর্ণযুক্ত শুক এবং শারিকা পক্ষীতে আমাদের শরীর-গত হরিদ্বর্ণ স্থাপন করেছি এবং হরিতাল বৃক্ষেও আমাদের শরীরগত হরিদ্বর্ণ স্থাপন করেছি।

১৩. আমি আমার শত্রুকে বিনাশ করিনা কিন্তু এই অদিতির পুত্র সূর্যদেব আমার শত্রুকে বিনাশ করে সম্পর্ণ বলের সঙ্গে উদয় হন।

দেখা যাচ্ছে যে সূর্যকে বন্দনা করা হয়েছে শক্তি লাভের জন্য, সর্ব-প্রকার রোগ থেকে নির্মুক্ত হবার জন্য। বৈদিক ঋষিদের বিবেচনায় সূর্য সবকিছু পবিত্র করে এবং পবিত্র করে বলেই সূর্যের আর এক নাম হচ্ছে পাবক এবং সকল অনিষ্টকে নিবারণ করে বলেই সূর্যের অন্য নাম বরুণ। তাঁদের বিবেচনায় সূর্য হচ্ছে পরম আত্মা। এই অর্থে পরমাত্মা যে, সূর্য হচ্ছে অন্ধকারের অতীত। সুতরাং সূর্যের সাযুজ্য লাভ করা মানুষের একমাত্র কাম্য। প্রাচীন ভারতে সূর্যের অর্চনা প্রচলিত ছিল। সূর্যকে পাপনাশ, ব্যাধিনাশ ও বিষনাশ করবার জন্য প্রার্থনা করা হোত। সূর্যদেব অনন্ত সুখ এবং মুক্তিও প্রদান করতেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে ঋষিগণ সূর্যের নিকট যে প্রার্থনা করেছিলেন, সেই প্রার্থনা তাদের ব্যক্তিগত আকাংখার অথবা নিভৃত একান্ত চিন্তার কোনো পরিচয় বহন করেনা। প্রার্থনাগুলো ছিল প্রতিনিধিত্বস্থানীয় অর্থাৎ মানবের হিতার্থে এ প্রার্থনা। তাই দেখা যায় এখানে শব্দ-ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ এবং বিশেষ কয়েকটি অর্থেই শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে। সে অর্থ হচ্ছে শক্তি-সঞ্চয়, অকল্যাণ থেকে মুক্তি এবং জ্যোতির্ময় হওয়া। রবীন্দ্রনাথের সূর্য-বন্দনায় আমরা বৈদিক অর্চনাকে পটভূমি হিসেবে পাই এবং একই সঙ্গে একজন কবির একান্ত নিভৃত আকাংখাকেও রূপলাভ করতে দেখি। এটা সম্ভবপর হয়েছে শব্দের প্রকাশ-ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে। রবীন্দ্রনাথের যুগে সময়, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে সব দিকে বহুদূর প্রসারিত। শব্দকেও তাই এই প্রসারকে মান্য করতে হয়েছে। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সূর্যকে নিম্নরূপ বন্দনা করেছেন :

"জীবনবহনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে
ললাট করুক স্পর্শ
অনাদি জ্যোতির দান-রূপে—
নব নব জাগরণে প্রভাতে প্রভাতে
মর্ত এ আয়ুর সীমানায়।
ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্তলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রিসম।

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।"

কবিতাটিতে আমরা লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথ অনাদি জ্যোতি লাভ করবার জন্য সূর্যের বন্দনা করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি তাঁর অতীতকে সর্যের উদ্ভাসনায় অবলোকন করতে চেয়েছেন যে অতীত হচ্ছে মৃত্যুর অতীত। রবীন্দ্রনাথের এই শেষের বক্তব্যটুকু একান্তভাবে একটি ব্যক্তি-চেতনার ফলশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাটি প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। এটা হচ্ছে একজন কবির একটি প্রগাঢ় একান্ত অনুভূতির প্রকাশ। 'অন্য দিনের' অন্য একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সূর্যের স্তব করতে যেয়ে স্পষ্ট ভাষায় বৈদিক যুগের ঋষি-বাক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যে এতদিন তিনি মহা অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে লীন ছিলেন। আজ একটি বিশেষ দিবসের উষালগ্নে প্রাচীন যুগের ঋষি-বাক্য তাঁর মনে পড়েছে— সমস্ত অন্ধকার দূর কর এবং তোমার পরমতম জ্যোতি তুমি প্রকাশ কর—

"সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসার পরপার,
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, পৃথিবীতে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ তিনি বহুদিন পেয়েছেন এবং যে মুহূর্তে অমৃতের স্বাদ তিনি পেয়েছেন সে মুহূর্তে অনির্বচনীয়কে তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর এই উপলব্ধিগুলোকে নৈবেদ্য হিসেবে পৃথিবীতে রেখে যাবেন। এখানকার বক্তব্য একান্তভাবে একটি ব্যক্তি-চেতনার বক্তব্য।

ঋষি-বাক্যে এই ব্যক্তিচেতনা অনুপস্থিত ছিল। আর একটি কবিতায় তিনি বলছেন —

"সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্র পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ—
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।"

এখানেই দেখা যায় উক্তিটি একান্তভাবে ব্যক্তিগত অনুভূতির ফল-স্বরূপ। ঋষিবাক্যে ঠিক এই স্বভাব ধরা পড়েনি। যেমন ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের আটচল্লিশ সূক্তে আছে "হে ঊষাদেবী ভানুর উদয় ও অস্তকালে প্রভারূপে অন্তরীক্ষের দুই দ্বারে আবির্ভূত হও। আমাদের বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর, অভিষ্ট প্রদান কর"। এই উক্তিটি সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের আনন্দ অথবা চিন্তা অথবা প্রতিক্রিয়া এর মধ্যে নেই। এই বক্তব্য একের নয়, সর্বভূতের। এ ভাবে আমরা বেদের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণীর ঐক্য-সূত্র যেমন আবিষ্কার করতে পারি, তেমনি মূল চিন্তার ক্ষেত্রে পার্থক্যও নির্ণয় করতে পারি।

বৈদিক যুগে বেদের সূক্ত মানুষের জন্য ছিল পরম অমোঘ। মানুষ তার প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করত। ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অগ্নির সাহায্যে তাপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং জীবন যাত্রায় সর্ব প্রকার বিঘ্ন বিনাশের উদ্দেশ্যে সে যুগের মানুষ মন্ত্রোচচারণ করত। পূর্বে বলেছি যে সূর্যকে বন্দনা করা হোত শক্তি লাভের জন্য। সে যুগের মানুষ স্থূল ভাবে বিশ্বাস করত যে যজ্ঞ করলে, আহুতি দিলে এবং স্তব করলে যথার্থই শক্তি লাভ করা যায়। সে সময় এগুলোর কোনো রূপকগত ব্যঞ্জনা ছিলনা। এগুলো যথার্থ সত্য হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সময়ে ঋষি-বাক্যগুলো রূপকের ব্যঞ্জনায় আকর্ষণীয় হলো। রবীন্দ্রনাথ সূর্যের স্তব করেছেন আপন উপলব্ধি এবং অনুভূতির প্রকাশের একটি পর্যায়-ক্রমে। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তাঁর যত কিছু অনুভূতি সেগুলোকে বিভিন্ন উপমা ও রূপকের সাহায্যে উপস্থিত করা। বৈদিক সূক্তের সহায়তায় এটা অত্যন্ত সহজে সম্ভবপর হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা শব্দের প্রসার ঘটেছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে শব্দের অর্থের ততটা ব্যাপকতা আমরা লক্ষ্য করিনা যতটা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের কালে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। শব্দের এই ব্যাপকতর অর্থ-ধারণ ক্ষমতা সম্ভবপর হয়েছিল একারণে যে, রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যলোক সকল ক্ষেত্রেই আপন অনুভূতি এবং জিজ্ঞাসাকে প্রভাবিত করেছিলেন। এর ফলে প্রকৃতিকে স্পর্শ করে, মানুষকে স্পর্শ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিককে স্পর্শ করে রবীন্দ্রনাথের বাণী মূর্তি-লাভ করেছে। এসব ক্ষেত্রে বৈদিক যুগের ঋষি-বাক্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য নয়। অর্থাৎ ঋষি-বাক্যকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ অনুভূতিতে পৃথিবীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন এবং সৃষ্টির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে এ কথা কিন্তু বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে প্রাচীন যুগের নিকটতম প্রতিবেশী আবার বহু দূরের অভিযাত্রী।

'রঘু-বংশে' কবি কালিদাস বলেছেন যে শব্দ ও অর্থ হচ্ছে একে অন্যের সঙ্গে সংপৃক্ত বা নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত। সে জন্যই তিনি 'রঘু-বংশ' মহাকাব্যের আরম্ভে শব্দ ও অর্থের প্রতিপত্তির নিমিত্তে শব্দ ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সংবদ্ধযুক্ত পার্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করেন। কাব্যে যে শব্দ ব্যবহার হয় অথবা যে শব্দ কাব্যের উপাদান, সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করেই সে কাব্য শরীর গড়ে তুলতে পারে। কবিতায় শব্দের যে প্রয়োগ-বিধি, সেই প্রয়োগবিধি বিশিষ্টার্থিক এবং শব্দের দায়ভাগ হচ্ছে অনির্ব-চনীয়কে নিয়েই অর্থাৎ অর্থের অতীতকে নিয়ে। এ জন্যই আমরা দেখি যে কবিতায় শব্দ আভিধানিক অর্থ বহন করেনা। ছন্দ এবং সুর-সম্মো-হনে তাতে অনির্বচনীয়ের স্পর্শ লাগে এবং প্রয়োগ-কৌশলে শব্দ একটি ইন্দ্রজাল নির্মাণ করে। অতীতে শব্দে সুর এসে সংযোজিত হোত এবং সুরের মাধ্যমে সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল রচনা করে শব্দগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করত। বৈদিক যুগে মিলিত হয়েছিল শব্দ এবং সুর। রবীন্দ্রনাথের কালে শব্দের অনির্বচনীয়তা শুধু সুরের কারণে হয়নি, আধুনিক যুগে বহুবিধ রসের স্পর্শে তা সম্ভবপর হয়েছে। বৈদিক যুগের মন্ত্রকে যদি আমরা বলি সুর-সম্মিলিত কাব্য, তাহলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে বলব শব্দের সাহায্যে অমৃত সৃজনের চেষ্টা যা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে

আপনাকে প্রকাশ করে। শ্যামলী কাব্যগ্রন্থে 'কালরাত্রে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"চেতনার সঙ্গে আলোর রইলনা কোনো ব্যবধান।
প্রভাত সূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ;
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম 'চাই নে কিছু চাই নে—'
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা।"

এখানে আমরা দেখি, যে অর্থে বৈদিক মন্ত্রে সুরের সংযোজন ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অবিকল সেই অর্থে সুরের সংযোজন ঘটেনি। এখানে নতুন যুগের পরিসরে নতুন চেতনায় নতুন একটি মহিমা এসেছে কবির বাণীভঙ্গীতে। এই মহিমা এবং বেদের সূক্তের মহিমা এক নয়। এই মহিমাকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিশেষ শক্তি হচ্ছে গ্রহণ করার শক্তি এবং সমভাবে অন্য একটি শক্তি হচ্ছে দান করার শক্তি। বৈদিক ঋষির বাণীকে তিনি গ্রহণ করেছেন। সেই গ্রহণ করা হচ্ছে দুর্গম গিরিশিখরের উৎসমূলে যে নির্ঝরিণী তাকে গ্রহণ করা, কিন্তু সেই নির্ঝরিণীকে গ্রহণ করে উদার ধারায় সমুদ্রে এনে মিলিয়েছেন তিনি। আদি উৎসকে গ্রাহ্য না করলে এ ধারাকে আবিষ্কার করা যায়না। আবার এই ধারা আদি উৎসেরই নবীনতম বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ আপন শৈশবের কথা বহুবার বলেছেন, যে শৈশবে তিনি অন্ধকার রাত্রির শেষে উদীয়মান নবীন সূর্যকে আপন চেতনায় প্রতিদিন জাগ্রত করেছেন। শৈশবে পিতার কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন আলোর মন্ত্রে দীক্ষা এবং জীবনে তিনি এই সূর্যের আলোককে নানাভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আমরা বলতে পারি, আলোর স্পর্শে তিনি আপন চেতনাকে নির্মল করেছেন। এখানে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রচণ্ডভাবে

সক্রিয়, সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে এ উক্তির সাযুজ্য তাঁকে মহিমান্বিত করেছে। "পত্রপুটের" একটি কবিতায় তিনি এ সূর্য বন্দনা করেছেন নিম্নরূপে :

"বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলক কম্পিত অন্তরে
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে,
ভেঙ্গে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা বসে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়িতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ স্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।"

এখানে আমরা দেখছি যে রবীন্দ্রনাথ সূর্যের প্রথম প্রকাশকে দৃষ্টি-গোচর করেছেন তাঁর পরিচিত পৃথিবীর পরিমণ্ডলে, তাই এখানে নারকেল শাখা আছে, ভেঙ্গে-পড়া শ্যাওলা-ধরা দেয়াল আছে এবং কবির চৈতন্য এ সমস্ত কিছুকে আশ্রয় করেই এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত অতিক্রম করেই। তার পরে সূর্যকে বিরাট বাষ্পদেহ বলা আধুনিক বিজ্ঞানের কৌশল মেনেই বলা—তিনি প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে অনাদিকালের অস্পষ্ট বার্তা শুনেছেন। এ ভাবে আমরা দেখি যে বর্তমান কালের সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন রহস্যের উদঘাটন করতে চেয়েছেন। 'পত্র-পুটের' অন্য একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তিনি প্রতিদিন প্রভাতে তাঁর জাগরণকে সূর্যের বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায় প্রসারিত করে দেন এবং তিনি

প্রার্থনা করেন সূর্যের কাছে এই বলে—'হে সূর্য, তুমি আমার এই দেহের সর্ব আচ্ছাদন সরিয়ে এবং এই দেহকে সরিয়ে দাও। তোমার তেজময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায় আমার দেহের যে অণুপরমাণু গঠিত সেই অলক্ষ্য অবর্ণনীয় তোমার কল্যাণতম রূপ আমার নিবারিত দৃষ্টিতে প্রকাশিত হোক।' এই উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচেতনা অসম্ভব প্রবল। এটা একজন কবির চিত্তের নিগূঢ়তম উপলব্ধি। বৈদিক মন্ত্রের প্রার্থনা ছিল নৈর্ব্যক্তিক। সেখানে আহুতি এবং তর্পনের সকল মন্ত্র কোনো ব্যক্তির মন্ত্র নয়, তা হচ্ছে সকল মানুষের জন্য। সেই মন্ত্রের বিশেষ একটি অনুশাসন আছে সকলের জন্য, বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে সকল মানুষের জন্য। তা একান্তভাবে একাগ্র কোনো তন্ময়তা নয়, তা হচ্ছে সর্বজনগ্রাহ্য সম্মোহন মন্ত্র। সেখানকার ঐক্যতান সম্ভবপর হয়েছে সঙ্গীতের সংযোজনে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, অর্থ বিশ্লেষ করে দেখলে যে কথাটি যৎসামান্য এই সঙ্গীতের দ্বারাই তা অসামান্য হয়ে ওঠে। বৈদিক বাণীও সঙ্গীতের আশ্রয়েই অসামান্য হয়েছে। বৈদিক বাণীতে আমরা দেখি যে ঋষিদের চিত্ত সমস্তের মধ্যে নিমগ্ন। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলছেন—

> "আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
> অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
> সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন; অক্লান্ত বিস্ময়
> যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
> পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
> সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
> নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে।"

"পত্রপুটের" এক সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন যে অবারিত আকাশের দিগন্তে যখন তিনি সূর্যকে দেখলেন তখন তাঁর মনে হল যেন পৃথিবী জ্যোতির প্লাবনে বিহ্বল হয়েছে এবং সে যেন উন্মুখ হয়ে আছে তার সকল কথা থামিয়ে দিয়ে। এই যে বিহ্বলতা সে বিহ্বলতায় কোনো মন্ত্র মন্ত্রিত হয়ে ওঠেনি, কেননা কবি বলছেন মন্ত্র রচনার যুগে তাঁর জন্ম হয়নি। এই কবিতায় আমরা দেখতে পাই যে কবি বেদের উপর কতটা নির্ভর করেছিলেন। কবিতার কথাগুলো হচ্ছে এই:

"শিখরে গিয়ে পৌছলেম অবারিত আকাশে,
সূর্য নেমেছে অস্তদিগন্তে
নদীজালের রেখাঙ্কিত
বহুদূরবিস্তীর্ণ উপত্যকায়।
পশ্চিমের দিগবলয়ে,
সুরবালকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণসুধার পত্রখানা বিপর্যস্ত,
পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।
প্রমোদমুখর সঙ্গীরা হ'ল নিস্তব্ধ।
দাঁড়িয়ে রইলেম স্থির হয়ে।
এসরাজটা নিঃশব্দে পড়ে রইল মাটিতে,
পৃথিবী যেমন উন্মুখ হয়ে আছে
তার সকল কথা থামিয়ে দিয়ে।
মন্ত্ররচনার যুগে জন্ম হয়নি,
মন্ত্রিত হয়ে উঠলনা মন্ত্র
উদাত্তে অনুদাত্তে।"

'পত্রপুটে'র পাঁচ সংখ্যক কবিতায় আবার বেদমন্ত্রের উল্লেখ আছে—

"একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র
তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—
পৃথিবীর ধূলি মধুময়।
সেই সুরে আমার মন বললে—
সঙ্গীতময় ধরার ধূলি।
আমার মন বললে—
মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,
তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে
গানের পাখায়।"

অতীতের বেদমন্ত্রগুলো রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নতুন ভাষা ও আবেগ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। যদি কবি রবীন্দ্রনাথ এগুলোকে ব্যবহার না করতেন অথবা বলা যায় এগুলোর দ্বারা উদ্বোধিত না হতেন তা হলে বৈদিক মন্ত্রের মূল্য থাকত শুধু মাত্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে এবং শুধুমাত্র

সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে আবদ্ধ থাকলে আমরা বেদের সম্মোহন পেতাম না, বেদের দেহ-মাত্র অবশিষ্ট পেতাম। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা বেদের শব্দগুলোকে নতুন পরিমণ্ডলে নতুন অর্থের দ্যোতনায় প্রকাশিত হতে দেখলাম এবং এই শব্দগুলোর মধ্যে বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময়, পরিবর্তন-শীল মুখশ্রী দেখতে পেলাম। বেদ যদি শুধু পণ্ডিতদের অবলম্বন হত তাহলে আমরা কতকগুলো কথা শুনতে পেতাম মাত্র এবং তার স্বরের উচ্চ-নীচতা এবং মাধুর্য পেতাম না। নিশ্চয়ই তার অর্থবোধ আমাদের হোত কিন্তু সেই অর্থকে আমাদের হৃদয়ের রক্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারতাম না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বৈদিক বাণীগুলো সমস্ত তত্ত্বের ব্যবধান অতিক্রম করে হৃদয়ের রক্তে বিচিত্রিত হয়েছে এবং এখানেই আমরা বলব যে বৈদিক বাণীর নবতম সার্থকতা।

যে সময় বেদ রচিত হয় তখন ভারতবর্ষের মানবজাতির সঙ্গে বেদের একটা সম্পর্ক ছিল—বেদ ছিল সে সময়ের মানুষের যত্ন ও আদরের সামগ্রী। সেই যুগের মানুষের প্রাচীন বৃত্তান্ত, রীতি, নীতি এবং কুশল-অকুশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে বেদ আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যা থেকে লৌকিক ও পারমার্থিক ধর্মাধর্মজ্ঞান পাওয়া যায় তারই নাম বেদ এবং প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দ্বারা যা বোধগম্য হয়না, বেদের মাধ্যমে তা জ্ঞাত হওয়া যায়। পুরাকালের ঋষিগণ কর্তৃক লৌকিক এবং পারমার্থিক কর্তব্যাকর্তব্য কর্মের শাসনরূপ শাস্ত্রই হচ্ছে বেদ। বেদ এবং উপনিষদ হচ্ছে, তত্ত্বজ্ঞদের মতে পরা এবং অপরা জ্ঞান। সাধনভূত ধর্মজ্ঞানের হেতু বলে বেদের কর্মকাণ্ডের নাম অপরা বিদ্যা এবং পরম পুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু বলে উপনিষদের নাম পরাবিদ্যা। এই পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপলব্ধির আকর হয়েছিল, যার ফলে আমরা সেই প্রাচীন যুগের মন্ত্রকে নতুন জীবনধারার অনুভূতি এবং উপলব্ধির মধ্যে আবিষ্কার করলাম। যে কোনো কবিই অতীতের কোনো না কোনো বাণীর উপর নির্ভরশীল থাকেন, অতীতের কোনো কন্ঠস্বরের সঙ্গে যদি তার কন্ঠস্বরের কোনো সাযুজ্য না থাকে তা হলে তার পক্ষে নতুন উচ্চারণ-বিধি নির্মাণ করা সম্ভবপর হয় না। রবীন্দ্রনাথ যদিও শৈশবে বিহারীলালের ছন্দ ও ভাবের আবেশে বিহ্বল হয়েছিলেন কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সে আবেশ কাটিয়ে ওঠা

তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল বেদ এবং উপনিষদের উপর তাঁর নির্ভরতা জেগে-ছিল বলেই। 'পত্রপুটে'র পনের সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
স্বষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ—
আর স্বষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে বলছেন যে তিনি বৈদিক মন্ত্রকে মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেননি, তিনি সেই মন্ত্রের মধ্যে স্বষ্টির যে প্রথম রহস্যের ইঙ্গিত আছে সেই ইঙ্গিতকে আবিষ্কার করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় জ্যোতি-র্ময়তা তখনই সম্ভবপর যখন চিত্তে আনন্দ রূপ লাভ করে। বহু যোজন দূরে একদিন ভারতের ঋষিগণ সূর্যের কিরণচ্ছটা লক্ষ্য করে পুলকিত হয়েছিলেন এবং তাকে বন্দনা করেছিলেন শক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। রবীন্দ্র-নাথ তাঁর পরিচিত শ্যামা পৃথিবীতে প্রভাতের সূর্যকে দেখেছেন 'রূপোলী কল্কায়' এবং সূর্যাস্তকালে তিনি দেখেছেন সোনালী জরীর আঁচলে। এই যে সূর্যের নবতম ঐশ্বর্য এই ঐশ্বর্য প্রাচীন যুগের ঐশ্বর্যের সঙ্গে সমন্বিত সন্দেহ নেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তত্ত্বের দিক থেকে সমন্বিত নয়, চিত্তের আনন্দের দিক থেকে সমন্বিত।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের শেষ ৬২ সূক্তের একটি ঋক হোল প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। এই সূক্তে সূর্যের স্তব করা হয়েছে। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ এই স্তবের দ্বিবিধ অর্থ করেছেন। একটি হচ্ছে পরম ব্রহ্মের জ্যোতি, অন্যটি হচ্ছে সূর্যের জ্যোতি। সম্পূর্ণ সূক্তটির বাংলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল—

"হে ইন্দ্র ও বরুণদেব, আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মন্যমান এবং ভ্রমণ-শীল এই প্রজাগণ যুবা এবং বলবান রিপু কর্তৃক যেন বিনষ্ট না হয়। আপনাদের মতো যশ আর কোথায় আছে, যে যশ দ্বারা মিত্রতাবদ্ধ আমাদের

অন্ন প্রদান করেন। হে ইন্দ্র ও বরুণ ধনলাভের আকাংখা যাদের আছে মহান যজমান রক্ষার জন্য তারা আপনাদের আহবান করেন। মরুৎগণ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর সঙ্গে সংগত হয়ে আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। হে দেবদ্বয়, আমরা যেন সেই অভিলষিত বস্তু এবং সেই সর্বকর্মে সামর্থ-বিধায়ক অর্থ প্রাপ্ত হই। সকলের বরণীয় দেবপত্নীগণের রক্ষার সঙ্গে এবং হবনীয় সরস্বতী গোরূপ দক্ষিণার সঙ্গে আমাদেরে রক্ষা করুন। হে সর্বদেবহিত বৃহস্পতি, আমাদের দ্রব্যাদি গ্রহণ করুন এবং আমাদের ধন দান করুন। হে ঋত্বিকগণ, বৃহস্পতিদেবকে তোমরা স্তোত্রের দ্বারা নমস্কার কর। আমরা তার অনভিভবনীয় তেজের স্তুতি করছি। মানুষের ফল-দাতা অনভিভবনীয় এবং ব্যাপ্তরূপ বরেণ্য বৃহস্পতিকে নমস্কার কর। হে দীপ্তিমান পূষন, এই নতুন স্তুতি আপনার উদ্দেশ্যে আমরা কীর্তন করছি। হে পূষন, স্তুতিকারক আমার এই স্তুতি গ্রহণ করুন এবং স্তুতির দ্বারা প্রীত হয়ে অন্ন ইচ্ছাকারিণী ও হর্ষ ইচ্ছাকারিণী এই স্তুতি গ্রহণ করুন। যেমন স্ত্রীকামী পুরুষ স্ত্রীকে গ্রহণ করে। যে পূষাদেব বিশ্বজগৎ দর্শন করেন তিনি আমাদের রক্ষা করুন। . সবিতৃ দেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি যিনি আমাদেরে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। অন্ন ইচ্ছা করে আমরা স্তুতির সঙ্গে সবিতৃ দেবের এবং ভগদেবের দান প্রার্থনা করি। নেতৃস্থানীয় বিপ্রগণ যজ্ঞে শোভন স্তুতিদ্বারা সবিতৃদেবকে বন্দনা করে। পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃতি আবাস এবং যজ্ঞস্থানে গমন করেন। সোমদেব আমাদেরে এবং সর্বপ্রাণীকে অনাময়প্রদ অন্ন প্রদান করুন। সোমদেব আমাদের আয়ু বর্ধন এবং পাপনাশ করে হবির্ধানপ্রদেশে আগমন করুন। হে শোভন কর্মশীল মিত্র ও বরুণ দেব, আপনারা আমাদের গাভীকে দুগ্ধপূর্ণ করুন এবং জল মধুময় রসবিশিষ্ট করুন। বহুস্তত এবং স্তুতিবৃদ্ধ শুদ্ধ ব্রত আপনারা দীর্ঘ স্তুতির দ্বারা শক্তির ঈশ্বর হউন। জমদগ্নি ঋষি কর্তৃক স্তুত হয়ে যজ্ঞ-বর্ধক আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করুন এবং সোম পান করুন।''

সায়নাচার্য এই গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা সূত্রে বলেছেন যে সবিতা পরম ব্রহ্ম আবার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে সবিতা সূর্যও বটে। পরম ব্রহ্ম বলার কারণ, যেহেতু গায়ত্রী-মন্ত্র আর্যজাতির ধ্যান-ধারণার সর্বস্ব তাই এই গায়ত্রীতে সবিতা অর্থে পরম ব্রহ্মকেই বুঝান হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীকালে সবিতা শব্দের ব্যাখ্যাস্বরূপ পরম ব্রহ্মের কথা বলা হলেও যেহেতু ঋগ্বেদে সবিতার সঙ্গে পূষা, মিত্র, বরুণ প্রভৃতির নাম যুক্ত আছে তাতে সবিতৃ শব্দ সূর্য ভিন্ন আর কিছুই বুঝাতে পারেনা। বিশ্বামিত্র সূর্যকে জগতের সাক্ষী, সর্ব দর্শক এবং সর্ব কল্যাণকর বলে স্তুতি করেছেন। সূর্যের তেজ ধ্যান করার অর্থ হচ্ছে সূর্যের স্তুতি কীর্তন করা। বৈদিক যুগের ঋষিগণ সূর্যকে বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক এবং পথ প্রদর্শক বলে তার গুণগান করতেন। আমরা গায়ত্রী মন্ত্রে দেখতে পারছি যে সূর্যকে স্তব করা হয়েছে সামর্থ লাভের নিমিত্ত। দেবতারা সূর্যের স্তুতি করেছেন, আহার্য সংগ্রহের কামনায় এবং যে সমস্ত বস্তু গ্রহণ করে মানুষ বলবান হয় সেই সমস্ত বস্তুর মর্যাদা রাখবার জন্যই প্রাচীন ঋষিদের সূর্যের তপস্যা। দুগ্ধের প্রত্যাশায় তাঁরা সূর্যকে স্তুতি করতেন যেন গাভী দুগ্ধ-পূর্ণ হয়। যে জল মানুষের প্রাণ ধারণের উপায় তাতে যেন কটুস্বাদ না থাকে। সেই জন্যই ঋষিদের প্রার্থনা যেন জল মধুর রসবিশিষ্ট হয়। মূলতঃ গায়ত্রী-মন্ত্রে সংসার বিনাশের উপাদান নেই, বরঞ্চ সংসারকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করে তাকে সমৃদ্ধমান করবার আকাংখা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যে সূর্য হচ্ছে তিমিরবিদারক একটি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। যে আবির্ভাবে আনন্দলোকের দ্বার খুলে যায় এবং আকাশ পুলকময় হয় এবং দীপ্তিময় হয় সমস্ত অস্তিত্ব ; 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে 'বিজয়ী' কবিতার শেষ স্তবকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্ব-চেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে ;
মশাল-ভস্ম লপ্তি-ধুলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলক-ময়---
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।"

"পূরবীর" 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ নতুনের প্রকাশকে বরণ করেছেন এই বলে যে সূর্যের মতন তাঁর আবির্ভাব হোক এবং সে আবির্ভাব হবে রিক্ততার বক্ষ বিদীর্ণ করে এবং সে আবির্ভাবে জীবনের জয় ঘোষিত হবে এবং নতুনের মধ্যে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময় চিহ্নিত হবে---

"হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হ'ক কুজ্ঝটিকা করি উদঘাটন
সূর্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি---
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হ'ক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হ'ক তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"

"পূরবীর" 'সাবিত্রী' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সূর্যের এই আবির্ভাবের কথা বিচিত্র বিন্যাসে উপস্থিত করেছেন। বলছেন, সূর্যের জ্যোতি কবির চিত্তে উদ্দাম আবেগ সঞ্চার করেছে এবং তিনি অনুভব করছেন যে সূর্যের অগ্নিগোলকের মধ্যে তার সত্যের হোমাগ্নি রয়েছে এবং সূর্যের প্রকাশমান দীপ্তিতে কবির প্রাণ যেন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই সর্বজীবন-ব্যাপী সূর্যের সঙ্গে নিজের সম্পক সন্ধান করেছেন। তিনি যখন সূর্যকে দেখছেন তখন তিনি অনুভব করছেন যে সূর্যের আর্বির্ভাবকে বেষ্টন করে রয়েছে একটি অনির্বচনীয়ের পরিচয়। এই অনির্বচনীয় হচেছ আনন্দ-স্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপেই দেশ কালের মধ্যে তার প্রকাশ। 'শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থে 'কর্ম' অধ্যায়ে কবি বলছেন যে মানুষ এই পৃথিবীতে চিরদিন আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে এবং সেআপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। অন্ধকার এবং অস্পষ্টতার মতো ভয়ঙ্কর বন্ধন এতে নেই। অস্পষ্টতাকেই ভেদ করে উঠবার জন্য অঙ্কুরের চেষ্টা এবং কলির মধ্যে ফুলের প্রকাশ। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিচিত হবার জন্য আমাদের ভিতরকার ভাবপুঞ্জগুলো বাইরের আকার গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচেছ। মানুষের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্য কেবলই কর্ম স্থষ্টি করছে। যে কর্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবন-যাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয়, তাকেই সে তৈরী করে দিচেছ, কেননা সে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। রবীন্দ্র-কাব্যে এই নিজেকে দেখতে চাওয়ার ইতিহাস সূর্যের স্তবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি সূর্য বন্দনা

যখন করেছেন তখন তার মধ্যে তাঁর চিত্তের গভীরতম আগ্রহকে শব্দে তুলে ধরেছেন। "লিপি" কবিতাটিতে এই আত্মপ্রকাশের অসহনীয় আনন্দের একটি বিবরণ আছে—

"প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।
তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি,
তৃণে তৃণে কন্ঠ তুলি
উর্ধ্বে চেয়ে কয়—
জয়, জয়, জয়।
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয়;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জি উঠি কয়---
জয়, জয়, জয়।"

বৈদিক যুগের ক্ষেত্রে অনেক প্রত্যাশার কথা আছে---প্রধান প্রত্যাশা হচ্ছে অন্নলাভের, মৃত্তিকা-বৃক্ষলতা-পশুর উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির, উষ্ণতা এবং আলোকের। রবীন্দ্রকাব্যে এ সমস্ত প্রত্যাশার সমর্থন নেই, কবি এ দেশের মানুষের আদিম উষালগ্নের দৃষ্টির বিস্ময়কে শুধু আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, উদ্ভাসিত সৌরকররশ্মি যে বিস্ময়ের অমৃতরূপ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পার্থিব সম্পর্কে বৈদিক যুগের আত্মীয় নন, তিনি অলৌকিক রসাবেশে সে যুগের নিকটতম জ্ঞাতি। রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে এই বিস্ময়ের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলছেন যে তিনি আত্মার মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে অনন্ত বিস্ময় লক্ষ্য করেন। পৃথিবীর কোনো বস্তুকে সসীম নাম দিয়ে এবং জড় নাম দিয়ে তিনি এক পাশে ঠেলে রাখতে পারেননি। কবির কাছে অসীম বিস্ময়াবহ হচ্ছে তাই যা সীমার মধ্যে, প্রত্যেকের মধ্যে আনন্দের প্রকাশ ঘটায়। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, আমরা যে জলস্থল, তরুলতা, পশুপাখী, চন্দ্রসূর্য, দিনরাত্রির মাঝখানে চোখ মেলে চেয়ে আছি। পৃথিবীই হচ্ছে একটি আশ্চর্য বস্তু। তার অণুতে পরমাণুতে আশ্চর্য এবং তার প্রত্যেক ধূলিকণায়

আশ্চর্য। প্রাচীনকালে ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টি দিয়ে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র এবং মেঘ ও বিদ্যুতকে দেখেছিলেন এবং দেখার ফলে অচিন্তনীয় একটি বিস্ময় জেগেছিল তাদের অনুভূতিতে যার প্রকাশ আমরা প্রাচীন স্তোত্রের মধ্যে পাই। এ সমস্ত কিছুই কবির অন্তঃকরণকে স্পর্শ করেছিলো। কবির নিজের ভাষায় বক্তব্যটি নিম্নরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে: "আমি কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অন্তরের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ। আমি এই জল-স্থল, তরুলতা, পশুপক্ষী, চন্দ্রসূর্য, দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য। আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নিবায়ূ সূর্যচন্দ্র মেঘ-বিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাহারা যে সমস্ত জীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তবসংগীত ঝংকৃত করিয়া তুলিয়াছিল ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে।" রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহে সূর্য একটি প্রতীক হিসাবে সর্বসময় বিদ্যমান। আমরা দেখেছি এই জ্যোতির্ময় সূর্যরশ্মী বৈদিক যুগের উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় সূর্যালোক মানুষের সর্বাঙ্গে একটি আনন্দরস সঞ্চারিত করে। রবীন্দ্রনাথ "বসুন্ধরা" কবিতায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে এক সময় তিনি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলেন যখন তার উপর সবুজ ঘাস উঠতো। শরতের আলো পড়ত। সূর্যকিরণে সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত। এর ফলে কবির অস্তিত্বে যে চেতনার প্রবাহ ছিল সেই প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসের এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমস্ত শস্য-ক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল এবং গাছের পাতাগুলি জীবনের আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। পৃথিবীতো অনেকদিনের কিন্তু কবির কাছে অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মতো চিরকাল নতুন। যখন পৃথিবী প্রথম জাগরিত হয়ে নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছে তখনকার জীবন-চৈতন্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে অনুভব করতে চেয়েছেন। এই যে পৃথিবীকে অবলম্বন করার বিশেষ

দৃষ্টি, এই দৃষ্টি বৈদিক যুগের বাণীর দ্বারাই বর্তমান কালে একটি নতুন রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। "আত্মপরিচয়ের" অন্যত্র রবীন্দ্র-নাথ বলছেন— "বিশ্বজগৎ যখন মানবের হৃদয়ের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া, মানব ভাষায় ব্যক্ত হইয়া ওঠে, তখন কেবল মাত্র প্রতিধ্বনি প্রতিচ্ছায়ার মতো দেখা দিলে বিশেষ কিছু লাভ নাই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি তাহা জগৎ পরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশমাত্র—সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে, গভীরতর-রূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভাল, কোন্টা মাঝারি তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখান সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বীণাপাণির বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশ শক্তি আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।"

আমরা দেখছি, বেদের বাণীতে লৌকিক জীবনের সৌভাগ্য সন্ধান করা হয়েছে। অন্ন লাভের জন্য প্রার্থনা আছে, শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। তৎকালীন মানুষ তাদের কর্মক্ষেত্রে সার্থকতা লাভের জন্য এবং জীবন ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবান হবার জন্য যে সমস্ত প্রার্থনা করেছে বেদ হচ্ছে তারই বাহক। আর্য্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠার কালে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিরূপণের জন্য ঋগ্বেদ চিরকাল উল্লেখ-যোগ্য হয়ে থাকবে। এই কারণে বেদকে অপৌরুষেয় ও নিত্য না বলে যথার্থ বিচারে পৌরুষেয় ও অনিত্য বলতে হয়। বেদের পরবর্তীকালে বেদের উপর অলৌকিকতা আরোপিত হয়েছে এবং সেই পরবর্তীকালের ঋষিগণ বেদের সূর্য-সাধনাকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত করেছেন। উপ-নিষদগুলো হচ্ছে বেদের উত্তরাংশ এবং এগুলোকে বেদান্তও বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা দেখি যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ব্রহ্মবাদের ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করেছেন, যার ফলে বেদের উপর আরোপিত অলৌ-কিকতার দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সূর্যের কথা বলেছেন, আনন্দের কথা বলেছেন, অমৃতের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই তিনটি কথা সমার্থক। এই অর্থে সমার্থক যে জ্যোতি আমাদের মনে

আনন্দের সঞ্চার করে এবং আনন্দকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করলে মানুষ অমৃতের স্বাদ পায়, বৈদিক যুগে অবিকল এই ব্যাখ্যা ছিলনা। সেখানে সূর্যই ছিল জ্যোতির্ময় এবং সূর্যই ছিল শক্তিদাতা, অন্ধকার বিনাশক এবং সজীবতা প্রদানকারী একটি অস্তিত্ব। প্রাচীন আর্য্যগণ তাদের যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে ভারতের নদী তীরবর্তী উর্বরা ভূখণ্ডে যখন আশ্রয় গ্রহণ করল তখন তারা একটি স্থিতিশীল জীবনকে নির্মাণ করতে চাইল। সেই স্থিতিশীল জীবন নির্মাণকল্পে ভূমির উপর তারা নিজেদের অধিকার আনল, শস্য উৎপাদন করল এবং গৃহপালিত পশুর দ্বারা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করল। তাদের এই বিশেষ জীবনধারার পরিচয় বেদের সূক্তের মধ্যে স্পষ্টভাবেই আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে বেদ অনিত্য এবং পৌরুষেয় ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে নতুন নতুন ব্যাখ্যায় বেদের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটল এবং সূক্তগুলোর মধ্যে মানুষ নতুন অর্থ আবিষ্কার করল।

তাই দেখতে পাই যে পরবর্তীকালে পণ্ডিতগণ বেদের অর্থ সিদ্ধির জন্য ষড়ঙ্গ রচনা করলেন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ, এগুলোই হচ্ছে বেদের ষড়ঙ্গ, এছাড়া পদ, ক্রম, জটা, ঘন, প্রভৃতি কতকগুলো পাঠ-গ্রন্থ আছে যেখানে বৈদিক মন্ত্র-পাঠের নীতি-নিয়ম ব্যাখ্যাত হয়েছে। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম বিষয়ে উপদেশ যে গ্রন্থে পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাতে বর্ণ এবং স্বরের উচ্চারণ লিখিত আছে। পাণিণী রচিত এই শিক্ষা গ্রন্থে বেদের উচ্চারণ পদ্ধতির ব্যাখ্যা আছে। বলা হয়েছে যে বর্ণ অকারাদি, স্বর ত্রিবিধ উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিৎ। উচ্চস্বর উদাত্ত, নিম্নস্বর অনুদাত্ত এবং এদের উভয়ের সমাহার হচ্ছে স্বরিৎ। এভাবে কল্প গ্রন্থের মধ্যে আছে, কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করলে কি উপকার হবে। অর্থাৎ মন্ত্র বিনিয়োগ দ্বারা যজ্ঞ সমাধান হচ্ছে কল্প-সূত্রের কাজ। এভাবে ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ বেদ-ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তীকালে গঠিত হয়েছে এবং এই সমস্ত গ্রন্থের দ্বারা বেদের বাণীকে একটি বিশেষ মণ্ডলের মধ্যে চিরকাল আবর্তিত রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। উপনিষদের ঋষিগণ বেদের বাণীকে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় পরিণত করেছেন। বেদের লৌকিক অংশটুকু গ্রহণ না করে তাঁরা আদিম মানুষের বিস্ময়কে ব্রহ্মবাদ-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত

করেছেন। সেই যে দীপ্যমান জ্যোতিষ্ক আদিত্য, উপনিষদে তিনিই হয়েছেন পরম ব্রহ্ম। সে জন্যই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে বলেছেন ব্রহ্ম-জ্ঞানের বনস্পতি। তিনি বলছেন যে এই উপনিষদের মধ্যে কেবল যে সিদ্ধির প্রাচুর্য্য পল্লবিত তাই নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা উর্ধগামী হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ করে অভিভূত করেছিল যাজ্ঞ্যবল্ক ঋষির পত্নী মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা মন্ত্রটি। যাজ্ঞ্যবল্ক ঋষি যখন গৃহত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাঁর দুই পত্নীকে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে চাইলেন। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন যে এ ভাবে সম্পত্তি নিয়ে তিনি কি অমর হবেন? যাজ্ঞ্যবল্ক উত্তরে বললেন, না, সম্পত্তি নিয়ে কেউ অমর হয়না, তবে সম্পত্তির কারণে মানুষের জীবন স্বচ্ছন্দ হয়। মৈত্রেয়ী তখন তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন এই বলে যে, যে বস্তু লাভ করে তিনি অমৃতা হবেন না তা তিনি গ্রহণ করতে চাননা, তিনি অমর হতে চান। এই অমরত্ব কি? এই অমরত্ব হচ্ছে চির আনন্দকে লাভ করা এবং অমৃতকে লাভ করা। মানুষ মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্পর্শ তখনই পায় যখন সে প্রেমকে লাভ করে।

এই প্রেমের মধ্যে আমরা অমৃতের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমের ছায়া ফেলে পুরাতনকে প্রবীণ করে দেখে। মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করেনা। সংসারের বিচিত্র সীমারেখার মধ্যে আমরা যখন প্রেমের আভাস পাই তখনই মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই। এইকা-রণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে-যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে। পরিপূর্ণ প্রার্থনাটি হচ্ছে--"হে সত্য, সমস্ত অসত্য থেকে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও। হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন সুন্দর মুখ আমাকে দেখাও।" এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেদের মূল সূর্য-বন্দনা উপনিষদের পরবর্তীকালে ঋষির বাণীতে অপৌরুষেয় রহস্যে সমাদৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই অপৌরুষের রহস্যকে অবলম্বন করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রবীন্দ্রনাথ বেদের অলৌকিক সংজ্ঞাকে যে ভাবে গ্রহণ করেছেন, তার সামাজিক রূপকে সে ভাবে গ্রহণ করেননি অথবা

বলা যায় বেদের অনিত্য রূপকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণই করেননি। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাচীন যুগের মানুষের দৃষ্টির বৈভবটি এসেছে, যে বৈভবটি হচ্ছে বিস্ময়—এমন এক বিস্ময় যার আরম্ভ নেই, মধ্যযাম নেই, অন্ত নেই, যে বিস্ময় অনন্তে পরিব্যাপ্ত এবং যে বিস্ময় চিরকাল কবির জন্য একটি প্রবল সম্মোহন। সূর্য উদয়ের সঙ্গে যে আলোর আবির্ভাব ঘটে সে আলোতে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সমস্ত রাত্রির গভার নিদ্রা দূরীভূত হয়ে মানুষের চেতনা অনন্তের মধ্যে জাগ্রত হয়। এই যে সূর্যের আবির্ভাব যার ফলে সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হচ্ছে সেই আবির্ভাবকে উন্মুক্ত, বিশুদ্ধ, শাশ্বত সত্য বলে বিশ্বাস করা যায়। এ ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে রবীন্দ্রনাথ বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োজনের দিকটা বিবেচনা করেননি। যে দৃষ্টিতে পৃথিবীকে অবলোকন করে ঋষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন সেই দৃষ্টির বিস্ময়কে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন।

৩

বেদ এবং উপনিষদের সংগে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নির্ণয় করতে যেয়ে আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিকে কামনা করেছেন, অন্ধকার থেকে আলোকে বিনির্গমনের কথা বলেছেন এবং মানুষের জন্য শুভ এবং কল্যাণকে কামনা করেছেন। গভীরভাবে অনুধাবন করলে এই প্রকার কাব্যগত অভিব্যক্তি দ্বারা আমরা রবীন্দ্রনাথকে কোনো বিশেষ ধর্মতত্ত্বের অনুসারী হিসাবে কিন্তু আবিষ্কার করিনা। অর্থাৎ তিনি কোনো একটি ধর্মগত শৃংখলার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় তিনি আচার এবং বিশ্বাসের দিক থেকে ব্যাপক অর্থে ধার্মিক কিন্তু বিশেষ অর্থে হিন্দু নন। কেননা যে বিশেষের অভিব্যক্তি তাঁর কবিতায় ঘটেছে সে বিশেষ হচেছ আলোকের, সৌন্দর্যের, সত্য এবং আনন্দের। এই প্রকার বিশ্বাস কোনো বিশেষ ধর্মকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনা, এই বিশ্বাস হচ্ছে একজন কবির বিশ্বাস। যিনি ধর্মপ্রাণ তিনি বিশ্বাস করেন যে এই পৃথিবী বিশেষ কতকগুলো অসামান্য অলৌকিক নীতির দ্বারা শাসিত এবং তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ মহান উদ্দেশ্য আছে। সংগে সংগে এটাও তিনি বিশ্বাস করেন যে এই পৃথিবীর অস্তিত্বের মধ্যে একটি রহস্য আছে যে রহস্য মানুষ হিসাবে প্রত্যেককে অনুভব করতে হবে, যদিও সেই রহস্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা কারো পক্ষে সম্ভবপর হবেনা। এই প্রকারের অলৌকিকতা যারা বিশ্বাস করেননা অর্থাৎ যারা ঠিক বিশ্বাসগত অর্থে ধার্মিক নন তারা স্বীকার করেন যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অসম্ভব জটিল। কিন্তু এই জটিলতা ব্যাখ্যার জন্য তারা রহস্যময় কথাটি ব্যবহার করেন না। তারা এই কথা মনে করেন না যে মানব জন্মের একটি বিশেষ স্বর্গীয় উদ্দেশ্য আছে অথবা তারা মনে করেন না যে পৃথিবীর অস্তিত্বের মূলে একটি নিগূঢ় রহস্য আছে। তারা সবকিছু যুক্তির দ্বারা বিচার করতে চান এবং বলেন বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত যে

শক্তি আছে তা বিশ্লেষণ করা যায় এবং এভাবেই সৃষ্টির তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। এই যে মানব স্বভাবের দুটি দিক, একটি হচ্ছে বিশ্বাসের দিক আর একটি যুক্তির দিক, রবীন্দ্রনাথে এর প্রথম দিকটি পরিস্ফুরিত অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব রহস্যে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বিস্ময়ের সংগে জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। কিন্তু সেই অর্থে কোনো উত্তর খুঁজে পাননি যেই অর্থে একজন কবি উত্তর খুঁজে পাবেন অথবা পাবেন না। এই যে রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা অথচ আবিষ্কার করতে না পারা এটাই রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকে সুদুর্লভ মাহাত্ম্যে মণ্ডিত করেছে। তাই জীবনের শেষ লগ্নে তিনি এই কথা অত্যন্ত নিরাভরণ বাকভংগিতে বলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে প্রথম দিনের সূর্য সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করে যে প্রশ্ন করেছিল সে প্রশ্ন চিরকাল পৃথিবীতে থাকবে। এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় সমগ্র অস্তিত্ব হচ্ছে একটি অপার বিস্ময়।

একজন ধার্মিক ব্যক্তি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে মানুষের জন্ম হয়েছে উপাসনা করবার জন্য এবং এই উপাসনার মাধ্যমে আত্মাকে দীপ্তিময় করবার জন্য। এভাবে আত্মাকে দীপ্তিময় করবার ইচ্ছায় মানুষ পাপকে নির্মাণ করেছে, অপরাধকে নির্মাণ করেছে, আত্মত্যাগকে নির্মাণ করেছে, পুনর্জন্মকে নির্মাণ করেছে এবং নির্মাণ করেছে মুক্তিকে। যাঁরা ঠিক রীতিগত অর্থে বিশ্বাসী নন তাঁরা মনে করেন যে ধার্মিকের বিবেচনাগুলো হচ্ছে এক প্রকার পলায়নী মনোভংগী। তারা কোনো কিছুকে জানতে না চেয়ে একটি রহস্যকে বিশ্বাস করে তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রাখতে চায়। এর ফলে পৃথিবীতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন এবং সংগ্রাম, তাদের দুঃখ এবং অপরিণামদর্শিতা, তাদের বিপর্যয় এবং কখনও কখনও আনন্দের অভীপ্সা তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তির বিবেচনায় ধরা পড়ে না। তারা শুধু প্রথাবদ্ধ হয়ে অনুক্ষণ মুক্তির সন্ধান করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদি আমরা পরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাব যে প্রথাগত ধর্মীয় বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ কখনও উদ্বুদ্ধ হননি। তিনি নিজেই একটি বক্তৃতায় স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর ধর্ম হচ্ছে একজন কবির ধর্ম এবং এই ধর্ম কোনো নিষ্ঠাবান সদাচারী লোকের ধর্মও নয়, কোনো ধর্মতত্ত্ব বিশারদের ধর্মও নয়। কাব্য রচনার

প্রেরণা যে অদৃশ্য এবং চিহ্নহীন পথে কবির কাছে এসে পৌঁছেছে সেই পথেই কবি তাঁর ধর্মের সকল স্পর্শ লাভ করেছেন। এভাবে তাঁর কবি-জীবন একটি রহস্যময় ধারায় গড়ে উঠেছে, কবির ধর্মজীবনও সেই একই ধারায় গড়ে উঠেছে। যেভাবেই হোক, কবির কবি-জীবন এবং ধর্মজীবন এরা উভয়েই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যেন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে আছে। এ মিলন গড়ে উঠেছে অনেক দিনের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। কাব্যক্ষেত্রে এই যে বিস্ময় এবং ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই যে সত্যের উপলব্ধি এর কোনোটাকেই শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিশেষ যে প্রেরণা এবং সেই প্রেরণার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে নিজস্ব ধর্মের স্পর্শ এই উভয়কে আবিষ্কার করা যায় বিস্ময়ের পথে—প্রথম জীবনের উষালগ্ন থেকে যে বিস্ময়ের পথে কবি পা বাড়িয়েছিলেন। যুক্তিবাদীর বিচার এবং অহমিকায় রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করেননি। তিনি জীবন এবং জগৎকে শুধু অপরিসীম বিস্ময়ভরে দেখেছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন। এই বিস্ময় কবির চিত্তে বিচিত্র অনুভূতি জাগিয়েছে, সেই অনুভূতি হচ্ছে কবির গান এবং কাব্য।

"বলাকার", একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"ফালগুনের এ-আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলি-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমতো অস্ফুট ধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।"

কোনও বিশেষ ধর্মগত যে উপাসনা তা হচেছ দেশকালবদ্ধ একটি সীমিত বস্তু, তাকে কখনও সিদ্ধি বলে গ্রহণ করা যায়না। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বলেছেন ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে এবং অমৃতের দিকে যাত্রা করতে। এবং তিনি উপনিষদের ব্রহ্ম সম্পর্কে বলছেন যে, ব্রহ্মের প্রকাশ হচেছ আনন্দ এবং সেই আনন্দের সঙ্গে মানুষের যোগ যখন সমান হবে তখনই তার মুক্তি হবে, বিস্ময়ের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করে কবি মুক্ত হবেন—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই তিনি মুক্ত হবেন। প্রতিদিনের পৃথিবী মানুষের কাছে অভ্যস্ত, সর্বমুহূর্তে দৃষ্টিগোচর বলে তা মলিন কিন্তু দৃষ্টিতে বিস্ময় থাকলে সর্বমুহূর্তে তা নবীন ও উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা কবির এই বিস্মিত দৃষ্টিকে লক্ষ্য করেছি, লক্ষ্য করেছি যে পৃথিবীকে তিনি চিরকাল নবীন ও উজ্জ্বল দেখেছেন যার ফলে তাঁর চেতনা চিরদিন নব শক্তিতে জাগ্রত ছিল। বিশ্ব প্রকাশের রূপের মধ্যে কবি অরূপকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রূপকে অতিক্রম করে আনন্দকে দেখতে চেয়েছিলেন বেশী। "শান্তিনিকেতনে"র "মুক্তির পথ" প্রবন্ধে কবি লিখছেন, "আমার মধ্যে যখন আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আসে। মরুভূমির রসহীন তপ্ত বাতাসের উর্ধ্ব দিয়ে কত মেঘ চলে যায়—শুষ্ক হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারেনা। যেখানে হাওয়ার মধ্যেই জল আছে সেখানে সজল মেঘের সঙ্গে তার যোগ হয়ে বর্ষা উপস্থিত হয়।"

আমার মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তবে বিস্ময়ের চিরানন্দ প্রবাহ আমার উপর দিয়ে নিরর্থক হয়েই চলে যায়—আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারিনা। প্রতিদিনের জীবনে সংসারকর্মের মধ্যে মানুষ সার্থকতার সন্ধান করে। এই সার্থকতা সন্ধানকে আমরা বলতে পারি বিষয়বুদ্ধি নিয়ে জীবন ক্ষেত্রে সিদ্ধির অনুসন্ধান। জীবনের কর্মক্ষেত্রে তখন মানুষ তার জ্ঞানকে, কৌশলকে এবং কর্মদক্ষতাকে ব্যাপৃত রাখে। এটা হচেছ মানুষের প্রয়োজনের দিক। মানুষ পৃথিবীতে জীবনধারণ করেই বেঁচে থাকতে চায়। তাই কর্মক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব প্রয়োজন। আদিম যুগে পৃথিবীর

সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক ছিল, তা ছিল অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে বিষয়বুদ্ধিগত। মানুষের ক্ষুধা ছিল, শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছিল এবং বিক্ষুব্ধ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন স্বভাবের অনুশীলনে বাঁচবার প্রয়োজন ছিল। সে সময় পৃথিবীর দিক থেকে ছিল আয়োজন এবং মানুষের দিক থেকে ছিল প্রয়োজন। মানুষ দেহ ধারণের প্রয়োজনে আহার্য সন্ধান করেছে এবং পৃথিবী সে আহার্য তাকে দিয়েছে। তাই সে যুগে সর্বক্ষণ মানুষের প্রার্থনা ছিল, পৃথিবী সজীব হোক, ভূখণ্ড উর্বরা হোক, গাভী দুগ্ধবতী হোক। ক্রমশঃ মানুষ জীবনক্ষেত্রে যখন স্থিতি লাভ করল, যখন আহার্যের অনুসন্ধান একটি স্বাভাবিক নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে বিধিবদ্ধ হল তখন বৈষয়িকতার বাইরে সে দৃষ্টিপাত করতে শিখল। তাই দেখি উপনিষদের ঋষিগণ সূর্যের স্তব করেছেন চির জ্যোতির্ময় পুরুষের সন্ধান লাভের জন্য। এমন একটি অবিনশ্বর আনন্দ সত্তা তাঁরা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন যা প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার সঙ্গে আবদ্ধ নয়। যেখানে দেখি প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের মৃত্যুকে তাঁরা অতিক্রম করতে চেয়েছেন সেখানে তাঁদের সন্ধান ছিল অমৃতের বা অমরতার। তাই তাঁরা উপস্থিত প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে একটি অলৌকিক দানের প্রবর্তনাকে স্বীকার করেছেন। একটি সীমাবদ্ধ জীবনে প্রতিদিনের প্রয়োজন নিয়ে মানুষের যে স্বাতন্ত্র্য সেই স্বাতন্ত্র্যকে অতিক্রম করে তাঁরা একটি মহত্তর জীবনকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। এই যে ধর্ম এটা কোনো বিশেষ লৌকিক আচারে আবদ্ধ ধর্ম নয়, এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানুষের ধর্ম অর্থাৎ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে সর্বজনীন এবং সর্বকালীন মানবকে কল্পনা করা। এই কল্পনার জন্য প্রয়োজন মানুষের জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হওয়া। "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবসীমার স্বাতন্ত্র্যকে অতিক্রম করে যে সর্বকালীন মানববোধ যা বিশ্বমানবমনকে প্রমাণিত করে, তার পরিচয় উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে দ্রব্যময় যজ্ঞের দ্বারা মানুষ একটি অনুষ্ঠানকে প্রমাণ করে। সুতরাং সেই যজ্ঞে মানুষ সীমিত হয়। তাই মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়া কর্মকে অস্বীকার করে চিত্তের নির্মলতা এবং পবিত্রতা লাভের জন্য মানুষকে সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ হবার সাধনা করতে হবে। মানুষের

যে অংশটি প্রাত্যহিক সে অংশটি তার জীবভাবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রতিদিনের জীবনে তার আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্যই এই প্রাত্যহিক কর্মজীবনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু জীবকে অতিক্রম করে মানুষের যে একটি সত্তা আছে সে সত্তার পরিচয় হচ্ছে অমৃতের মধ্যে। অর্থাৎ দেশকাল-গত সংকীর্ণ বিবেচনাগুলোকে অস্বীকার করে যে মানুষ আনন্দের মধ্যে, অমৃতের মধ্যে এবং সত্যের মধ্যে তার পূর্ণতা সন্ধান করতে পারে সে মানুষই বিশ্বভাবে জাগরিত হয় অর্থাৎ মানুষের একটি অংশ জীবভাবকে নিয়ে, অন্য একটি অংশ বিশ্বভাবকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপ-লব্ধির দিক আছে। এক যাকে বলি আমি, আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা কিছু যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা চিন্তা। কিন্তু পরম পুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাট-কের স্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারিনে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে-দু:খে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকেনা, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখিনা। কোনও এক সময় সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন।" এই কথাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে তত্ত্ব হিসাবে বিশ্লেষিত হতে পারে। কিন্তু কবিতায় ছন্দে, শব্দে, উপমা, রূপকে একথাগুলো যখন উপস্থিত হয় তখন তাতে তত্ত্ব থাকেনা, তা একটি উপলব্ধিরূপে অথবা কাব্য-চৈতন্যরূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। 'উৎসর্গে'র একটি কবিতায় এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন। সেখানে তিনি বলছেন যে, তত্ত্ববিদ বলে যে পৃথিবীতে আর কিছু নেই, শুধু এক আছে এবং এভাবেই চিন্তা করতে যেয়ে তারা অস্তিত্বের রহস্যকে অস্বীকার করে। তাই তিনি কবি হিসাবে বিস্ময়কে বাঁচিয়ে রাখতে চান, রহস্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চান এবং এসবের অর্থ তিনি আবিষ্কার করতে চান না যদিও জিজ্ঞাসাকে চিরকাল মূর্ত রাখতে চান। কবিতাটি এই—

"আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। 'আছি আমি'
এ কথা স্মরিলে মনে মহান বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে। 'আছি আর আছে,'
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর! তত্ত্ববিদ তাই
কহিতেছে, 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,
'শুধু এক আছে।' করে তারা একাকার
অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব, আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।"

এভাবেই দেখি যে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ধর্মকে অবলম্বন করে সে ধর্মের বিশেষ তত্ত্বকে আশ্রয় করে তার উপাসনার পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সত্যকে অথবা আনন্দকে আবিষ্কার করেননি। এই সত্য এবং আনন্দকে আবিষ্কার করার পদ্ধতি হচ্ছে কাব্যকুশলতার মাধ্যমে। কবিতার ছন্দে, ধ্বনি-ব্যঞ্জনায়, সুরের সম্মোহনে, রহস্য ও বিস্ময় নির্মাণ করে রবীন্দ্রনাথ অনন্ত জীবনের কথা, সত্যের কথা এবং আনন্দের কথা বলেছেন। যেমন 'পত্রপুট'-এর আট সংখ্যক কবিতাটি। কবি বলছেন যে একটি অপরিচিত বুনো চারা গাছ কোনো একজন তাঁকে আগ্রহভরে এনে দিয়েছিলেন। চারা গাছটির কোনো নাম ছিলনা, অনাদরে অচিহ্নিত স্বাধীনতায় ওর কোন গোত্র গড়ে উঠেনি। কিন্তু কবি ভাবছেন, এই বুনো গাছটিতে যে ফুল ফুটবে এবং অবহেলায় অল্পকালের মধ্যে যে ফুলটি ঝরে যাবে তার ইতিহাস কারো মনে থাকবেনা কিন্তু আগুনের পাপড়ি মেলে সূর্যের বিকাশে যেমন একটি সম্পূর্ণতা আছে তেমনি এই অজানা চারা গাছটির ফুলেরও সম্পূর্ণতা আছে। এই সম্পূর্ণতা যে কি তা তিনি শব্দে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। তিনি শুধু অদৃশ্যের কথা বলেন, এবং কল্পনার কথা বলেন এবং কবির বলার ভঙ্গির মধ্যেই অদৃশ্যের একটি চিহ্ন

পড়ে, অন্তহীনতা যেখানে ছবি আঁকে এবং কল্পনা বিমূর্ত হয়। এভাবে বক্তব্যকে স্পষ্ট বিবেচনায় উপস্থিত না করে রহস্যময় রাখার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যে আমরা লক্ষ্য করেছি এবং শেষ পর্যন্ত এই রহস্যময়তাকে রবীন্দ্রনাথ রহস্যরূপেই আমাদের সামনে উপস্থিত রেখেছেন। “নিষ্ফল কামনা” কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে কবি বলছেন যে অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে তারকারাজির মধ্যে যে অসীম রহস্য আছে প্রিয়তমার নয়নের মধ্যে ঠিক সেই রকমই একটি রহস্য আছে। সে রহস্য হচ্ছে আত্মার রহস্য –

“অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।”

এখানে কোনো কিছুই স্পষ্ট হয়নি। স্পষ্ট করাও কবির উদ্দেশ্য নয়। এই অস্পষ্টতাকে ও রহস্যময়তাকে জীবনতত্ত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। যার ফলে উপনিষদের তত্ত্বগুলো তত্ত্বরূপে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত ছিলনা, সেগুলো অপূর্ব বিস্ময় এবং আনন্দ রূপে কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের তত্ত্বকে তাঁর কাব্যে যেখানেই গ্রহণ করেছেন সেখানেই তা একটি ব্যতিক্রম ব্যঞ্জনায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। প্রথাগত ধর্মের অনুশীলন রবীন্দ্রনাথের ছিলনা বলেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই রহস্যের প্রতিফলন অত বিপুল এবং প্রবল। “পূরবী” কাব্যগ্রন্থের 'ভাঙা মন্দির' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ধর্মের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। একটি পূজামন্দির তাঁর কাছে কোনো অর্থেই উল্লেখযোগ্য নয়, উল্লেখযোগ্য তা তখন হয় যখন প্রকৃতির লালনে পুষ্পের দাক্ষিণ্যে তা সজীব এবং উজ্জ্বল হয়। তিনি বলছেন যে একটি জীর্ণ দেবতালয়ে পুণ্যলোভীরা ভীড় করেনা, পুষ্পপ্রদীপ এবং আয়নার সেই অর্ঘ্য আনেনা, কিন্তু এসব সত্ত্বেও কবির কাছে সেই ভগ্ন দেবালয় আকর্ষণীয়। তার কারণ সেখানে অজস্র পত্র-পুষ্পের সম্ভার রয়েছে এবং অজানা বনফুলের সুগন্ধ রয়েছে। মন্দিরের ভগ্ন ভিত্তিতে মাধবীলতা

সবুজের হিল্লোল তুলেছে এবং এই জীর্ণতায় সূর্যের আলো যখন আসে তখন মনে হয় নবীন প্রাণের হিল্লোল জেগেছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় একটি প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকার সৌন্দর্য ধ্যান করেছেন। একটি বিশেষ কারণে জীর্ণ মন্দিরটি কবির দৃষ্টিতে শোভমান। জীর্ণ মন্দিরটি প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকৃতির সজীবতা এবং আনন্দকে একটি ভগ্ন মন্দিরের উপর ছড়ানো দেখেছেন। এভাবেই বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক কোনো ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। ধর্মের যে তত্ত্বটুকু রহস্যময় এবং অব্যক্ত সেই রহস্য এবং অব্যক্ত কবিকে অভিভূত করেছিলো।

'পূরবী'র 'ভাঙা মন্দির' কবিতাটির মত 'সোনার তরী'তে 'দেউল' নামে একটি কবিতা আছে। উভয় কবিতার সুর এবং স্বাদ প্রায় একই রকম। দেখা যাবে যে অনেক বছরের ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্যের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। 'দেউল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যে মন্দিরের চতুর্দিক ছিল আবদ্ধ, অর্থাৎ যেখানে বাইরের আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারতনা। এই মন্দিরের মাঝখানে তিনি একটি পাষাণ প্রতিমা বসিয়েছিলেন যে পাষাণ প্রতিমাকে নানাবিধ সুগন্ধ এবং ধূপের ধোঁয়ায় তিনি বরণ করেছিলেন এবং অমরত্ব লাভের জন্য সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। পৃথিবীর সঙ্গে এই মন্দিরের কোনো সম্পর্ক ছিলনা এবং নানাবিধ অবাস্তব কারুকার্যে মন্দিরকে অলংকৃত করে কবি একটি নিদারুণ বন্দিদশায় তপস্যায় রত ছিলেন। এ ভাবে চিত্ত তাঁর ঊর্ধ্বগামী হয়েছিল কিন্তু শরীর হয়েছিল জীর্ণ ও মূর্চ্ছাহত। হঠাৎ একদিন বজ্রপাত হল এবং মন্দির বিদীর্ণ করে বাইরের পৃথিবীর আলোকরশ্মি প্রবেশ করল। বাইরের এই আলোতে কবি দেখলেন পাষাণ দেবতার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে এবং নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে আবদ্ধ থেকে তিনি কোনো স্তব রচনা করতে পারেননি, তার প্রদীপ যথার্থ কোনো আলো বিতরণ করেনি কিন্তু আজ বাইরের পৃথিবী মন্দিরকে উদ্ভাসিত করেছে, সংসারের কলরব মন্দিরের দেবতার জন্য একটি ছন্দ এবং সুর নির্মাণ করেছে। এখানেও দেখি যে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রথায় কবির আসক্তি ছিলনা। তিনি ভালবেসেছিলেন পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদকে।

বিশেষ করে সূর্যের সেই আলোককে যে আলোকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপ্লাবিত ও মহিমময় হয়। কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছিঃ—

"এমন করে গিয়েছে কত দিন,
জানিনে কিছু আছি আপন-লীন
চিত্ত মোর নিমেষহত
উর্ধ্বমুখী শিখার মতো,
শরীরখানি মূর্চ্ছাহত
ভারের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে গিয়েছে কত দিন।
একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,
অগ্নিময় সর্পসম
কাটিল অন্তরে!
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।
নীরব ধ্যান করিয়া চুর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর,
সংসারের অশেষ সুর
ভিতরে এল ছুটি।
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি।
দেবতাপানে চাহিনু একবার,
আলোক এসে পড়েছে মুখে তাঁর।
নতুন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি
জাগিছে এক প্রসাদহাসি
অধর-চারিধার।
দেবতাপানে চাহিনু একবার।'

আমি পূর্বেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ মানব জীবনের একটি অবাধ এবং বিপুল বিস্ময়কে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই বিস্ময় হচ্ছে পৃথিবীর বুকে প্রথম সূর্যোদয়ের বিস্ময়, নয়নে প্রথম লাবণ্য অবলোকন করার বিস্ময় এবং পুষ্পের প্রথম পাপড়ি উন্মোচনের বিস্ময়। এই বিস্ময়টা তত্ত্ব নয়, এ বিস্ময় সম্পূর্ণভাবে একটি কবি-চেতনাতেই ধরা পড়ে। "চিত্রাঙ্গদা" নাট্য-কাব্যের অর্জুনের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে দেখে বলছেন—

"শ্বেতশতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পর্ণশোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিলা আপনারে, সারা দিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।"

অন্যত্র অর্জুন আরো স্পষ্ট করে বলছেন —

"বুঝিতে পেরেছি আমি
কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টিশতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মোচিত হয়ে
এক মুহূর্তের মাঝে।"

কবিতা এবং তত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক আছে কি? যদি কোনও তত্ত্ব একটি কবিতার রূপকল্পে প্রকাশ পায় তাহলে তাকে কবিতা আখ্যা দিতে পারি কি? অতীতে এগুলো নিয়ে অনেক কাণ্ডজ্ঞানহীন গবেষণা হয়েছে, অনেক হাস্যকর বিবেচনার স্বাক্ষর আছে এবং বর্তমানেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার তত্ত্বরসাস্বাদ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। একজন বিদেশী পণ্ডিত বলেছেন, "কবিতায় যে তত্ত্ব থাকে তা স্বাদহীন এবং অসহ্য। ষোল বছরের অধিক বয়স যাদের তাদের কেউ নিছক বক্তব্যের জন্য কবিতা পাঠ করেন না।" (Ideas in poetry are usually stale and false, and no one older than sixteen would find it worth his while to read poetry merely for what it says: George Boas: Philosophy and Poetry, Wheaton College, Mass, 1932, Page 9).

কবির বক্তব্যে তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায় কিন্তু যথার্থ কবির ক্ষেত্রে তা হচ্ছে একটি কাব্যগত অনুভূতির স্বপ্রকাশকে তত্ত্বরূপে মূল্যবান করা, যেমন কবি কীট্স-এর "Beauty is truth, truth beauty।" যে প্রাচীন সুরম্য ও সুচিত্রিত আধারে শবাবশেষ রক্ষিত আছে, তার চিত্র-কল্পে সম্মোহিত হয়ে কবি এ কথাটি উচ্চারণ করেছেন। উক্তিটি সে কারণেই তত্ত্ব নয় কিন্তু একটি নিগূঢ় কাব্যগত অনুভূতির বাঙময় রূপ যেখানে শিল্পের নিত্যতা এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের স্বল্পকালীনতা কীর্তিত হয়েছে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত ধর্মের অনুশাসনে আবদ্ধ না হয়ে, কোনও বিশেষ নিগূঢ়তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, শুধু কবি হিসাবে তাঁর অন্তরাত্মার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাওয়া, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে নিয়ে যাওয়া এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাওয়া যেমন তত্ত্ব হিসাবে মূল্যবান তেমনি কাব্য হিসাবেও ঐশ্বর্যবান। উপনিষদের এটা একটি গভীর ব্যঞ্জনাময় প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথের কাছে এটা হচ্ছে কবির সকল আকাঙক্ষার সরমর্ম। যে আলোক স্বপ্রকাশ, যা আপনা আপনিই প্রকাশিত সে আলোক কবির কাছে প্রকাশিত হোক। সাধক বলবেন যে আমি ধ্যানে বসে এই আলোককে আমার একটি অলৌকিক চেতনায় উপলব্ধি করব, কিন্তু কবি বলবেন যে আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে এই আলোক দেখে বিস্মিত হবো। সূর্য তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত, কবি শুধু চোখ খুলে জাগ্রত হয়ে এই আলোকে বিস্মিত হবেন। সাধারণ মানুষের কাছে সূর্যের উদয় এবং অস্তে গমন একটি গতানুগতিক তথ্য। কিন্তু কবির দৃষ্টিতে সূর্য প্রতিদিনই নতুন করে পৃথিবীকে আলোকে উদ্ভাসিত করে এবং প্রতিদিনই পৃথিবী নতুন রূপে সজ্জিতা হয়ে আবির্ভূতা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' নামক গ্রন্থে বলছেন যে তিনি প্রাতঃসূর্যালোকে দাঁড়িয়ে হৃদয়কে আহবান করতে চান, প্রতিদিন সকালের তরুণ সূর্য যেন তাঁকে আলোকে অভিষিক্ত করে, তাঁর দুই চক্ষু যেন আলোকে ধৌত হয়, তাঁর পথ যেন আলোকে রঞ্জিত হয়। প্রতিদিনের প্রাতঃসূর্য যেন তার নির্মল আলোতে কবিকে নির্মল করে এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত সমীরণ যেন তাঁর শরীরকে স্পর্শ করে তাকে পবিত্র রাখে, এই বক্তব্যের সঙ্গে উপনিষদের বক্তব্যের মিল আছে

সন্দেহ নেই কিন্তু এই বক্তব্য একজন কবির চৈতন্যলব্ধ আনন্দের উত্তরাধিকার। এটাকে আমরা তত্ত্ব বলব না। উপনিষদের ঋষিরা সূর্যের জ্যোতিকে ব্রহ্মের জ্যোতি বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই জ্যোতিতেই নিজেকে জাগ্রত রেখেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে এই জ্যোতি ব্রহ্মের জ্যোতি নয়, এই জ্যোতিপ্রভা সূর্যের জ্যোতি যা তাঁকে বিস্ময়ে জাগ্রত করেছে।

সূর্যকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার "বলাকা" কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক ভাবে করেছেন। সেখানে বিভিন্ন রূপকল্পে সকালবেলাকার আলো, সূর্যোদয়, প্রথম প্রত্যুষ, জ্যোতির্ময়তা বহুভঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সর্বত্রই একটি সত্যকে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সূর্যের আলোর দ্বারা তিনি পূর্ণ হবেন। 'বলাকার' প্রথম কবিতায় সকাল বেলার রৌদ্রের মদমত্ততার কথা বলা হয়েছে "রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে"। এই কবিতাটিতে হঠাৎ আলো দেখে বিস্মিত হওয়ার কথাও আছে— 'হঠাৎ আলো দেখবে যখন, ভাববে একি বিষম কাণ্ডখানা।' ৩.নং কবিতায় কবি বলছেন, যে মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে চলছে তারা মধ্য দিনের সূর্যের আহ্বান পেয়েছে:

"রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।"

৭ নং কবিতায় সম্রাট শাজাহানের প্রেমের রসাবেশ বর্ণনা করতে যেয়েও কবি পূর্বাচলের সূর্যের কথা বিস্মৃত হননি—

"তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নবনব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।"

১৬ নং কবিতায় বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশির এবং মানুষের অজস্র ভাবনা এবং কামনা কখন কি করে অপূর্ব আলোতে তাদের রূপ পাবে, কবি সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। এখানের মূল বক্তব্য আলোর মধ্যে জাগরণ এবং আলোকের চৈতন্যে সমস্ত অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। ১৯নং কবিতায় কবি বলছেন যে, তিনি এই পৃথিবীর আলোককে ভালবেসেছেন বলেই

জীবনকে ভালবাসেন---

"ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনের তাই বাসি ভালো।"

২৬ সংখ্যক কবিতাটিতে কবি বলছেন যে তার চিত্তে আনন্দ যেন জন্ম লাভ করে যেমন করে বনের প্রাঙ্গণে নতুন সূর্যের আলো উদ্ভাসিত হয়। ৩১ সংখ্যক কবিতাটিতে কবি সূর্যোদয়ের কথা বলছেন। তিনি বলছেন, যখন তাঁর দৃষ্টিতে বিধাতা সূর্যোদয়কে লক্ষ্য করেন তখনই সূর্যের জ্যোতির্ময়তা সার্থক হবে—

"এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।"

৩৩ সংখ্যক কবিতায় কয়েটি উপমা-উৎপ্রেক্ষায় সূর্যের কথাটি এসেছে। কবি বলছেন যে বিধাতার আনন্দ আকাশে ফুটে ওঠে সূর্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে এবং বলছেন যে 'এ পৃথিবী হচ্ছে আলোর মঞ্জরি।' ৩৪ সংখ্যক কবিতায় আবার সকালবেলাকার আলোর কথা এসেছে। তিনি আলোকে উদ্ভাসিত দিকদিগন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করে সকল কর্ম ভুলে একটি তন্ময়তার মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। ৩৫ সংখ্যক কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য----

"আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির—ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় করে,
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে
তাইতো আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবন খানি
অকূল মানস-সাগরজলে
কমল টলমল।
তাইতো আমি জানি
আমি বাণীর সাথে বাণী,

আমি গানের সাথে গান,
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয় ফাটা
আলোক জ্বলজ্বল।"

কবি নিজেকে অন্ধকার-হৃদয় বিদীর্ণ করে যে আলো জাগ্রত হয় সে আলোকের সমধর্মী হিসাবে চিহ্নিত করতে চাচ্ছেন। ৩৭ সংখ্যক কবিতায় কবি নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বারের কথা বলছেন। অন্ধকার পথে যাত্রা করেছে যাত্রীদল। বহ্নি-বন্যার মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, বিপুল কলরোলের মধ্য দিয়ে যাত্রীদল নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বারে পৌঁছুতে চায়। এই নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার বলতে কবি বোঝাতে চান, উপনিষদের বাণী অনুস্মরণ করে আমরা বলতে পারি যে কবি বলতে চান, যে মানুষ যখন তার মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে যায় তখনই সে অমরত্ব লাভ করে। সেই অমরত্বই হচ্ছে সত্য ও আনন্দ এবং সেটাই হচ্ছে নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার। ৪০ সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন----

"এইক্ষণে
মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে
যে-তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলোতে
সে-তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সঙ্গীত,
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।"

এই যে বারবার সূর্যকে ব্যবহার অথবা সূর্যরশ্মি উপস্থাপনা, একে আমরা বলতে পারি, কবি চিত্তের একটি বিশেষ আবেগ বা অনুভূতির রূপকল্প। সূর্য এখানে কোনও তত্ত্ব, এবং সে অর্থে কোনও অর্থ বহন করছেনা। সূর্য এখানে কবির মানস-চৈতন্যের একটি অবস্থা। আমরা একে তত্ত্ব হিসাবে উপস্থিত করবনা, বলব যে সূর্যের রূপকের মাধ্যমে কবি একটি মানসিক অবস্থার পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের কাব্যগুলোতে সূর্যের উপমা ব্যাপকভাবে এনেছেন। 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' 'জন্মদিন' এবং 'শেষ লেখায়'

সর্বত্রই সূর্যকে তিনি অনুভব করেছেন। এ সমস্ত কবিতায় বারবার নব সূর্যালোকের কথা বলা হয়েছে, জ্যোতিষ্কের তপস্যার কথা বলা হয়েছে। বিশ্বজগতের প্রথম প্রভাতের বিস্ময়ের কথা বলা হয়েছে, চৈতন্য-জ্যোতির কথা বলা হয়েছে, আদি সূর্যোদয়ের কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখতে পাব যে শেষকালে কবির সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করেছিল সূর্য এবং তার জ্যোতির্ময়তা। 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থের ৪ সংখ্যক কবিতায় তিনি বলছেন ----

"অজস্র দিনের আলো,
জানি একদিন
দুচক্ষুরে দিয়েছিল ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেল ছায়াখানি।
রচিলে যে আলো দিয়ে তব বিশ্বতল
আমি সেথা অতিথি কেবল।"

৩২ সংখ্যক কবিতায় বলছেন ----

"প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে
অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান,
জ্যোতিঃস্রোতে মিলে যায় রক্তের প্রবাহ,
নীরবে ধ্বনিত হয় দেহে মনে জ্যোতিষ্কের বাণী।"

মানুষের নিত্য জীবনযাত্রার মধ্যে এই যে দৃষ্টির রহস্য উন্মোচন এবং যে রহস্য সূর্য এবং সূর্যের আলোককে কেন্দ্র করে, এটাই রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছে। এই যে দেখা, এই দেখাকে আমরা বলতে পারি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা, যে দেখা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা নয়, সে দেখা হচ্ছে চক্ষুর সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে মিলিত করে দেখা। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিপাতকে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের দৃষ্টিপাত আমরা বলবনা। এই দৃষ্টিপাত নির্মম স্বার্থদৃষ্টি নয়। পৃথিবীর কর্মকাণ্ডে আমরা স্বার্থের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখি। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনব্যাপী একটি রহস্যনিকেতনে পৌঁছুতে চেয়েছেন যে রহস্যনিকেতনে পার্থিব দিক থেকে সুগভীর রিক্ততা আছে কিন্তু অলৌকিকতা এবং বিস্ময়ের দিক থেকে একটি হৃদস্পন্দন আছে।

"রোগশয্যায়" কাব্যগ্রন্থের ১৩ সংখ্যক কবিতায় বলা হয়েছে যে সমস্ত জীবন একটি বিরাট অতীত যখন হয়ে যায় তখন কবির কাছে একটি মাত্র প্রত্যাশা—পৃথিবীর নতুন বিস্ময়ের মধ্যে এবং নতুন জিজ্ঞাসায় বিশ্বজগতের শিশুলোক নতুন করে জেগে উঠুক। ১৫ সংখ্যক কবিতায় কবি প্রার্থনা করেছেন "হে-প্রভাত সূর্য, আমি আমার শুভ্রতম রূপকে তোমার জ্যোতির মধ্যবিন্দুতে দেখতে চাই, আমাকে তুমি সেই দেখবার শক্তি দাও, আমার জীবনের সকল দীনতাকে অপসারিত কর এবং তোমার হিরন্ময় ঐশ্বর্যে আমার অতীতের সমস্ত রজনীর অন্ধকারকে দূর করে দাও।"

দেখা যাচেছ যে কবি সংসারের নানা ক্ষেত্রে, নানা কর্মে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত চেতনার মধ্যে মানুষকে পরিব্যাপ্ত দেখেছেন কিন্তু এ সমস্ত দেখা তাঁর কাছে অপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সূর্যকে যে চৈতন্য দিয়ে তিনি দেখছেন সেই চৈতন্যের মধ্যে বিস্ময় আছে এবং সে বিস্ময় একটি পরিপূর্ণ বিস্ময়। সূর্যকে আশ্রয় করার মধ্যে কবি-চিত্তের একটি আকাঙক্ষার পরিপূর্ণতা আছে। কেননা কবি মনে করেন, সূর্যের আলোক সমস্ত কিছুকে উদ্ভাসিত করে এবং সমগ্র বিশ্বসামগ্রীকে অভিষিক্ত করে। প্রত্যূষের সূর্য হচেছ রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তি, বিনম্রতা, শুভ্রতা, সত্যতা এবং পবিত্রতার প্রতীক। যে আনন্দ এবং অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় একমাত্র প্রত্যূষের সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তা অনুভব করা যায়। এখানে আমরা দেখি, প্রত্যূষের আলো আনন্দ এবং অমৃতের প্রতীক হয়েছে। আলোকের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে আদি সূর্যোদয় থেকে। যদিও প্রতিদিন প্রভাতে একই রূপে তার আবির্ভাব তবুও মানুষের দৃষ্টিতে প্রতিদিনই তা বিস্ময়কর, অভিনব এবং আনন্দে পূর্ণ। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের এক সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে তিনি জন্মদিনের প্রভাতে উদয় দিগন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন সদ্যস্নাতা ঊষা পর্বতের শিখরদেশে আলোকের চন্দন-রেখা এঁকে দিয়েছে। 'জন্মদিনে'র অন্য একটি কবিতায় কবি বলছেন যে জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সকল কিছুকে অতীত করে তিনি যখন শেষ

যাত্রাপথে পা রেখেছেন তখন তাঁর মনে একটি বিরাট বিস্ময় রূপ লাভ করেছে, তা হচ্ছে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের অগ্নি-নির্ঝরের নিঃশব্দজ্যোতির বন্যাধারা। রূপকচ্ছলে কবি বলছেন যে সূর্য যেমন সমস্ত অন্ধকারের যবনিকা উন্মোচন করে তেমনি কবি হিসাবে তাঁরও দায়িত্ব পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার যবনিকা উন্মোচনের। সূর্য যেমন পৃথিবীর পরিচয়কে উদ্ভাসিত করে তাকে আলোকে প্লাবিত করে তেমনি কবি তাঁর শব্দের মধ্যে নতুন নতুন অর্থ দান করে এই সত্যনিকেতনের পরিচয় উপস্থিত করেন। তিনি যে জীবনকে বহন করতে পেরেছেন এত দিন, এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ, অনাদি জ্যোতির কাছে সেই দিব্য আবির্ভাবে তিনি আপন আত্মাকে অবলোকন করেছেন।

বৈদিক ঋষিদের বক্তব্যে পৃথিবীর স্পর্শ ছিল। তাঁদের প্রার্থনার ভাষায় আমরা মাটির গন্ধ পেয়েছি এবং তৎকালীন মানুষের জীবনযাত্রার সাড়া পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের কালে অবিকল সেই ছবিটি আর জাগেনি। কেন জাগেনি তা বিস্তৃত ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমি Robert Graves এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করব :---

"We have narrowed our minds by a neglect of the physical senses ; relying on reasons, we no longer see, hear, taste, smell or feel anything like so acutely as our primitive ancestors did or as most little children still do before their education hardens."

আধুনিক এক মার্কিন কবি, "রবার্ট ডানকান" (Robert Duncan) তাঁর কবিতায় সূর্যকে প্রতীক হিসাবে বহুবার ব্যবহার করেছেন। এভাবে সূর্যকে ব্যবহার করার যুক্তি স্বরূপ তিনি বলছেন যে তাঁর জন্ম হয়েছিল উষালগ্নের এক দণ্ড পূর্বে। যখনই তিনি তাঁর জন্মক্ষণের কথা স্মরণ করেন তখনই তাঁর মনে হয় ক্রমশঃ আকাশ উজ্জ্বল হচ্ছে, জানালার ধারের গাছের পাতাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে, দরজার পর্দা, টেবিল, চেয়ার এবং অন্যান্য গৃহসামগ্রীগুলো ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিতে জাগছে। দিনের আলো সমস্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের অজস্র নক্ষত্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হারিয়ে যাচ্ছে। সূর্য এভাবে মানুষের কল্পনার অত্যন্ত নিকট। যদি একজন কবি সূর্যের আলোকে যে প্রান্তর বা

যে সমস্ত গৃহসামগ্রী আলোকিত হল সে সমস্ত না ভেবে শুধু সূর্যের কথাই ভাবেন তাহলে তিনি কি দায়িত্বহীন হলেন ? ডান্‌কান্‌ বলছেন, না, এটাকে দায়িত্বহীনতা বলা যায় না। যে আলোকের কৃপায় আমরা সব কিছুকে দেখছি সে আলোক যদি কবিকে অভিষিক্ত করে তা হলে তা কবির প্রেরণা রূপে কাজ করতে পারে। যে সমস্ত গৃহসামগ্রী সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হল সেই গৃহসামগ্রীর কথা যদি কেউ না ভাবেন তাহলে তিনি কবি হিসাবে বিশেষ অন্যায় করবেন না। তার কারণ তখন তিনি কবি হিসাবে তাঁর একটি বিশেষ স্বভাবের পরিচয় আনছেন। ডানকানের একটি কবিতায় আলোকের উপর এই নির্ভরতার প্রকাশ আছে। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি----

It is the earth turning
that lifts our shores from the dark
into the cold light of morning,
eastward turning,
and that returns us from the sun's burning
into passages of twilight and doubt,

dim reveries and gawdy effects.
The sun is the everlasting center of what we know,
a steady radiance.

The changes of light in which we dwell,
colors among colors that come and go,
are in the earth's turning.

Angels of light ! raptures of early morning !
your figures gather what they look like
out of what cells once knew of dawn,
first stages of love that in the water thrived.

So we think of sperm
as spark-fluid, many-milliond,

in light of the occult egg striking
doctrine.

Twined angels of dark,
hornd master-reminders of from-where !
your snake-or animal-red eyes
store the fire's glare.

O flames ! O reservoirs !

মানুষের জীবনে দিন রাত্রি, নিদ্রা ও জাগরণ বিশেষ তাৎপর্যবাহক। কবির কাছে নিদ্রা থেকে জাগরণ এবং রাত্রির অন্ধকার থেকে দিবসের আলোতে বিনির্গমন প্রতিদিনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা আলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেই জীবন সম্পর্কে সচেতন হই এবং রাত্রি-দিনের পরিবর্তনের মধ্যে আপন পরিচয়কে আবিষ্কার করি। কবিতায় একজন কবি জীবনে তাঁর চৈতন্যকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। কবিতা এক অর্থে হচ্ছে চৈতন্য প্রকাশের মহোত্তম প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ যদি গৃহসামগ্রীর কথা না ভেবে, মানুষের কথা না ভেবে এবং মানুষকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দ্বারা বিপর্যস্ত না ভেবে শুধু সূর্যের আলোর কথা ভেবে থাকেন তা হলে তাঁর সময়কালের চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশেষ অপরাধ করেননি। তিনি যখন কবিতা লিখেছিলেন তখনই এ দেশের বহু মানুষ আদিমকালের মানুষের মতো আহার্য, বাসস্থান এবং গাত্রাবরণ সংগ্রহের চেষ্টায় অনুক্ষণ উদ্বিগ্নতায় কাল কাটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এগুলোর ছবি ধরা পড়েনি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দিত পরিমণ্ডলের মধ্যে বর্ধিত হয়েছিলেন এবং যে স্বস্তি ও শান্তি তাঁর জীবনযাত্রায় ছিল সেখানে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য বহুলাংশেই অস্পষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে জ্ঞাতসারে মানুষের ক্লিষ্ট এবং নির্যাতিত মূর্তিকে রূপ দেননি তা নয়। কবিতার ক্ষেত্রে সে জগত তখনও পুরোপুরি নির্মিত হয়নি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তো দুঃখকে জেনে দুঃখকে ভুলবার চেষ্টা করেননি। আমি এখানে সেই দুঃখের কথা বলছি যে দুঃখ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে ঘটে থাকে। রবীন্দ্রনাথ আপন স্বভাবে সূর্যের জ্যোতির্ময় রূপের কথা বলেছেন। এটা পলায়ন নয়, এটাও সত্যকে এক বিশেষ ভঙ্গিতে গ্রহণ করা। রবার্ট ডানকানের কথায় ফিরে আসা যায়। তিনিও বলছেন, যে সূর্যের আলোয় গৃহসামগ্রী, কর্মকাণ্ড উদ্ভা-

হল, সেই সূর্যের আলোকের কথা যদি কোনও কবি ভাবেন তাহলে তিনি কোনও অন্যায় করেন না। কোনও কোনও কবি হয়ত পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ডের কথা ভাবেন, আবার কেউ হয়ত আলোকে উদ্ভাসিত গৃহ-সামগ্রীর কথা ভাববেন। যাঁরা গৃহসামগ্রীর কথা অথবা কর্মকাণ্ডের কথা ভাববেন, তারাও যেমন অপরাধ করেন না, তেমনি যাঁরা শুধু আলোর কথা ভাববেন তাঁরাও কোনও অপরাধ করেন না। দৃষ্টির পার্থক্যের কারণে এবং কবিস্বভাবের পার্থক্যের কারণে এই দুই অবস্থা ঘটে থাকে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ সূর্যের যে দিব্য আলোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত হচ্ছে সেই আলোকের উপর গুরুত্ব দান করেছেন, তার কারণ প্রথমতঃ তাঁর জীবনের শৈশবে বেদ এবং উপনিষদের প্রভাব। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কবি-স্বভাব বিশ্বকে এবং আলৌকিককে সর্বক্ষণ আশ্রয় করতে চেয়েছে। তৃতীয়তঃ তিনি সর্বক্ষণ সমস্ত কিছুর সীমা অতিক্রম করবার চেষ্টা করে-ছেন। কবির ভাষায় মর্তসীমা অতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি পরীক্ষা করলে আমরা দেখব যে কবিতার ছন্দে, শব্দব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভূতিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ধ্বনিব্যঞ্জনা এবং সুর-সম্মোহনে প্রবাহিত রেখেছেন। 'উৎসর্গের' একটি কবিতায় কবি বলছেন—

'চক্ষু মেলি পূবের পানে
নিদ্রাভাঙা নবীন গানে
অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
উৎস-সমান ছুটে।
কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে।
এত আঁধার-মাঝে তোমার
এতই অসংশয়।
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করেনা প্রত্যয়।
তুমি ডাক—'দাঁড়াও পথে
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে'—
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।'

এই আলোচনার উপসংহারে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রয়োজনের দ্বারা বিশ্বসংসারকে পর্যাপ্ত দেখেননি, একটা কিছু তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করেছিল যা ছিল প্রয়োজনের অতীত। এই যে প্রয়োজনের অতীত, জ্ঞানের অতীত কবির চিত্তচেষ্টা এখানেই ছিল তাঁর ইচ্ছার প্রেরণা। সকল মানুষের মতো তিনিও বিশ্বকে ব্যবহার করেছেন, বিশ্বকে জেনেছেন, বিশেষভাবে তাঁর নিজের স্বভাবে তিনি বিশ্বকে ইচ্ছা করেছেন, অর্থাৎ তাঁর রস ভোগ করতে চেয়েছেন। তিনি যে সূর্যকে দেখেছেন এবং সূর্যকে নানাভাবে নিজের চেতনায় অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন, তার কারণ তিনি সূর্যের মধ্যে তাঁর সত্তারই বিকাশ দেখেছেন। যেহেতু সূর্য পৃথিবী থেকে অপরিচয়ের ছায়া দূর করে, অবগুণ্ঠনের গুণ্ঠন মোচন করে এবং আবৃতকে অনাবৃত করে, তাই সূর্য আনন্দ আনে। অন্ধকারে মানুষের চৈতন্য অনুজ্জ্বল থাকে। অজাগ্রত সত্তার নিরালোকে মানুষ নিষ্প্রভ মনমরা হয়ে থাকে, কিন্তু সূয কবিকে অপ্রকাশের শূন্যতা থেকে এনে আনন্দঘন উজ্জ্বলতায় উৎকীর্ণ করে। এভাবে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবি স্বভাবের একটি পরিচয় লাভ করি। যে পরিচয়কে স্ববিবেচনায় না আনলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

৪

রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব ছিল প্রচুর এবং প্রবল। কবি কালিদাসের প্রভাবটিই সর্বাপেক্ষা প্রবল। 'প্রাচীন সাহিত্য' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই প্রভাবের মুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন। 'মেঘদূত' নামক প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের কথা স্মরণ করেছেন যে ভারতের সঙ্গে আধুনিক মানুষের নির্বাসন ঘটেছে। সেখানকার সবকিছুই কবির কাছে মধুর, আনন্দময় এবং আবেদনময় মনে হয়েছে। সেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া, বর্ষার সমাগমে পাখীদের ব্যস্ততা, গ্রামবৃদ্ধদের গল্প বলা, সবকটি দৃশ্যই কবিকে আবেগে উদ্বেলিত করেছে। তিনি যে কালিদাসের প্রাচীন ভারতের বিপুল শ্রী ও বহুল ঐশ্বর্যের দ্বারাই অভিভূত হয়েছেন তাই নয়, তিনি সেই যুগের সৌন্দর্য, আনন্দ এবং প্রণয়াকুলতায়ও বিহবল হয়েছেন। সেই প্রাচীন ভারতের নদী গিরি নগরীর নামগুলোও কবির কাছে শ্রুতি-মধুর মনে হয়েছে। শ্রোত্ররসায়ন এই নামগুলো রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দে এবং সুরে এমনভাবে উপস্থিত যে তার মধ্যে একটি শোভা, সম্ভ্রম এবং শুভ্রতা বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় আমরা আবিষ্কার যে কবি সেই প্রাচীন ভারতে তাঁর কল্পনাকে পাঠাতে চেয়েছেন। যেহেতু সেখানে সহজে উপনীত হবার জন্য কোনো পথ নেই, তিনি ভাষায়, ভাবে, আকারে-ইঙ্গিতে, ভুল-ভ্রান্তিতে, আলো আঁধারে কালিদাসের কালের ভারতবর্ষের একটুখানি আলো এবং বাতাস পেতে চেয়েছেন। যেহেতু সে যুগকে তিনি কখনও সম্পূর্ণ করে পাবেন না তাই কল্পনায় সে যুগের নতুন চিত্ররূপ নির্মাণ করেই তিনি আনন্দিত।

কালিদাস প্রধানতঃ সৌন্দর্যের কবি। এই সৌন্দর্য বস্তুর বহিরঙ্গের সমৃদ্ধির, মানব দেহের যৌবনের এবং রসাস্বাদের পরিপূর্ণতার। 'মেঘদূত' কাব্যে কবি বিভিন্ন চরণে বিভিন্ন ঘটনার অথবা বস্তুর দর্শনীয়তার কথা

উল্লেখ করেছেন। যেমন 'পূর্বমেঘে'র আরম্ভে বলছেন—আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে মেঘ গিরিশৃংগকে আলিঙ্গন করেছে এবং মেঘগুলোকে বপ্রক্রীড়াপরায়ণ হস্তীর ন্যায় সুদৃশ্য মনে হচ্ছে। অন্যত্র বলছেন—পদ্মরাগ প্রভৃতি উজ্জ্বল মনি-মাণিক্যের প্রভা একত্রিত হলে যেরূপ মনোহর দেখায়, সেই প্রকার সুদর্শন মনে হচ্ছে ইন্দ্রধনুকে। মেঘের সর্বাঙ্গ ইন্দ্রধনুর স্পর্শে সমুজ্জ্বল দীপ্তি পেয়েছে। আরো বলছেন—মেঘ যখন পর্বতশৃঙ্গের উপরে আরোহণ করবে তখন সেই পর্বত ত্রিদশমিথুনের নয়নরঞ্জন হবে। এভাবে আমরা বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে পারি যে 'মেঘদূত' কাব্যে কালিদাসের উদ্দেশ্য ছিল সকল নয়নাভিরাম দৃশ্য পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। কবি মেঘের যাত্রা-পথে বিভিন্ন সুদৃশ্যের অবতারণা করেছেন এবং সৌভাগ্য দ্বারা সমস্ত প্রকৃতিকে বরণীয় ও রমণীয় করেছেন। তিনি যখন প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন তখন সে চিত্রে আমরা সজীব এবং সজল পৃথিবীকে লক্ষ্য করেছি, যখন পর্বতের কথা বলেছেন তখন সে পর্বতকে পরিপক্ক ফল-কুসুমে মণ্ডিত করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। যখন অরণ্যাকীর্ণ ভূমির কথা বলেছেন তখন সেই ভূখণ্ড মধ্যে পা-চলার পথে পথিক যে সুগন্ধ আঘ্রাণ করবে সে কথা বলতে ভোলেন নি। সমগ্র 'মেঘদূতে' আমরা দেখব অসংখ্য তারকারাজির মতো চর্তুর্দিকে ফুল ফুটে আছে, কোথাও প্রস্ফটিত পুষ্প, কোথাও ভূমিকদম্বের প্রথম উৎপন্ন মুকুল, কোথাও পদ্ম, হরিদ কপিস বর্ণের স্থল-কদম্ব, কোথাও যূথিকার মুকুল, এভাবে কবি সর্বত্র একটা শোভন সৌন্দর্য ছড়িয়েছেন। এ সমস্ত কিছুই আমাদের নয়নের কাছে গ্রাহ্য এবং সে কারণে নয়নাভিরাম। দেখা যাবে যে কালিদাস একটা বিপুল সমৃদ্ধির যুগে বাস করতেন। সেই সমৃদ্ধির স্বাক্ষর তাঁর প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। সুতরাং কালিদাসের সৌন্দর্য-বর্ণনায় আমরা বিপুল ঐশ্বর্যের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল, কিন্তু তাঁর কালে অবিকল এই সৌন্দযকে পাওয়া সম্ভবপর ছিলনা বলেই তিনি বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং সে সৌন্দর্যকে স্বপ্নে হোক, কল্পনায় হোক ক্ষণকালের জন্য অনুভব করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করেছেন। পার্থক্য এখানে যে রবীন্দ্রনাথ যখন কালিদাসের জগৎ এবং জীবনকে নতুন করে নির্মাণ করবার চেষ্টা করেছেন তখন তাঁকে শুধু পুরোনো কাহিনী স্মরণ করতে হয়েছে এবং বাস্তবের

সঙ্গে প্রচণ্ড অভিঘাতের পরিচয়ও আনতে হয়েছে কেননা রবীন্দ্রনাথ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি নন, তিনি বৈজ্ঞানিক জগতের আধুনিক মানুষ। প্রাচীন ভারতের যে শাশ্বত সুকুমার জীবন কালিদাসের রূপরেখায় ধরা পড়েছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সে যুগের সৌন্দর্য। কবি কালিদাসের সিদ্ধি এখানেই যে তিনি উপমা অলঙ্কারে, ছন্দের লালিত্যে এবং শব্দের মাধুর্যে একটি তৃপ্তি এবং পূর্ণতাকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন যে পূর্ণতার একটি লালিত্য, মাধুর্য এবং স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' পাঠ করে আমরা দেখতে পাই যে তিনি শৈশব থেকেই সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এক দিকে ইংরেজী সাহিত্যচর্চা, অন্যদিকে সংস্কৃত কাব্যচর্চা। এই দ্বৈত চর্চায় তাঁর কবিমন শিশুকাল থেকে গড়ে উঠেছিল। সেই অল্প বয়সে তিনি 'কুমারসম্ভব,' 'শকুন্তলা' এবং 'মেঘদূতের' সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। শৈশবে কালিদাসের কাব্যকে পুরোপুরি উপভোগ করা হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা কিন্তু কালিদাসের কাব্যের শোভন শব্দের ধ্বনিবৈচিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মনের মধ্যে একটি ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং শৈশবের ব্যাকুলতা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কবিমনে প্রেরণা এনেছিল। যেমন তাঁর রচনায় বেদের প্রভাব এসেছে তেমনি আবার সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে প্রভাব এসেছে কালিদাসের। কবি রবীন্দ্রনাথ বাল্যশিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করে ক্রমশঃ ব্যাপকতর রূপে জীবনে যখন প্রবেশ করলেন তখন কালিদাসের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গভীরতর হল। এক কথায় বলা যায় যে তিনি বেদ এবং উপনিষদের মধ্যে সত্যের সন্ধান করেছেন, অমৃতের সন্ধান করেছেন এবং জীবনের যথার্থ অর্থের সন্ধান করেছেন, কিন্তু কালিদাসের কাব্যে তিনি পেলেন সৌন্দর্য ও সজীবতার উষ্ণ স্পর্শ। কালিদাসের কাব্যে একটা সমৃদ্ধমান আনন্দময় এবং যৌবনময় প্রহরগুলো চিরকালের জন্য যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। সে স্তব্ধতার ভাণ্ডার থেকে রবীন্দ্রনাথ কিছু শোভা ও তাৎপর্য বাংলা কবিতার জন্য এনেছিলেন, যার প্রমাণ তাঁর প্রথম দিককার কিছু কিছু কাব্যগ্রন্থে আছে। প্রধান প্রমাণ 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে আমরা পাই।

কালিদাস যখন কোনো পুরুষ বা রমণীর বর্ণনা করেছেন তখন তাঁদের শক্তি বা ক্ষমতা বর্ণনা করেননি এবং করে থাকলেও তা গৌণ, তিনি প্রধানত

বর্ণনা করেছেন তাদের দৃশ্যমান রূপ এবং তাদের সজীবতা, যে সজীবতা তাদের দৃষ্টিতে এবং অঙ্গভঙ্গিতে ধরা পড়ে। 'রঘুবংশের' ষষ্ঠ স্বর্গে রাজকুমারী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভার কথা উল্লেখ করা যায়। সমগ্র বর্ণনাটি শুধু মাত্র শোভমান একটি অপূর্ব দৃশ্যপর্বের উন্মোচন হিসাবে বিশ্বসাহিত্যে অনন্যসাধারণ। স্বয়ম্বরসভায় রাজকুমারী ইন্দুমতী যখন প্রবেশ করলেন তখন তাঁর মনোহর বেশভূষা সম্পর্কে কবি বলছেন যে তিনি পরিণয়োচিত বেশে বিভূষিত হয়ে মঞ্চশ্রেণীর মধ্যবর্তী রাজপথে প্রবিষ্ট হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শত শত নয়নের একমাত্র লক্ষ্য হলেন। বিধাতার অলৌকিক সৃষ্টি ইন্দুমতীর উপর আগত নৃপতিদের সমগ্র চিত্ত নিপতিত হওয়াতে যেন সিংহাসনে তাদের শূন্য শরীর মাত্র সংস্থিত থাকলো। তখন ইন্দুমতীর প্রতি আসক্তমনা নৃপতিবৃন্দ নানারূপ বিলাস চেষ্টা প্রদর্শন করতে লাগলেন। সেই চেষ্টা তাদের প্রণয়ের দূতী হয়ে তরুরাজির নব-পল্লব শোভার ন্যায় শোভা ধারণ করল। কোনো নৃপতি লীলাপদ্মের মৃণাল দণ্ড নাড়তে লাগলেন, কোনো নৃপতি নেত্রদ্বয় কিঞ্চিৎ অবনত করে আপন আর্তি প্রকাশ করলেন, কোনো নরপতি লীলা সহযোগে আপন অঙ্গের আভরণের প্রতি ইন্দুমতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। যাই হোক ইন্দুমতী যখন প্রথম নৃপতির সামনে এসে দণ্ডায়মান হলেন তখন প্রতিহারী সুনন্দা রাজার গুণপনার ব্যাখ্যা করলেন। সুনন্দার এই ব্যাখ্যা শুনে ক্ষীণাঙ্গী ইন্দুমতী সেই নৃপতির দিকে নেত্রপাত করে কোনো বাক্যোচ্চারণ না করে কেবল মাত্র সরল প্রণতির দ্বারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অতিক্রান্ত মগধ রাজার উদ্দেশ্যে ইন্দুমতীর সনম্র প্রণাম রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলো। তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন :

এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করেছেন তাঁকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এর অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেতো তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকতোনা।

স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীর গমনভঙ্গীর সৌন্দর্যশোভার কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে উপস্থিত করছি :

১. তরঙ্গমালা যেমন বায়ু কর্তৃক আন্দোলিত হয়ে মানস-সরোবর-বিহারিণী রাজহংসীকে একটি পদ্ম থেকে পদ্মান্তর-সমীপে নিয়ে যায়,

দ্বারপালিকা সুনন্দাও তেমনি রাজনন্দিনীকে এক নৃপতির কাছ থেকে অন্য নৃপতির পাশে নিয়ে গেল।

২. সমুদ্রগামিনী নদী যেমন পথিমধ্যে পর্বত অতিক্রম করে সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, আবর্তবৎ রমণীয় নাভিমণ্ডিতা, অন্য ব্যক্তির ভবিষ্যত পত্নী ইন্দুমতীও সেরূপ ঐ নৃপতিকে অতিক্রম করে প্রস্থান করলেন।

৩. রজনীযোগে রাজমার্গে কেউ প্রদীপ নিয়ে গমন করলে, সেই দীপরশ্মি পথের যে যে প্রাসাদ পার হয়ে যায়, সেই সেই প্রাসাদই যেরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, স্বয়ম্বরা ইন্দুমতী সেরূপ যে যে নৃপতিকে অতিক্রম করে গেলেন সেই সেই নৃপতিই বিষাদ-তিমিরে নিমগ্ন হলেন।

যে সমস্ত দৃশ্য নয়নাভিরাম এবং মনোমুগ্ধকর কালিদাস সেই দৃশ্যগুলি তাঁর শব্দের দ্বারা ছন্দে এবং সুরের সম্মোহনে উৎকীর্ণ করেছেন। সবুজে আকীর্ণ পর্বতমালা, রাত্রিকালে প্রদীপে সমুজ্জ্বল অট্টালিকা অথবা তরঙ্গে আবর্তিত জলধারা অথবা প্রস্ফুটিত পদ্ম, সবকিছুই সাধারণভাবে মানুষের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের চিহ্ন হিসাবে গৃহীত। মানুষের গতিভঙ্গির কথা কালিদাস যখন বলেছেন তখন যৌবনময় দেহের শোভমানতাকে উপস্থিত করেছেন। স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীর গমনভঙ্গি একটা যৌবনবতী রমণীর দেহের তাৎপর্য বর্ণনা করছে। এভাবে আমরা সর্বত্রই লক্ষ্য করব যে কালিদাস দৃশ্যগোচর বস্তুকে গ্রহণযোগ্য করে এঁকেছেন। রাজকুমারী ইন্দুমতী যখন স্বয়ম্বরসভায় কুমার অজের নিকটবর্তী হলেন তখনকার বর্ণনা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। কবি বলছেন ইন্দুমতী যখন রঘুনন্দন অজের নিকটবর্তী হলেন তখন কুমার অজ মনে মনে এই চিন্তায় ব্যাকুল হলেন যে ইন্দুমতী কি তাঁকে বরণ করবেন, কিন্তু তাঁর দক্ষিণবাহুর কেয়ুর বন্ধনস্থল বারবার স্পন্দিত হয়ে তার সে সন্দেহ দূরীভূত করলো। সর্বাঙ্গবিমোহন রঘুনন্দন অজকে পেয়ে রাজকুমারী ইন্দুমতী অন্য কোনো নৃপতির দিকে আর অগ্রসর হননি। কেননা মুকুলিত আম্রবৃক্ষকে পেলে ভ্রমরের আর অন্য কোনো তরুর বাসনা জাগেনা। সুনন্দা যখন কুমার অজের পরিচয় দিলেন তখন রাজনন্দিনী ইন্দুমতী লজ্জিত দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ বরমাল্যের ন্যায় প্রীতিপূর্ণ নেত্রপাতে অজকে বরণ করলেন। অনন্তর করভ সদৃশ উরুদ্বয়শোভিতা অজের কণ্ঠদেশে সাক্ষাৎ অনুরাগের ন্যায় মঙ্গলপূর্ণ বাঞ্ছিত মাল্য প্রদান করলেন। সেই মঙ্গল কুসুমময়ী মাল্য কুমারের বিশাল বক্ষপ্রদেশে বিলম্বিত হলে বরেণ্য অজ মনে করলেন,

যেন বিদর্ভ রাজকুমারী ইন্দুমতী মাল্যরূপ ভুজপাশে তাঁর কণ্ঠালিঙ্গন করছেন।

কবি কালিদাস ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে একটা আনন্দ এবং সুকুমার সৌন্দর্যের চিত্রপট উন্মোচন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভাবে কালিদাসের সৌন্দর্যপুষ্ট আলেখ্যগুলি অনুকরণ করতে পারেননি, কেননা রবীন্দ্রনাথের যুগে মানবজীবনে নানা স্বার্থ, দ্বন্দ্ব এবং কোলাহল ছিল কিন্তু কালিদাসের যুগে কবির অবকাশ ছিল এবং কবিগণ রাজন্যবাঞ্ছিত সম্মানে সম্মানিত হতেন। 'চৈতালীর' কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালের সমৃদ্ধি এবং আনন্দের কথা বলেছেন। 'ঋতু-সংহার' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, কবি কালিদাস কল্পনার কুঞ্জবনে চিরকাল জীবনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। সমস্ত পৃথিবী যেন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে তাঁকে ধারণ করে আছে এবং সমস্ত গগন স্বর্ণ-রাজছত্র তাঁর মাথার উপর ধারণ করেছে। এবং সব কটি ঋতু তার চতুর্দিকে পালাক্রমে নৃত্য করছে। কোনো দুঃখ নেই, কোনো দৈন্য নেই, শুধু কালিদাস একচ্ছত্র নৃপতিরূপে শোভা পাচ্ছেন—

"হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্যসিংহাসন-পরে।
মরকতপাদপীঠ-বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণরাজছত্র উর্ধে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের 'পরে ; ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি ;
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে, ত্রিভুবন
একখানি অন্তপুর, বাসরভবন।
নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী—
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।"

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগের সৌন্দর্যের লীলানিকেতনে বারবার উপস্থিত হতে চেয়েছেন যেখানে তিনি অক্ষয় যৌবনময় দেবতার মতো জ্যোতির্ময় পুরুষ হিসাবে চিরদিন আনন্দের লাবণ্যে প্লাবিত থাকবেন। "চিত্রা" কাব্যের "প্রেমের অভিষেক" কবিতায় কবি একথাই বলছেন। সেই যে অক্ষয় আনন্দের জগৎ যেখানে রবি-চন্দ্র-তারা কবির সভাসদ, সর্ব চরাচর হচ্ছে মিত্রের মতো, সে মহিমময় রাজ্যে তিনি যেতে চান, কিন্তু তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হচ্ছেনা, কেননা তিনি পৃথিবীর ক্ষুদ্র আকাংখা, প্রার্থনা এবং সংসারের কর্মকোলাহলের মধ্যে আবদ্ধ একজন মানুষ। কালিদাস যে সৌন্দর্যের রাজ্যে বসবাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সৌন্দর্যের রাজ্যে গমন করেছেন স্বপ্নে ও কল্পনায় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সৌন্দর্যের রাজ্যে গমন একটা সাময়িক আনন্দময় অভিসারের মতো। 'আবেদন' কবিতায় ভৃত্যের মুখে রাজপুরীর একটি শোভা তিনি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার মধ্যে বিহবলতা আছে এবং সেই যুগের আনন্দের নির্মলতার প্রতি কবির ঐকান্তিক আকর্ষণের পরিচয় আছে—

'এ পারে নির্জন তীরে
একাকী উঠেছে উর্ধে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদসৌধ, অনিন্দ্যনির্মল
চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত-ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোতকলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা; স্ফটিকপ্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোলক্রন্দনে
উচ্ছসিবে দীর্ঘদিন ছলছলছল—
মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনাবিহ্বল
করুণাকাতর। অদূরে অলিন্দ 'পরে
পুঞ্জ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্বভরে
নাচিবে ভবনশিখী, রাজহংসদল
চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল

বাঁকায়ে ধবল গ্রীবা, পাটলা হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে।''

কালিদাসের যুগের পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের ছিলনা। কালিদাসের অতুলনীয় ভাষাসম্পদও রবীন্দ্রনাথের ছিলনা। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের স্বপ্নকোলাহলের মধ্যে বাংলা ভাষার শব্দসামগ্রীকে নিয়ে কালিদাসের যুগের রমণীয় চিত্রকে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। এই সব চিত্র শুধু যে চিত্র হিসাবে উজ্জ্বল তাই নয়, এর মধ্যে অজানার একটি রহস্য আছে এবং স্মৃতিজনিত একটি বেদনা আছে। এই স্মৃতিজনিত বেদনার কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন যুগের স্মৃতিচিত্রগুলো রম্য ও মনোমুগ্ধকর হয়েছে। 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ''আবার সেই প্রাচীন ভারত খণ্ডটুকুর নদীগিরি নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর। অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য কৈলাশ দেবগিরি, রেবা সিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে। তাহার ভাষা ব্যবহার, মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে এখানকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা-সিপ্রা-নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখানকার চারিদিকের ইতর কলকাকলী হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।''

''চিত্রার'' বিভিন্ন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র সৌন্দর্যের ছবি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। দেখা যাবে যে সব চিত্রগুলি কালিদাসের যুগের চিত্রের সমধর্মী। তিনি তাঁর জীবনদেবতাকে সেই প্রাচীন আনন্দলোকে উপনীত করবার জন্য সহায়তা করতে বলেছেন। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে 'বিজয়িনী' কবিতার রূপকল্পে প্রাচীন সৌন্দর্য-ধ্যান রয়েছে। কোথাও পৃথিবীর কোলাহল নেই, প্রকৃতির অম্লান নির্জন সৌভাগ্যের মধ্যে তিনি একটি যৌবনবতী রমণীর দেহ-সৌষ্ঠবকে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনার মধ্যে দেহের সজীবতার সঙ্গে প্রকৃতির সজীবতা একাকার হয়েছে এবং লাবণ্যময়ী রমণী প্রকৃতির সঙ্গে স্বভাবে, শ্রী ও সম্পদে একাকার হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। সৌন্দর্যের এই যে তন্ময় মূর্তি যা পৃথিবীর বিফলতায় বিমূঢ় নয়, স্বভাবের দিক থেকে সেই মূর্তি কালিদাসের সমগোত্রীয়। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সৌন্দর্য বর্ণনার

কিছু সংখ্যক বিশেষণ এবং বিভিন্ন নামবাচক শব্দকে বাংলা কবিতার ধ্বনি-রূপের সঙ্গে সুসমঞ্জস করে যে চিত্র নির্মাণ করেছেন তাতে কালিদাসের কালের স্মৃতিকে যেমন পাই তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিত্তের আকাংখাকেও সেখানে মূর্ত হতে দেখি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগকে নতুন করে জাগ্রত করেননি। তিনি তাঁর কালে অধিষ্ঠিত থেকে কালিদাসের যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে এই যে বর্তমান কালে অধিষ্ঠিত থাকার কথা সর্বত্রই প্রবলভাবে চিহ্নিত, এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট এবং কালিদাসের সঙ্গে ব্যতিক্রম। "রঘুবংশের" অন্য একটি বর্ণনা আমি উল্লেখ করছি যেখানে কবি কালিদাস সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র নয়ন-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বর্ণনা পাঠে আমাদের মনে হয় যে কবি কৌশল করে একমাত্র নয়নকে একাগ্র করেছেন। বর্ণনাটি হচ্ছে কুমার অজ ইন্দুমতীকে নিয়ে নগরাভিমুখে যখন প্রবেশ করলেন তখনকার। কবি বলছেন—"তখন পূরবাসিনী রমণীরা বরদর্শনে উৎসুক হয়ে সকল কর্ম পরি-ত্যাগ করে স্বর্ণময় গবাক্ষ-শোভিত প্রাসাদমালায় উঠে নানারূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন। কোনো রমণী দ্রুতগতিতে গবাক্ষ সন্নিধানে গমন করছিলেন, তখন তাঁর কবরীবন্ধন খুলে গেল এবং কবরী থেকে মাল্যদাম স্খলিত হয়ে পড়ল। তিনি হাত দিয়ে তা ধরে রাখলেন, কিন্তু তা যে আবার বাঁধতে হবে সে চিন্তা তার মনে উপস্থিত হলনা, সেভাবেই তিনি গমন করতে লাগলেন। কেশবিন্যাসকারিণী হাত দিয়ে কোনো রমণীর চরণে অলক্তক রঞ্জিত করছিল, তিনি সেই আদ্রপদ আকর্ষণপূর্বক বিলাসগতি বিসর্জন করে গবাক্ষ-সমীপে গমন করলেন, গবাক্ষ পর্যন্ত সমগ্র পথ লাক্ষা-রঞ্জিত চরণচিহ্নে চিহ্নিত হল। কোনো রূপবতীর দক্ষিণ নেত্রে অঞ্জন লাগানো হয়েছিল, কিন্তু বাম নয়ন অঞ্জনশূন্য ছিল, তিনি সে অবস্থাতেই কাজল শলাকা নিয়ে গবাক্ষসমীপে গমন করলেন। কোনো রমণী গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করে গমন করছিলেন। গমনবেগে বসন স্খলিত হয়ে পড়ল, তা আর বন্ধন করা হলনা। তিনি কঙ্কন অলংকারপ্রভায় নাভি-বিবর রঞ্জিত করে হস্ত দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র ধরে রাখলেন। কোনো রমণী অর্ধগ্রথিত কাঞ্চীদামসহ ত্বরিতবেগে গাত্রোত্থান করে দ্রুত বেগে গমন করতে পদে পদে কাঞ্চিদাম থেকে সকল মণিমুক্তা খুলে পড়তে লাগল, অবশেষে তাঁর অঙ্গুষ্ঠমূলে সূত্রমাত্র অবশিষ্ট থাকল। কৌতূহল বশবর্তিনী সে সকল পৌরাঙ্গ-

নার আসবগন্ধপূর্ণ চপল নেত্ররূপ ভ্রমরবিশিষ্ট বদনরাজিতে গবাক্ষগর্ভ সমাকীর্ণ হওয়াতে পদ্মমালামণ্ডিত বলে ভ্রম হতে লাগল। তাঁরা সবাই তদগত হৃদয়ে অজকে দর্শন করতে প্রবৃত্ত হলেন। মনে হল যেমন তাঁদের অপরাপর ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ সর্বপ্রকারে একমাত্র নয়নেই প্রবিষ্ট হয়েছে।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই প্রকৃতির বর্ণনা আমরা পাইনা। কালিদাসের বর্ণনার মধ্যে যে মোহময়তা আছে অথবা যে উল্লাস আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তা সম্পূর্ণ-রূপে উপস্থিত নেই। কালিদাস এমন একটি জগৎ নির্মাণ করেছিলেন যে জগৎ চির-শ্যামল, চির মধুর এবং বেদনারহিত হাস্যময়। রবীন্দ্রনাথ সে জগতের আংশিক ভাবানুষঙ্গ "কল্পনা" কাব্যগ্রন্থে চিত্রিত করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থে কালিদাসের সৌন্দর্যের প্রতি কবির আকর্ষণের অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং অনেকস্থলে সে সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে নির্মাণও করে-ছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে সে জগতের সঙ্গে তাঁর যুগের দুস্তর ব্যবধান। "বর্ষামঙ্গল" কবিতাটিতে নবযৌবনা বর্ষার যে বর্ণনা আমরা পাই সে বর্ণনা বাস্তব বিবেচনায় অপ্রাকৃত কিন্তু কালিদাসের সমৃদ্ধির অনুষঙ্গে তা মধুর ও আকর্ষণীয়, যেমন এই অংশটি—

'কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎচকিতনয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।

ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শংখ, হুলুরব করো বধূরা
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,

ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার-রাগিণী-!
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী।

এখানকার বর্ণনাটি দৃষ্টিগ্রাহ্যতায় অপূর্ব। কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের বর্ণনা থেকে অনেকগুলো চিত্র এখানে নির্মাণ করেছেন। একাকার হয়ে সবকটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেউ শংখ বাজাচ্ছে, বধূরা হুলু দিচ্ছে, কুঞ্জকুটিরে কোনো রমণী ভাবাকুল নয়নে বসে আছে, ভূর্জপাতায় কেউ লেখা লিখছে, কেউ আবার অংগ প্রসাধন করছে, আবার কেউ তালি দিয়ে ভবনশিখীরে নাচাবার চেষ্টা করছে। সবকটি দৃশ্যেরই আবেদন নয়নের কাছে এবং তা সম্ভব হয়েছে কালিদাসের কাব্য থেকে শব্দ, অলংকার এবং দৃশ্যপট ব্যবহার করায়। অন্য একটি কবিতায় কবি কালিদাসের যুগের চিত্রাংকন সম্পূর্ণ করে বর্তমান কালের মানুষ হিসাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে সে যুগের অপূর্ব প্রহরগুলির সঙ্গে বর্তমান মানুষের মৈত্রী নেই—

"মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু আছ তো ভালো?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত—মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহাপানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।"

'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটি অনুপ্রাসের ললিতবিস্তারে, বাংলা কবিতার ধ্বনিসাম্যে, কালিদাসের কাব্যসম্ভার থেকে আহৃত বিভিন্ন নামবাচক শব্দের সংস্থিতিতে এবং সেকালের আসর বিনোদনের পরিচয়-সূত্রে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত, কিন্তু এসব সত্ত্বেও কালিদাসের কাব্য-সৌন্দর্যের প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কালিদাস তাঁর যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং

প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসাবে সে যুগের যে সমৃদ্ধি এবং আনন্দের মধ্যে তিনি বাস করতেন তার পরিচয়ও তাঁর শব্দে, উপমা অলংকারে এবং-ধ্বনি-মাধুর্যে বহমান হয়েছে। সেই কারণে কালিদাসের কাব্যের বিবিধ অলংকৃত উল্লাস চিত্রগুলো তাঁর যুগের সঙ্গে সুসমঞ্জস এবং তাঁর কালের সঙ্গে একাত্ম। অন্য পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্য নির্মাণ করেছেন তা স্মৃতির অট্টালিকা। তিনি যে চিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন সেই চিত্রগুলো কালিদাসের কাব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। সেই সব চিত্রের বাস্তব স্থিতি কোথাও নেই। এ কারণে বার বার তাকে সচকিত হতে হয়েছে এবং বলতে হয়েছে যে কালিদাসের যুগের সঙ্গে তাঁর যুগের একটি সহজ সংলাপগত মৈত্রী গড়ে উঠতে পারেনা। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ দু'টি কবিতা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। একটি হচ্ছে 'মদনভস্মের পূর্বে' আর একটি হচ্ছে 'মদনভস্মের পরে।' 'মদন-ভস্মের পূর্বে' কবিতায় যে রসাবেশ তা হচ্ছে কালিদাসের কাব্যের এবং 'মদনভস্মের পরে' কবিতাটির রসাবেশ রবীন্দ্রনাথের কালের। প্রথম কবিতাটিতে একটি সমৃদ্ধমান সম্ভোগের বর্ণনা যেখানে প্রেম একটি উল্লাসময় আচরণ মাত্র, যেখানে সজীব দেহের আকাংখা সমর্থিত হয়েছে। 'মদন-ভস্মের পরে' কবিতায় প্রেম হচ্ছে একটি হৃদয়বৃত্তি যেখানে পাবার জন্য আকাংখা আছে, অপ্রাপ্তি জনিত বেদনা আছে এবং নিগূঢ়ভাবে প্রণয় নিবে-দনের মধ্যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা আছে। এ হৃদয়বৃত্তি রোমান্টিক রসাবেশের পরিচয় বহন করে। "কল্পনায়" রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ নিমাণ করেছেন সে জগৎ যে আকাশ কুসুম সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। 'বেহাগে' রচিত একটি গানে তিনি বলছেন—

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।

কালিদাসের কাব্যের শব্দব্যবহার, ধ্বনিব্যঞ্জনা ও বিশিষ্ট প্রকাশরীতি, উপমা-পরম্পরায় অসাধারণ সৌন্দর্য সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। আমরা শুধু এই কথাই বলতে পারি, যে কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথের ভাবধারাকে উদ্বোধিত করেছিল। প্রায় দু'হাজার বছর আগে কালিদাস যে সৌন্দর্যের জগৎ নির্মাণ করেছিলেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের যে নিগূঢ় বন্ধনের পরিচয় দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে তা ব্যাকুল করেছে। এই ব্যাকুলতা থেকেই রবীন্দ্রনাথ "কল্পনা" কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই কাব্যের মাধ্যমে অতীতের যবনিকা অপসারিত হয়েছে এবং কালিদাস সম্পর্কে আমরা নতুন করে আগ্রহান্বিত হয়েছি। আমরা দেখতে পাব যে "কল্পনা"র মধ্যে প্রধানত "মেঘদূতে"র চিত্রগুলো এসেছে। কেবল মাত্র আনন্দ দানকে উদ্দেশ্য করে এই কাব্যটি রচিত এবং এই কাব্যের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এঁর অপূর্ব চিত্র-পরম্পরা। এ কাব্যে একটি অহেতুক আনন্দ বিরচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন, "কেবল আনন্দ-ধ্বনিকে উদ্দেশ্য করেই কাব্য রচনা সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসে প্রথম দেখা গেল। এখানে আমি খণ্ড কাব্যের কথা বলিতেছি—নাটকের কথা নয়। মেঘদূত তাহার এক দৃষ্টান্ত, এমন দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বোধ করি আর নাই।" অন্যত্র বলছেন, "প্রকৃতির সাংবাৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কাব্যগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের সম্ভোগ, সর্ববাঁধনহীন চিত্তমুক্তি এবং অফুরন্ত আনন্দের কথা লক্ষ্য করে পুনশ্চের একটি কবিতায় লিখছেন—

"মেঘদূতে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার 'পরে—
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী।
সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝরনায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে,
মুখরিত বনহিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী।
একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে

বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত
নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।
যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হল শেষ।"

কবি কালিদাসের চিত্রনির্মাণ পদ্ধতিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কবি মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে, যৌবনের আবেগে দীপ্ত করে এবং বিভিন্ন কর্মচাঞ্চল্যে উপস্থাপিত করে চিত্রগুলোকে সার্থক করেছেন। এ সব কারণে কালিদাসের ছবিগুলোকে কখনও অবাস্তব মনে হয়না। পুষ্প-নিকুঞ্জে একটি যৌবনবতী রমণী অত্যন্ত স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক যৌবন-ময় দেহ নিয়ে কারো অগ্রসরমানতা। কবি কালিদাস শুধু মাত্র একটি বস্তুকে দৃশ্যগোচর করেই ক্ষান্ত হননি, বস্তুকে সঙ্গে সঙ্গে সবল এবং সজীব করেছেন। সেই কারণে কালিদাসের কোনো চিত্রকে আমরা অবাস্তব বলে স্বীকার করতে পারিনে। "রঘুবংশের" চিত্রগুলো পরীক্ষা করলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে কবি কালিদাস যে সময়কালের জীবন-ইতিহাস নির্মাণ করেছেন, তিনি তার শব্দে এবং ছন্দে সেই জীবন-ইতিহাসকে বাস্তবরূপে হিল্লোলিত রেখেছেন। এহেন সফলতা সম্ভবপর হয়েছে শুধু মাত্র কবির গভীর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সর্বক্ষেত্রে পূর্ণতার চিত্রকে উপস্থাপিত করবার আগ্রহের জন্য এবং কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যকে সুগভীর সত্য-রূপে চূড়ান্ত মূল্য দেবার জন্য। কালি-দাসের কোনো চিত্রই অসম্পূর্ণ নয়। যেখানে রমণীকুল রাজকুমারকে দেখবার আগ্রহে গবাক্ষ-সান্নিধ্যে যাত্রা করেছে সেখানকার দৃশ্যটিও সর্বতো-ভাবে পরিপূর্ণ। আমরা বিভিন্ন রমণীর গমন-ভঙ্গির মধ্যে একটি ঔৎসুক্য, আগ্রহ, কৌতূহল এবং কামনা রেখাংকিত হতে দেখি। প্রতিটি রমণী সমগ্র চিত্রের অংশবিশেষ এবং সকলে মিলে চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা কালিদাসের এই সম্পূর্ণতাকে পাইনা, সেখানে অসম্পূর্ণতাই সকল আবেগের পরিণাম। 'স্বপ্ন' কবিতাটি, 'স্পর্ধা' কবিতাটি,

'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটি—সব কয়টিই অসম্পূর্ণতার বেদনাকে ধারণ করে আছে। কালিদাসের পক্ষে চিত্রগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ সম্ভবপর ছিল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের নির্ভরতা হচ্ছে কালিদাসের উপর এবং কালিদাসকে তিনি অনুকরণ করছেন না, কালিদাসকে তিনি স্মরণ করছেন। এভাবে স্মরণ করতে যেয়ে কালিদাসের কালকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পাচ্ছেন না এবং না পাওয়ার কারণেই তাঁর বেদনা এবং যন্ত্রণা। এই মৌলিক পার্থক্যের কথা আমরা চিন্তা করলে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে অবাস্তব যেমন বলব আবার সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তবতার পূর্ণ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কবির ব্যর্থতাকে তেমনি প্রশংসা করব। এক কথায় বলা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি আধুনিক কবিমন সজাগ রয়েছে যে মন একটি অনাবিল নিশ্চিন্ততায় প্রাচীন যুগকে স্মৃতিকক্ষে পেতে চায় কিন্তু তা যে পাওয়া যায় না সে সম্পর্কে সে অবহিত। কীট্‌স যেমন তাঁর "Ode to a Nightingale"-এ একটি স্বপ্নরাজ্য নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু কবিতার শেষে সে স্বপ্নরাজ্য আবার তিনি ভেঙ্গে ফেলেছেন, তার কারণ বাস্তব জীবনের জ্বর, দুঃখদাহন এবং অন্যান্য জটিলতা তাঁকে সবসময় স্বপ্নপ্রয়াণ করতে দেয়নি। কীট্‌স-এর অনেক কবিতায় আমরা লক্ষ্য করবো যে কবি একটি প্রাচীন অবাস্তব কালের মধ্যে নিজেকে জাগরিত পেতে চেয়েছেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই প্রতিদিনকার পৃথিবীর স্পর্শ অনুভব করে তাঁকে সজাগ হতে হয়েছে। এই যে দ্বন্দ্ব এবং দ্বিধা তাঁর কবিতার প্রাণকেন্দ্রে স্বকীয়, সেই দ্বন্দ্ব-দ্বিধাই তাঁর কবিতার মাধুর্যের মূলে। কালিদাসের যুগের চিত্র নির্মাণ করে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত ইমেজ বা বাক-প্রতিমা নির্মাণ করেছেন, সেই ইমেজগুলো কবির কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ইমেজ নয়, তাঁর নিজস্ব কোনো আবেগ বা অনুভূতির ইমেজ নয় অথবা তা অনুভূতির সঙ্গে বিজড়িত মানসিক কোনো ঘটনার প্রকাশও নয়। তাহলে এই ইমেজগুলোর সাফল্য কোথায়? এজরা পাউণ্ড বলেছেন যে ইমেজ হচ্ছে সেই বস্তু যা একটি একক মুহূর্তে বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয়কে উপস্থিত করে। রবীন্দ্রনাথের "কল্পনা" কাব্যগ্রন্থে আমরা লক্ষ্য করি যে সেখানে কালিদাসের কাব্য-পাঠের স্মৃতি রয়েছে এবং বুদ্ধির সাহায্যে সেই পাঠস্মৃতিকে তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। সুতরাং এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ইমেজ সৃষ্টি সফল হয়েছে বলতে হবে। মনের মধ্যে

অথবা স্মৃতিতে অতীতের কোনো আবেগ বা অনুভূতিকে অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে নতুন করে নির্মাণ করাকে ইমেজ বা বাক-প্রতিমা বলা যায়। অনুভূতির সঙ্গে বিজড়িত মানসিক কোনো ঘটনাকে প্রকাশ করার মধ্যেও ইমেজের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। শুধুমাত্র কোনো দৃশ্যের বা ঘটনার চিত্ররূপে ইমেজের সাফল্য নয়। আমি পূর্বেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ এসব কবিতায় তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেননি এবং সেই অর্থে মানসিক কোনো ঘটনাকে প্রকাশ করেননি, আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি-গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ছবিও এর মূলে নেই কিন্তু তবুও এ চিত্রগুলো অসার্থক নয়, কেননা কালিদাসের কাব্য-পাঠের স্মৃতি থেকে যে অনুভূতি জেগেছে সেই অনুভূতির বুদ্ধি ও আবেগগত সমন্বয়ই এই চিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং সেখানেই এই চিত্রগুলোর সাফল্য।

কবি কালিদাসের কবিভাষা একটি চিরায়ত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, যে বৈশিষ্ট্য তাঁর সকল কাব্যে প্রতিবিম্বিত। আমরা সর্বক্ষেত্রেই কবির সচেতনতার পূর্ণকাম রূপশ্রী বিকশিত দেখতে পাই। লক্ষ্য করা যায় যে কালিদাসের একটি কাব্যের সঙ্গে অন্য কাব্যের ভাষারূপের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সেই কারণে কবির অনুভূতির বিবর্তন-ধারার কোনো পরিচয় আমরা পাইনা। যা আমরা পাই তা পূর্ণরূপে পাই। কথাটি এ ভাবে বুঝান যায় যে কালিদাসের কাব্যের আরম্ভ এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আমরা তাঁর সার্থক কাব্য ও নাট্য সৃষ্টির কতকগুলো উদাহরণ পেয়েছি মাত্র এবং সবগুলোর মধ্যে একজন সার্থক শিল্পীর পরিশ্রম এবং কুশলতার চিহ্ন বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের কবিভাষার ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য হবেনা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির একটি আরম্ভ আছে, ক্রম-বিকাশ আছে এবং ভাষারূপের বিচিত্র পরিবর্তন আছে। তাই "কল্পনা"র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে যে রূপে বিকশিত দেখি সেই রূপটাই তাঁর পরম রূপ নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় "কল্পনা" কাব্য-গ্রন্থে বিধৃত নয়। শুধু একটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার মধ্যে ভাষাগত ঐক্য আছে তা হচ্ছে তৎসম শব্দের ব্যবহারের বিশিষ্টতা। "কল্পনা" অথবা "ক্ষণিকা" অথবা "বলাকা" অথবা "শেষ লেখা", সর্বক্ষেত্রেই তৎসম শব্দের একই প্রকার নির্ভরযোগ্য ব্যবহার আছে। পরিবর্তনটা এসেছে শুধু এই সমস্ত শব্দের বিশেষ বিশেষ বিন্যাস ও প্রয়োগবিধির মধ্যে। 'স্বপ্ন'

কবিতাটির কথা ধরা যাক। এই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো কল্পনার এমন একটা আশ্লেষে আচ্ছন্ন যে সৌন্দর্য ও সুষমায় তা অলৌকিক এবং পরিচিত জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। ছন্দ ও অনুপ্রাসের ব্যবহারে এবং কালিদাসের কাব্য থেকে সংকলিত বিভিন্ন বিশেষ্যের প্রয়োগে 'স্বপ্ন' কবিতাটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছে। এখানে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক কোনো চিত্রে ধরা পড়েনি অথবা ছন্দে ও ধ্বনিতে ধরা পড়েনি, ধরা পড়েছে কবি-চিত্তের একটি ইচ্ছার অভিব্যক্তিতে। কবি প্রাচীনকালের দয়িতাকে একান্তভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু দেখা গেল ভাষাগত এবং কালগত ব্যবধান থেকে তাকে নিবিড় করে পাওয়া সম্ভবপর নয়। এই বেদনাবোধের কারণে এই কবিতা বর্তমান মুহূর্তের সঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সম্পর্কিত এবং সে কারণে কবিতাটি গ্রহণ-যোগ্যও হয়েছে। "কল্পনা"র অন্য একটি কবিতা "ভ্রষ্টলগ্ন"। এ কবিতা-টিতে যে সমস্ত চিত্রপট উন্মোচিত হয়েছে তার মধ্যে বাস্তবতার সাড়া নেই এবং. কবি পূর্বের মতই এখানেও বিচিত্র ধ্বনিব্যঞ্জনার অনুপ্রাসে এবং কালিদাসের কাব্য-সমর্থিত রূপকল্পের ব্যবহারে একটি ছন্দের তন্ময়তা সৃষ্টি করেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কালিদাসের প্রভাব আছে কিন্তু সে প্রভাবটুকু কোনো সমগ্রতার সৃষ্টি করেনি। কালিদাসের প্রতিটি কাব্য যে অর্থে পূর্ণাঙ্গ, কালিদাসের প্রভাবযুক্ত রবীন্দ্র-নাথের কবিতাগুলো সেই অর্থে পূর্ণাঙ্গ নয়। এখানে অসম্পূর্ণতাতেই কবিতাগুলোর লীলাময় মাধুর্য।

রবীন্দ্রনাথ কোনো একটি আঙ্গিকের বন্ধন-সীমায় চিরকাল আবদ্ধ থাকেননি। অনবরত তাঁর কাব্যরূপের আকৃতির ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং কখনও কবি কোনো বিশিষ্ট রীতি বা নীতি বা সাধনার চির-কালীন পৃষ্ঠপোষক হননি। বেদ এবং উপনিষদের প্রভাব তাঁর কাব্যে আমরা সুস্পষ্টভাবে পাই, কিন্তু সে প্রভাব কবিতার রূপকল্পে, ছন্দে এবং শব্দ ব্যবহারে। নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের অনুসন্ধান তিনি তাঁর কবিতায় করেননি। তেমনি কালিদাসের কাব্যের অলংকার-মাধুর্য এবং সৌন্দর্য-লীলাকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এগুলোর মধ্যেই মানব-চিত্তের সম্পূর্ণতা তিনি সন্ধান করেননি। তাই কালিদাসের প্রভাবে রচিত তাঁর কবিতাগুলোতে শব্দ ব্যবহার সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে

কালিদাসের যতটুকু গ্রহণ করার ততটুকুই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি কালিদাসের প্রভাবযুক্ত কবিতাগুলোকে বিশেষ প্রসঙ্গের প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করেননি। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা ছিল আপন যুগ-প্রতিবেশের মধ্যে বর্তমান থেকে কালিদাসের মর্মলোকে ক্ষণকালের জন্য প্রবেশ করা। তাই এখানে লক্ষ্য করি যে প্রাচীন যুগ আমাদের সময়কালের মধ্যে স্বচ্ছন্দ পদচারণার অধিকার পায়নি। আমাদের যুগই স্বপ্ন-প্রয়াণ করে প্রাচীন অঙ্গনে ক্ষণকালের জন্য পদচারণা করেছে। এর প্রমাণ "কল্পনা"র প্রতিটি কবিতায় স্পষ্ট, 'বর্ষামঙ্গলে'র মধ্যে স্পষ্ট, 'চৌরপঞ্চাশিকা'তে স্পষ্ট, "স্বপ্ন" 'ভ্রষ্টলগ্ন' ইত্যাদি সকল কবিতায় স্পষ্ট। কবি সকল ক্ষেত্রেই প্রাচীন কালের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রাচীন কাল বর্তমানের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছেনা। তার কারণ কবি সর্বমুহূর্তে প্রাচীন এবং বর্তমান এই উভয়ের ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন। 'বর্ষামঙ্গলে' জনপদবধূ তরুণী পথিক ললনা, মালতী মালিনী প্রিয় পরিচারিকা এবং নিশিথ রাত্রির অভিসারিকার কথা কবি কল্পনা করেছেন। তারা তাদের কালের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে। কবি শুধু মাত্র আবরণ উন্মোচন করে তাদের দিকে ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টিপাত করেছেন মাত্র। 'স্বপ্ন' কবিতার বক্তব্য আরো স্পষ্ট। যেখানে কবি বলেছেন যে তিনি বহু দূরের স্বপ্নলোকের যে উজ্জয়িনী সেখানে তার পূর্ব জন্মের প্রথম প্রেয়সীর অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলেন। এখানে প্রাচীন কাব্য রবীন্দ্রনাথের কাছে সমগ্রভাবে নব জন্ম লাভ করেনি। আমরা শুধু তার আংশিক চিত্রাবলি কখনও কখনও দেখতে পাচ্ছি মাত্র। এক কথায় বলা যায় কালিদাসের কাব্যের যে বসন্তের উচ্ছ্বাস এবং যে উত্তাল ও আনন্দ, রবীন্দ্রনাথ সেগুলোর পুনরুন্মেষ ঘটিয়েছেন। কালিদাসের কবিতা তার নিজস্ব পটভূমি নিয়ে প্রাণবন্ত এবং সত্য। কেননা সেখানে আমরা শুধু মাত্র কল্পনার বিন্যাসই পাইনা, সেখানে আমরা একটি যুগের সত্যকে বিধৃত হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কালিদাসের এই যুগসত্যটা নেই। কিন্তু সৌন্দর্যের, প্রণয়ের এবং আনন্দের পূর্বকালীন অভিসারের ইঙ্গিত আছে। এক কথায় বলা যায় যে কালিদাসের কাব্যগুলোর সমগ্র স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে না পেলেও আমরা সেই কাব্যগুলোর ভাব-কল্পনার পুনরুদ্ধার লক্ষ্য করেছি। যেহেতু কালিদাসের

কবিতার বিশিষ্টতা হচ্ছে বর্ণনার বিস্তার, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই বর্ণনার বিপুল বিস্তারকে নতুন করে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর ছিলনা। কালিদাসের কবিতায় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে পরিলক্ষিত এবং তার প্রতিটি কাব্যে এক একটা দৃশ্য এক বিশেষ চিত্রকল্পনায় উদ্ভাসিত এবং তাঁর যে কোনো একটি সমগ্র কাব্য একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রশালা রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত। কালিদাসের বিচিত্র চিত্রগুলো কোনো দৃশ্যের বা ঘটনার শুধুমাত্র বহিরঙ্গেরই যথার্থ অনুলিপি নয়, সেগুলো কবির অন্তর্লোকেরও অলংকৃত চিত্রকল্প। "রঘুবংশে"র মধ্যে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন বর্ণনা শুধুমাত্র দৃশ্যপটেরই উন্মোচন করেনা, সেগুলো অনুভূতিগ্রাহ্য গুণাবলীতেও উদ্ভাসিত। অর্থাৎ কালিদাসের প্রতিটি বর্ণনা একই সঙ্গে বাইরের দৃশ্যগোচর শোভার প্রতিচ্ছবি আবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের ভাব-ব্যঞ্জনার প্রতিলিপি। কবি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা এখানে যে তিনি কালিদাসের পরিচয়লিপি নতুন করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

"কল্পনা" কাব্য-গ্রন্থে অলংকার নির্বাচন ও শব্দ চয়নে বিশিষ্টার্থক সিদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের পরিচয়-লিপিকে নতুন ব্যঞ্জনায় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। দু-একটি ক্ষেত্রে কালিদাসের প্রতিচিত্রন নেই, কিন্তু সমান্তরাল ব্যঞ্জনা আছে। যেমন 'পিয়াসী' কবিতাটি। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছেন যাকে কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকের আশ্রম-প্রতিবেশের শ্রী ও শোভার সঙ্গে তুলনা করা চলে, অথচ এখানকার উন্মোচিত চিত্রটি বাংলাদেশের পল্লীর প্রাতঃকালের। সমান্তরাল ব্যঞ্জনার কারণে কবিতাটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এই সমান্তরাল ব্যঞ্জনা 'পসারিণী' কবিতাটিতেও আছে।

কালিদাসের কাব্যে একদিকে যেমন পৃথিবীর ঐশ্বর্যের অজস্রতা অন্য দিকে তেমনি তপোবনের স্নিগ্ধ শান্ত এবং ভোগবিরতির পরিবেশ। এ দুটি অবস্থা একটি অপরের প্রতিপক্ষ নয় বরঞ্চ প্রতিটি অবস্থায় নিজ নিজ অঞ্চলে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ এবং একটি অপরটিকে সমর্থন করেই বেঁচে আছে। নগরের ঐশ্বর্যের বিপুলতা, প্রাচুর্য এবং বিরামহীন ভোগের নিরংকুশ আনন্দ কালিদাসের কাব্যে যেমন সত্য, অন্য দিকে তেমনি পার্থিব ঐশ্বর্যবিহীন তপোবনে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য এবং স্নিগ্ধ শান্তি তেমনি সত্য। নগরের

ঐশ্বর্য্য অথবা রাজ-ভাণ্ডারের প্রাচুর্য তপোবনকে ক্লিষ্ট করেছে, আবার তপোবনের ভোগ-বন্ধনহীন নির্বিকার অবিচল শান্তি নাগরিক প্রাচুর্য্যকে ব্যঙ্গ করছে না। "শকুন্তলা" নাটকে আমরা লক্ষ্য করছি যে রাজা দুষ্মন্ত ঐশ্বর্য্যের অভিমানে অভিমানী হয়ে আশ্রমকে তুচ্ছ করছেন না, বরঞ্চ তপোবনের ক্লেশ উৎপাদন না করে তপোবনকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করছেন। রাজা যখন কন্বমুণীর তপোবনের নিকটে একটি হরিণ দেখে শর-সন্ধানের উপক্রম করলেন, তখন আশ্রম থেকে নিষেধ এলো, হে রাজন, এটি আশ্রম-মৃগ, একে বধ করবেন না। আশ্রমের নিষেধাজ্ঞা শুনে রাজা যে শর-সন্ধান করছিলেন তার প্রতিসংহার করলেন। আশ্রমের একজন অধিবাসী এ কারণে রাজাকে প্রশংসা করলেন এবং বললেন পুরু বংশপ্রদীপ আপনার পক্ষে এটা উপযুক্ত কাজ হলো এবং রাজাকে আশ্রমের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণের জন্য রাজা স্বীকৃত হয়ে আশ্রমের অতিথিসৎকার গ্রহণ করলেন। রাজা আশ্রমের বর্ণনা এভাবে দিচ্ছেন, "এ স্থান তপোবন বলে মনে হচ্ছে, এখানে কোটরস্থ শাবকের মুখ থেকে নীবারকণা বৃক্ষমূলে পড়ে রয়েছে এবং তাপসেরা যে সব প্রস্তরখণ্ড দিয়ে ইঙ্গুদী ফল ভেঙেছিলেন প্রস্তর খণ্ডে সেসব ফলের নির্যাস সংলগ্ন থেকে তপোবনের সূচনা করছে। রথের শব্দ শুনে হরিণেরা ভীতচকিত না হয়ে বিশ্বাসভরে তা সহ্য করছে। জলাশয়ের পথে বল্কলাগ্রদেশ থেকে বারিধারা নিপতিত হচ্ছে, এতেও তপোবনের সূচনা পাই। এখানে যে ক্ষুদ্রকায়া কৃত্রিম নদী বিদ্যমান বায়ুভরে তার জল কম্পিত হওয়াতে তীরবর্তী সকল বৃক্ষের মূলদেশ প্রক্ষালিত হচ্ছে, আহুতি-প্রাপ্ত ঘৃত থেকে ধূম উত্থিত হওয়ায় নবীন পল্লবের রক্তিমা ঈষৎ মলিন হয়েছে এবং যে উদ্যান ভূমিতে তাপসগণ কুশ মূল ছিন্ন করেছেন মৃগ শাবকেরাও সেখানে নির্ভীকচিত্তে আমাদের নিকটে পরিভ্রমণ করছে।" তপোবনের এ প্রকার সূচনা বর্ণনা করে রাজা বিনীতভাবে প্রবেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ এ বর্ণনাটি 'প্রাচীন সাহিত্য' নামক গ্রন্থে নিম্নরূপে উপস্থিত করেছেন :

"মহর্ষি কন্বের মালিনীতীরবর্তী আশ্রমেও এই রূপ। সেখানে হুতহোমের ধূমে তপোবনতরুর পল্লবসকল বিবর্ণ, সেখানে জলাশয়ের পথসকল মুনিদের সিক্ত বল্কলক্ষরিত জলরেখায় অংকিত এবং সেখানে বিশ্বস্ত মৃগসকল রথচক্রধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষকে নির্ভয় কৌতূহলের সহিত শুনিতেছে।"

"শকুন্তলা" নাটকে প্রেমের যে অভিব্যক্তি তা হচ্ছে বল্কলবসনা তাপস-কন্যার সঙ্গে সসাগরা ধরণীর চক্রবর্তী অধীশ্বরের সঙ্গে। এই দুয়ের মধ্যে মূলত কোনও বিভেদ নেই, কেননা উভয় ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্য আছে, এক দিকে প্রকৃতির এবং যৌবনের ঐশ্বর্য্য, অন্যদিকে পার্থিব সম্পদের ঐশ্বর্য্য। নিজ নিজ কক্ষ থেকে উভয় উভয়কে সমর্থন জানাচ্ছে এবং উভয় আপন আপন অঞ্চলে বেঁচে আছে একে অন্যের সাহায্য ও সমর্থনে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চৈতালী" কাব্যগ্রন্থে যে তপোবনের কল্পনা করেছেন সে তপোবন যদিও কালিদাসের কালের তপোবন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিচারে সে তপোবনের সঙ্গে ঐশ্বর্য্য এবং পার্থিব অহমিকার বিরোধ আছে। কালিদাসের কাব্যে তপোবন এবং নগরের ঐশ্বর্য্য একটি অন্যটিকে আঘাত করেনা, উভয়ই সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এ-দুটির একটি হচ্ছে অন্যটির বিকল্প। "চৈতালী"র 'তপোবন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমি আমার মনশ্চক্ষুতে যখন প্রাচীন ভারতকে দেখি তখন বিপুল ছায়া নিয়ে মহারণ্য আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। রাজা রাজ্য-অভিমান ত্যাগ করে গুরুর মন্ত্রণার জন্য নতশিরে তপোবনে প্রবেশ করেন এবং এ তপোবন এমন একটি অঞ্চল যেখানে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে জীবনক্ষেত্রে ত্যাগকে উজ্জ্বল করেন।

"মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন---
পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি—স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুব তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন

মুকুটবিহীন রাজা পক্ককেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।"

'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই বিকল্প চিন্তার পরিচয়টি আরো স্পষ্ট। সেখানে তিনি বলছেন যে তিনি নগরের সভ্যতাকে ত্যাগ করে তপোবনের পুণ্য ছায়াকে পেতে চান—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।"

শুধু যে কালিদাসের প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল তাই নয়, বানভট্টের "কাদম্বরী" উপাখ্যানের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছে আমরা দেখতে পাব। "চিত্রার" "প্রেমের অভিষেক" কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"প্রেমের অমরাবতী—
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘনিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদমর্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি,
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী,

ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে, মহারণ্যে যেথা
বীণা হস্তে লয়ে তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশমন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনাসিঞ্চিত।"

উপরের উদ্ধৃতির সর্বশেষ চিত্রটি "কাদম্বরী" উপাখ্যানের মহেশমন্দিরে সঙ্গীতনিরতা মহাশ্বেতার। "চিত্রা"র অন্য একটি কবিতায় আমরা মহাশ্বেতারই সৌন্দর্য মূর্তি নতুন করে উন্মোচিত হতে দেখি। নিম্নে 'বিজয়িনী'র অংশবিশেষ উদ্ধৃতি করছি ঃ

"জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ন কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী—
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার, সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে—ছায়াখানি রক্তপদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া।
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়ালো সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল-তরে। পরক্ষণে ভূমি'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"

দেখা যাবে যে সংস্কৃতকাব্যের বর্ণনা প্রথাসিদ্ধ, কিন্তু প্রথাসিদ্ধ হয়েও বর্ণাঢ্য চিত্রাংকনে এবং অলংকার বহুলতায় সুন্দর। কিন্তু সে বর্ণনার সঙ্গে কবি-চিত্তের যেন কোনো সংযোগ নেই। সে যুগের কবিদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সুন্দর চিত্রগুলো কাহিনী-শরীরে বিন্যস্ত হয়ে যেন একটা নির্বিশেষকে প্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কবির সত্তাচেতনার সংকেত আছে, যার ফলে আমরা শুধু মাত্র একটি চিত্রকে পাইনা, আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটি অনুভূতিশীল হৃদয়কে পাই, আত্ম-নিমগ্নতাকে পাই, একটি সুকুমার মাধুর্যকে পাই।

সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে রবীন্দ্রকাব্যে তৎসম শব্দ বিশেষ তাৎপর্যে এবং প্রবলভাবে উপস্থিত। তৎসম শব্দের ধ্বনি-বৈচিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সর্বসময়ে সচেতন ছিলেন, যে সচেতনতা কবিতার গতিমাত্রা গণনার ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আমি এখানে "চিত্রা" কাব্য-গ্রন্থের 'আবেদন' কবিতাটির একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি শুধু এ-কথা প্রমাণ করবার জন্য যে তৎসম শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি ঋজু সচলতা ছিলো। কোথাও অনবধানের চিহ্ন নেই, নির্বাচিত শব্দগুলো ধ্বনির তাৎপর্যময় সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যে একটি মাধুর্যমণ্ডিত চিত্রপট উন্মোচন করছে--

"অকাজের কাজ যত
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যূষে অরুণোদয়ে, শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জন, সে বনবীথিকা
রাখিছি নবীন করি। পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ উষায়
বিকশি উঠিবে তব পরশতৃষায়
পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে। সন্ধ্যাকালে
যে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি, আমি নিজ করে
রচি সে বিচিত্র মাল্য সান্ধ্য যূথীস্তরে,
সাজায়ে সুবর্ণ-পাত্রে তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি অবনতমুখে—
যেথায় নিভৃত কক্ষে ঘন কেশপাশ
তিমিরনির্ঝরসম উন্মুক্ত-উচছাস
তরঙ্গকুটিল এলাইয়া পৃষ্ঠপরে,
কনকমুকুর অঙ্কে, শুভ্রপদ্মাকরে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসীকূলে
বসিবে যখন সপ্তপর্ণতরুমূলে
মালতী-দোলায়—পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন,
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনা-বিভোল
নিশ্বাসের প্রায়, মৃদু ছন্দে দিব দোল
মৃদুমন্দ সমীরের মতো। অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে শয্যাশিরোদেশে

সারা সুপ্তনিশি সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গপানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি—সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।
শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব, রানী
বসন বাসন্তী রঙে। পাদপীঠখানি
নব ভাবে নব রূপে শুভ-আলিম্পনে
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা। নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।"

বাংলা শব্দের মধ্যে ধ্বনির অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। এই ধ্বনির অভাব যে সুরের সাহায্যে দূর করা হয়ে থাকে তাও তিনি জানতেন। অর্থাৎ কথায় যে অভাব ছিল সুরে তা পূর্ণ হতো। গানের ক্ষেত্রে এটা কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেনা, তার কারণ গানে এক কথা বারবার আবৃত্তি করলে ক্ষতি হয়না। সুরের রসাবেশ সৃষ্টি করে চিত্তকে জাগরিত করা গানের লক্ষ্য। সুতরাং পুনরাবৃত্তি করা সেখানে দোষের নয়। সে জন্য দেখা যায় সমগ্র বাংলা কাব্যের মধ্যযুগের সমস্ত কবিতাই মূলতঃ গান। সংস্কৃত কাব্যে অবস্থাটা এর বিপরীত। বেদের সামগানের কথা ছেড়ে দিলে সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য রচিত হয়েছে, কিন্তু গান খুব বেশী রচিত হয়নি। কালিদাস তাঁর "শকুন্তলা" কাব্যে দুই একটি প্রাকৃত গান দিয়েছেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর একমাত্র কারণ হল সংস্কৃত কাব্যে শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনি-গৌরবে পরিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ "মেঘদূতের" কথা বলা যেতে পারে। "মেঘদূত" কাব্যকে গানের সুরে সাজানোর দরকার করেনি। তার কারণ এই কাব্যের ভাষালালিত্য এবং ছন্দ-বিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তা সুরের অপেক্ষা রাখেনা। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন বলেই বাংলা কবিতায় তৎসম শব্দ প্রয়োগে তাঁর যথেষ্ট নিপুণতা আমরা লক্ষ্য করি। তৎসম শব্দের ব্যবহারের মধ্যে যে সুগভীর সামঞ্জস্যের পরিচয় তিনি দিয়েছেন এবং যে সংস্থানসমাবেশের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। এই সামঞ্জস্যের তিনি বিধান করেছেন

বাংলা শব্দের ধ্বনিপ্রকৃতির এবং স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃত শব্দ একটি নতুন পরিণতি লাভ করেছে। কালিদাস, বানভট্ট বা ভবভূতির স্বস্ব ভবনে সংস্কৃত স্বতন্ত্র, সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাদের আতিথ্য পেয়েছেন কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠা করেননি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃতের একটি নতুন পরিণতি ঘটেছে নতুন সৃষ্টিতে। যে সৃষ্টি প্রাণবান ও গতিবান। সংস্কৃতের সঙ্গে প্রণয় রেখেও বন্ধন বিচ্ছিন্ন করেছে বলেই বাংলা ভাষার সৃষ্টির কার্য নব নব অধ্যবসায়ে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

৫

বাংলা কবিতায় প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রকৃতি বিপুল এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের ভাষার সর্বকালের কাব্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রকৃতির উপর নির্ভরতা কবিদের খুব বেশী। তাঁরা যে প্রকৃতির শুধু মাত্র বর্ণনা দিয়েছেন তাই নয়, প্রকৃতির সঙ্গে জীবন কে সম্পর্কিত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে প্রকৃতির কোনো উপাদান থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন নয়। বরঞ্চ এই উপাদানগুলোর সহযোগেই সকল বর্ণনা যেন প্রাণ-চাঞ্চল্যে স্পন্দিত হয়ে উঠে, ঘটনা এবং বস্তুকে যেন সজীবতা দেয় এবং সচলতা দেয়। প্রাচীন চর্যাপদের যুগে লক্ষ্য করেছি, মানুষ ভূমি, নদী, বৃক্ষলতা এবং নিসর্গের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বাস করেছে। রূপকের মাধ্যমে কবিগণ যতই নিগূঢ়তম ধর্মতত্ত্বকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে থাকুন না কেন, যেহেতু সেই রূপকের বিন্যাসের সম্বল ছিল প্রকৃতি, সেই কারণে তত্ত্বকে উপেক্ষা করেও শুধু মাত্র প্রকৃতি-নির্ভরতার কারণে কবিতাগুলো মনোময় এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে" এবং সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে নারীর প্রণয়লিপ্সার বিভিন্ন প্রকাশকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষের মান-অভিমান, বিরহ-বেদনা, আক্ষেপ অভিসার এ সমস্ত কিছুকে পরিণত রূপে প্রকাশ করবার জন্য কবিরা প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ-লতা এসেছে, নদী এসেছে, নির্জন বনভূমি এসেছে, পুষ্পসম্ভার এসেছে, মেঘ এসেছে এবং বৃষ্টি রূপে তার বর্ষণ এসেছে। কবির প্রতিপাদ্য ছিল প্রেম, অভিপ্রায়, বেদনা অথবা আনন্দ কিন্তু এগুলো প্রকাশ করতে যেয়ে তিনি বারবার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। সেই প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগের সময় যা সত্য ছিল রবীন্দ্রনাথের কালেও তা সত্য রয়েছে, বরঞ্চ বলা যায় অধিকতর সত্য হয়েছে।

আমাদের কবিতায় প্রকৃতিকে অতিরিক্ত রূপে ব্যবহারের কারণ সম্ভবত এই যে আমাদের অধিকাংশের জীবন ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং গ্রামের সঙ্গে নিবিড়তম ঐক্যবন্ধনে যুক্ত। আমাদের জীবনধারায় নগরের প্রভাব গ্রামের প্রভাবের চেয়ে কম। আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে এবং ভূমি কর্ষণ করে জীবন ধারণ করে। সুতরাং ঋতু-বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘটে—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, সকল ঋতুই তাদেরকে স্পর্শ করে যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যন্ত্রের শাসন এবং প্রতাপ যতটা প্রবল, আমাদের জীবনে ততটা নয়। ইউরোপে দেখি যন্ত্রের প্রভাব সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত। সে দেশের মানুষ যন্ত্রের শাসনের মধ্যে বাস করে। সেখানকার কবিরা উপমা-রূপক সংগ্রহ করেন সেই সমস্ত ঘটনা এবং বস্তু থেকে যা তাদের আধুনিক সমাজকে সঞ্জীবিত করেছে এবং উদ্দীপ্ত করেছে। তাই তাদের কবিতায় কর্মরত মানুষ প্রবলভাবে প্রতীয়মান হয়। এমন কি কবি "ওয়ার্ডসওয়ার্থ" যখন ইংল্যাণ্ডের প্রকৃতির কোনো বর্ণনা দিতে যাচ্ছেন তখন তাঁকে রাত্রিকালের সুসুপ্ত নগরীর বর্ণনা দিতে হয়েছে। কেননা দিবাভাগে সে সব নগরীতে কোলাহল থাকে, যন্ত্রের ধোঁয়ার কুয়াশা থাকে এবং মানুষের সংঘর্ষ তখন বড় প্রবল ভাবে প্রকাশিত। তাই কবিকে শান্তি এবং স্বস্তির সন্ধান করতে যেয়ে সুষুপ্ত নগরীর ঐকতানকে গ্রহণ করতে হয়েছে। এছাড়া "ওয়ার্ডসওয়ার্থ" যে কর্ম-জীবনের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কবিতায়, সে কর্মজীবন শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে। মনে হয় কবি সর্ব প্রকার কর্ম-কোলাহল থেকে বাঁচবার প্রয়াসী হয়ে ইংল্যাণ্ডের ক্রমমুমূর্ষু এবং মলিন গ্রামকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের কবিদের জন্য এই আত্মগোপন এবং শান্তির অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন করেনি। কেননা প্রকৃতির অর্ঘ্য আমাদের এত প্রচুর যে প্রকৃতিকে অতিক্রম করাই আমাদের এখানে কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা এই প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবহার আবিষ্কার করি। মূলতঃ গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটার ফলেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই জমিদারী পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারী সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। পাবনা, রাজশাহী এবং নদীয়ার

বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এই জমিদারীগুলো ছড়ান ছিল। জমিদারীর দায়িত্বভার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে গ্রামে গেলেন। বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাচারী ছিল শিলাইদহে। জমিদারী পরিচালনার জন্য শিলাইদহ ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান কর্ম-ক্ষেত্র। এখান থেকেই তিনি পাবনার শাহজাদ-পুর এবং রাজশাহীর কালিগ্রামে নদীপথে যাতায়াত করতেন। শিলাই-দহের কাচারী ঘর ছিল একেবারে পদ্মা নদীর পারে। সেখানে পদ্মা নামের প্রসিদ্ধ বোট বাঁধা থাকতো। রবীন্দ্রনাথ এই বোটে করে কুষ্টিয়া, কুমারখালী, শাহজাদপুর, পাতিসর এবং অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত করতেন। এভাবে নদীপথে বোটে করে খাল বিল নদী বেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রকৃতির বিচিত্র শোভা নিরীক্ষণ করে-ছিলেন। এ সব শোভা তার দৃষ্টিকে আপ্লুত করেছিল এবং তাঁর হৃদয়কে উদ্বোধিত করেছিল। তিনি এক কথায় বলতে গেলে প্রকৃতির বিচিত্র স্বভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিতার চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর এই প্রথম জীবনের প্রকৃতিকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। একেবারে শেষের দিকের একটি কবিতায় তিনি জী নের পদক্ষেপকে যে চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন সে চিত্রকল্প প্রকৃতির কাছ থেকে নেয়া—

"নদীর পালিত এই জীবন আমার।
নানা গিরিশিখরের দান
নাড়ীতে নাড়ীতে তার বহে,
নানা পলিমাটি দিয়ে ক্ষেত্র তার হয়েছে রচিত,
প্রাণের রহস্যরস নানা দিক হতে
শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার।
পূর্বপশ্চিমের নানা গীতস্রোতজালে
ঘেরা তার স্বপ্ন জাগরণ।
যে নদী বিশ্বের দূতী
দূরকে নিকটে আনে,
অজানার অভ্যর্থনা নিয়ে আসে ঘরের দুয়ারে,
সে আমার রচেছিল জন্মদিন—
চিরদিন তার স্রোতে

বাঁধন-বাহিরে মোর চলমান বাসা
ভেসে চলে তীর হতে তীরে।
আমি ব্রাত্য, আমি পথচারী,
অবারিত আতিথে্যর অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি।"

দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে অবলম্বন করে জীবন সম্পর্কে তাঁর একটি বিশিষ্ট বোধকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। এ বিশিষ্ট বোধকে আমরা তত্ত্বচিন্তা বলতে পারি কিন্তু এই তত্ত্বচিন্তা তত্ত্ব-রূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত নয়। বরঞ্চ কবি-হৃদয়ের সচেতন উপলব্ধি হিসাবে প্রমাণিত; প্রকৃতির উপমা না এলে সম্ভবতঃ কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হতে পারতনা। অন্য একটি কবিতার কথা বলা যাক। যেমন "বলাকা" কাব্যগ্রন্থের 'চঞ্চলা' কবিতাটি। 'চঞ্চলা' কবিতাটিতে গতির একটি উপলব্ধি ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ নদীর চিত্রকল্পের মাধ্যমে সে উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছেন। যে নদীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনে প্রত্যহ দেখেছেন এবং যে নদীর অবিরাম স্রোতোধারা তাঁকে বিহ্বল করেছে এই কবিতায় সেই নদী প্রধান চিত্রকল্প রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো, তিনি তাঁর চিত্তের বিভিন্ন বোধের চিত্রকল্প নির্মাণের সকল অবস্থাতেই প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। কখনও কখনও প্রকৃতির স্থায়ী সম্পদ বা ভৌগোলিক সত্তাকে ব্যবহার করেছেন, যেমন নদী, পাহাড়, প্রান্তর, সমুদ্র ইত্যাদিকে ব্যবহার করেছেন। আবার কখনও ভূমি থেকে উদ্‌গত বৃক্ষ, তৃণলতা ইত্যাদিকে ব্যবহার করেছেন। আবার কখনও কখনও প্রকৃতির ক্রিয়াকাণ্ডকে ব্যবহার করেছেন। যেমন বাতাস, রৌদ্র, ঝড় ইত্যাদি। মানুষ হিসাবে আমাদের সকল প্রকার অনুভূতির চিত্ররূপ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সাহায্যে নির্মাণ করেছেন। এ-সমস্ত চিত্রকল্পের আবেদন কখনও আমাদের শ্রুতির কাছে, কখনও আমাদের দৃষ্টির কাছে, কখনও আমাদের স্পর্শের কাছে, কখনও আমাদের গন্ধ-চেতনার কাছে আবার কখনও অলক্ষ্য অনুভূতিকে প্রকাশ করার কাছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এতো বিচিত্রভাবে মানুষের অনুভূতি কবিতায় ব্যক্ত হয়নি তেমনি আবার প্রকৃতির ব্যবহারও এতো সুক্ষ্মভাবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ করেননি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা

কাব্যে প্রকৃতি ছিল মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা অথবা উপকরণের মতো। মানুষের দৃশ্যমান অবস্থাকে প্রকাশ করবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে অথবা কখনও কখনও কোনো বিশেষ মানসিক অবস্থার প্রতিরূপ হিসাবে প্রকৃতিকে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতি যত নিগূঢ়ভাবে কবির মানস-চৈতন্যকে প্রকাশ করেছে ততটা অতীতে কখনও করেনি। তাই বলা যায় যে রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতির ব্যবহারটি অভিনব। রবীন্দ্রনাথের সকল বোধ প্রকাশের অবলম্বন ছিল প্রকৃতি। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিকে প্রকৃতির সত্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই রবীন্দ্রনাথ যে মানস-চৈতন্যের সকল অনুভূতিকে প্রকাশ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় "চিত্রা" কাব্যগ্রন্থে। "চিত্রা" কাব্যে 'চিত্রা' নামাংকিত উন্মোচনী কবিতাটিতে অলৌকিক সৌন্দর্যকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে তিনি আমাদের দৃষ্টির সামনে অথবা বলা যায় আমাদের অনুভূতির প্রকোষ্ঠে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। কবিতা-টিতে কবি বলছেন, অজস্র আলোকচ্ছটা নীল আকাশকে উজ্জ্বল করেছে, যে আকুলতা এবং পুলকিত হিল্লোল পুষ্প-কাননে প্রদর্শিত সেই আলোক এবং উল্লাসের মধ্যে অলৌকিক সৌন্দর্য বিচরণ করছে, কবি সেই সৌন্দর্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চান। চিত্তের মধ্যে এই সৌন্দর্যের স্থিতিকেও কবি প্রকৃতির কাছ থেকে উপমা নিয়ে অভিব্যক্ত করেছেন। যেমন যে সৌন্দর্য অন্তরের মধ্যে উদ্ভাসিত সে সৌন্দর্য যেন হৃদয়বৃন্তের মধ্যে একটি পদ্ম অথবা চিত্ত-গগনে একটি চন্দ্র। আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্র-নাথ নীল আকাশ, ভূমিতে উদ্‌গত পুষ্পকুঞ্জ, একটি বিকশিত পদ্ম এবং রাত্রিকালে আকাশের চাঁদ—এগুলোকে ব্যবহার করেছেন অলৌকিক সৌন্দর্য-প্রভাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য। "চিত্রার" 'সুখ' কবিতাটিতে চিত্তের প্রসন্নতা অথবা আনন্দকে প্রকৃতির প্রসন্নতার উপর নির্ভরশীল করেছেন। যে দিবস মেঘ-মুক্ত সে দিবসে আকাশকে আমরা প্রসন্ন দেখি। চতুর্দিকে যে বাতাস প্রবাহিত হয় তা শরীরে স্নিগ্ধতার স্পর্শ আনে। ধীর কল্লোলে নদী প্রবাহিত হয়। নদী-তীরে ঘন ছায়াপূর্ণ বৃক্ষগুল্মকে দেখা যায় এবং নদীর মুকুরে আকাশের নীলের ছায়া পড়ে, কখনও কখনও আমের মুকুলের গন্ধ ভেসে আসে এবং বৃক্ষশাখে বিহঙ্গকুলের কলগুঞ্জন শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রসন্নতার এই পটভূমি নির্মাণ করে 'সুখ' কবিতাটির ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। বলছেন, সুখ অত্যন্ত সহজ এবং সরল। যদি কোনো বস্তুর সঙ্গে তাকে তুলনা করতে হয় তাহলে বনভূমির প্রস্ফুটিত ফুলের সঙ্গে তাকে তুলনা করতে হবে। এই কবিতাটিতে আমরা দেখছি, রবীন্দ্রনাথের নির্ভরতা পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি-পাত করে এবং প্রকৃতিকে অনুভব করে তিনি সুখের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটিতে প্রেমের যে অমরাবতীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন সে অমরাবতী নির্মিত হয়েছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে। সেখানে অরণ্য-ভূমিতে দময়ন্তী নলের সঙ্গে অপরাহ্ণে ভ্রমণ করেন, বিকশিত পুষ্প-বীথিতলে শকুন্তলা বসে থাকেন। পুরুরবা আপন দয়িতার সন্ধানে বনে বনে ঘুরে বেড়ান এবং তপস্বিনী মহাশ্বেতাও মহারণ্যে বীণা হাতে নিয়ে রাগিনী নির্মাণ করেন। গিরিতটে শীলাতলে মহাদেব এবং পার্বতী একে অন্যকে অবলোকন করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ প্রেমের সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য ব্যাখ্যা করতে যেয়ে একমাত্র প্রকৃতি থেকেই সমস্ত উপমা-রূপক এবং চিত্রকল্প গ্রহণ করেছেন। "চিত্রা" অবশ্য তাঁর প্রথম দিককার রচনা। যখন তিনি বাংলাদেশের নদীপথে জমিদারী দেখবার ইচ্ছায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তখন তাঁর সর্বমুহূর্ত আচ্ছন্ন করেছিল পল্লীগ্রামের শান্ত নির্জনতা, নদী তীরবর্তী ঘন বৃক্ষপুঞ্জ, উদার আকাশ এবং নদীর জলোচ্ছ্বাস ও স্রোতধারা। "চিত্রা"র কবিতাগুলো রচনার কালে এই প্রসন্ন আচ্ছন্নতা থেকে কবির মুহূর্তের জন্য মুক্তি ঘটেনি। তাই এখানকার সবকটি কবিতাতেই প্রকৃতির উপর কবির একমাত্র নির্ভরতা লক্ষ্য করি। কিন্তু অবাক হতে হয় যখন অনেক পরে "পূরবী" কাব্যগ্রন্থ আমরা পাঠ করি। সেখানে 'মাটির ডাক' বলে একটি কবিতা আছে। কবিতাটিতে স্পষ্ট ভাষায় কবি বলছেন, যখন তাঁর শৈশব ছিল তখন কচি পাতার কলকথায় তিনি আকুল হতেন এবং তিনি ভাবতেন প্রকৃতিতে অর্থাৎ লতা-পাতায় যে সাড়া তোলে সেই সাড়ায় যথার্থ হৃদয় আছে, তাকে আবিষ্কার করতে হবে। যৌবনে চতুর্দিকের সবুজ কবিকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে-ছিল এবং তিনি ভেবেছিলেন সবুজের নিমন্ত্রণে তাঁর একটি অধিকার আছে। তার পরে জীবনের অনেক কাল কেটেছে, অনেক অবস্থার মধ্য

দিয়ে কবি অগ্রসর হয়েছেন। এখন যখন ক্লান্ত দিনের শেষ প্রান্তে কবি দাঁড়িয়ে তখনও কবির মনে হয় যে প্রকৃতিই একমাত্র সত্য তাঁর জীবনে। মাঠের ঘাসে ঘাসে ঋতু-বৈচিত্রের মধ্যে পথ-তরুর ছায়ায় তিনি জীবনের সজীবতার সন্ধান পান। তাই তাঁর কাছে সব চেয়ে মূল্যবান হচ্ছে গ্রাম এবং গ্রামের প্রকৃতির অগাধ ঐশ্বর্য। শহরকে কবির কাছে মনে হয় একটি নির্মম উদাসীন নির্বাসন। এভাবেই দেখা যায়, কবি কত প্রবল ভাবে প্রকৃতির স্পর্শে সঞ্জীবিত ছিলেন। "সেঁজুতি"তে কবি বলছেন, যখন তিনি আর এই পৃথিবীতে থাকবেন না তখন তাঁকে স্মরণ করবার এক মাত্র উপায় হচ্ছে চৈত্র মাসের শাল-বন বীথিকায় উপস্থিত হওয়া। সেখান-কার ঘন সবুজের বর্ণ-বিন্যাস, মৃত্তিকায় শান্ত অন্ধকার ছায়া এবং সব কিছু মিলে যে প্রশান্তি সে প্রশান্তিকে যদি কেউ উপলব্ধি করতে পারে তবে সে রবীন্দ্রনাথকেও উপলব্ধি করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের এই যে বিশ্বাস অর্থাৎ প্রকৃতির শান্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে কবিকে আবিষ্কার করা যায় তার অর্থ এই যে প্রকৃতি অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান এবং সৌন্দর্যের একটি মহার্ঘ শৃংখলার মধ্যে সে পৃথিবীকে আলোকিত এবং তাৎপর্যময় করে রেখেছে এবং সে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেনা। তাই মানুষের সৃষ্টির রূঢ়তার আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া। আমাদের বিবেচনায় ভাল হোক বা মন্দ হোক কিন্তু এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। আমরা জানি যে এই বিশ্বাসের কারণেই কর্ম-চঞ্চল নাগরিক জীবনকে গ্রাহ্য না করে তিনি সজীব এবং উদার প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন, যার ফলে রবীন্দ্রনাথের সকল স্বভাবের কবিতা-তেই প্রকৃতি উপস্থিত হয়েছে—চিত্রকল্পে, গভীর অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে, দর্শন, শ্রবণ এবং স্পর্শের শিহরণকে বহন করবার জন্য এবং কবি-চিত্তের নিগূঢ়তম অনুভূতিকে ব্যক্ত করবার চেষ্টায়।

এখন বিচার করতে বসলে মনে হয়, "চিত্রা" গ্রন্থে প্রকৃতির ব্যবহার একটি বিশেষ প্রথাসিদ্ধ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ একই স্বভাবের প্রকৃতিকে উপমা-রূপক হিসেবে অনবরত ব্যবহার করেছেন এবং এই ব্যবহারের মধ্যে কোনো বিশেষের পরিস্ফুটন নেই। কিন্তু একটি নির্বিশেষ শান্ত পরি-মণ্ডলের নির্মিতি আছে। দেখা যাবে, তিনি কোথাও স্পষ্টভাবে কোনো একটি বিশেষ গাছ অথবা কোনো একটি গাছের শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-

পুষ্প অথবা ভূমিতে আশ্রিত লতাগুল্ম অথবা কোনো বিশেষ পুষ্পিত বৃক্ষের বর্ণ-বিন্যাস আমাদের সামনে উপস্থিত করেননি। তিনি সামগ্রিক-ভাবে প্রকৃতিকে একটি একক হিসাবে পরিকল্পনা করেছেন যার ফলে কোথাও বিশিষ্ট দ্যোতনায় কোনো চিত্রকল্প জাগ্রত হয়নি। সর্বত্রই আমরা একটি সাধারণ পর্যায়ে প্রকৃতিকে আবিষ্কার করি। আজকের দিনে একথা সত্য হলেও রবীন্দ্রনাথ যখন "চিত্রা" কাব্য রচনা করেছিলেন তখনকার বাংলা কাব্যে প্রকৃতির বিশিষ্টার্থক ব্যবহার ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক কবি-স্বভাবের একটি মিল ছিল এবং কাব্য রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক ভাবাবহে অংশত প্রভাবিত হয়েছিলেন যার ফলে "চিত্রা"র বিভিন্ন কবিতায় আমরা কবিকে এক একটি অবস্থার পটভূমি নির্মাণ করতে দেখি—কোথাও সুখের পটভূমি নির্মাণ করেছেন, কোথাও নির্জনতার পটভূমি নির্মাণ করেছেন, কোথাও স্বর্গের পটভূমি নির্মাণ করেছেন। এ-রকম বিচিত্র পটভূমি নির্মাণ কাজে কবি ব্যস্ত ছিলেন "চিত্রা"র যুগে। কবি শেলী যেমন তাঁর বিভিন্ন কবিতায় এক একটি ইচ্ছা অথবা অবস্থার পটভূমি নির্মাণ করেছিলেন প্রকৃতির সাহায্যে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি প্রকৃতির সাহায্যে বিভিন্ন অবস্থার পটভূমি নির্মাণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শেলীর Alastor ও Epipsychidion-এর উল্লেখ করা যায়। "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থেও আমরা প্রকৃতির বহুল প্রয়োগ দেখি। সেখানেও প্রকৃতি পটভূমি নির্মাণে নিযুক্ত। যেমন ধরা যাক 'সোনার তরী' কবিতাটি। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ তত্ত্ব উপস্থিত করতে চেয়েছেন। তত্ত্বটি হচ্ছে মানব-জীবনের কার্যক্রম এবং তার সফলতার তত্ত্ব। পৃথিবীতে আমরা যা কিছু করি তা পৃথিবীর কর্ম-ধারায় প্রবাহিত থাকে। কিন্তু যাদের দ্বারা এই সমস্ত কর্ম সাধিত হয় তাঁরা কিন্তু পৃথিবীতে থাকেননা এবং তাঁদের স্মৃতিও খুব যে অধিক দিন জাগ্রত থাকে তা নয়। এই তত্ত্বটা রবীন্দ্রনাথ বর্ষার নদী, পসরা বোঝাই নৌকো, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এ-সমস্ত বর্ণনার প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন। এখানে প্রকৃতি একটি বিশেষ প্রয়োজন সাধন করেছে। প্রয়োজনটি হচ্ছে, কবির বক্তব্যকে একটি স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা দান করা। এভাবে 'পরশ পাথর' কবিতাটি বিচার করা যায়। সেই কবিতাটিও তত্ত্বমূলক এবং সেখানেও তত্ত্বটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত

হয়ে। রবীন্দ্রনাথ নির্জন সমুদ্র-তীর, সমুদ্রের তীরভূমির বালুকারাশ এবং বালুকাবেলায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডের বিচিত্র কল্লোলের মাধ্যমে পরশ পাথরের সত্যকে আমাদের কাছে গ্রাহ্য করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে "চিত্রা"তে প্রকৃতির ব্যবহার যে রকম "সোনার তরী"তে অবিকল সেরকম নয়। চিত্রায় মূলতঃ সৌন্দর্য-চেতনা একটি বিশেষ প্রশান্তির প্রকরণ নিয়ে উপস্থিত ছিলো। কিন্তু "সোনার তরী"তে জীবন সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা জাগছে। তাই এখানে প্রকৃতির ব্যবহার "চিত্রা" থেকে বিশিষ্ট এবং ভিন্নতর। তবে সর্বত্রই কিন্তু সকল ক্ষেত্রে একটি সর্বকালীন চৈতন্যকে রূপ দেবার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের প্রবল ছিল। তাই এই কবিতাগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন চিত্তদাহ, আগ্রহ ও বেদনা, আনন্দ ও নির্জনতা, কোনো কিছুর পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগ-স্বভাবকে প্রকাশ করেননি। অবশ্য বলা যায় যে যুগ-স্বভাবকে প্রকাশ না করলেও যুগের কাব্যকলাকে অনুসরণ করেছেন এবং তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যে অর্থে মাইকেল মধুসূধন দত্ত তাঁর "মেঘনাদবধ কাব্য" বা "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে তাঁর যুগের তৃষ্ণা, অভিপ্রায়, সংঘর্ষ ও মনোবেদনা পরিস্ফুট করেছেন, "চিত্রা" ও "সোনার তরী"তে রবীন্দ্রনাথ তা ঠিক করেননি, কেননা সে সময় রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসই ছিল বাংলা কবিতার নির্মাণ-পদ্ধতিকে সংশোধন করা এবং শব্দ ব্যবহারকে মার্জিত করা এবং ছন্দকে নতুন তরঙ্গে হিল্লোলিত করা। "মানসী" কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। "চিত্রা" ও "সোনার তরী"তে এ প্রয়াস বিশেষ সফলতায় রূপলাভ করে। আমরা এই কবিতাগুলোর ছন্দ, শব্দ-বিন্যাস, ধ্বনি-প্রবাহ যদি পরীক্ষা করি তাহলে দেখবো, প্রতিটি কবিতায় কবি কুশলী শিল্পী হিসাবে উপস্থিত। প্রকৃতিকে তিনি ব্যবহার করেছেন সেই বিশেষ কুশলতার উপকরণ হিসেবে। আজকের দিনের বিচারে মনে হয় প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিলো। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রকৃতির দৃশ্যমান রূপই দেখেছেন। কিন্তু তাদের ভৌগোলিক বা উদ্ভিদগত তাৎপর্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। যার ফলে এই কাব্যগ্রন্থ দুটিতে কোনো বিশেষ গাছকেও পাইনা, কোনো বিশেষ ফুলকেও পাইনা, অথবা পাহাড় নদী সমুদ্রকেও বিশেষ রূপে উদ্ভাসিত হতে দেখিনা। মনে হয় এ-সমস্ত কিছু কবির চেতনায় সমগ্র

প্রকৃতির প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত। এর ফলে এই ব্যবহারের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই সীমাবদ্ধতা এসেছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সীমাবদ্ধতা এড়ানো সম্ভবপর ছিলনা।

"চিত্রা"র যে কোনো একটি কবিতা বিশ্লেষণ করলে সীমাবদ্ধতা ধরা পড়বে। 'আবেদন' কবিতাটিতে প্রকৃতির ব্যবহার একটি কাব্যগত স্বতঃসিদ্ধ প্রথায় বর্ণিত হয়েছে, যদিও প্রথাটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। কবি এ কবিতায় নির্জন তীরের কথা বলছেন, উচচ গিরিশিখর, রঞ্জিত মেঘ, শ্যামল ছায়া, পুলকিত তৃণপুঞ্জতল, কুমুদ সরসীকুল এবং কৌতূহলী চন্দ্রমার কথা বলছেন। এ সমস্ত কথায় প্রকৃতির কোনো বিশিষ্টতা পরিস্ফুট হয়না। কবি একটি শান্ত নিবেদনকে উপস্থিত করবার জন্য নিবেদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ হয় এমন কতকগুলো কথা বলছেন, যার ফলে প্রকৃতি তার নিজের স্বভাবে উপস্থিত হয়নি, কতকগুলো আরোপিত গুণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তেমনি "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাটিতে আমরা দুটি বিপরীত পটভূমি লক্ষ্য করি। একটি হচেছ স্বর্গের নিশ্চিন্ত অনন্তকালীন শোভা ও সৌন্দর্য, অন্য-দিকে পৃথিবীর মমতায় আচছন্ন শান্ত প্রকৃতির আশ্রয়। এ কবিতাটিতে গ্রাম এবং পরিবেশের বর্ণনা একটি প্রতীকের পর্যায়ে নেমেছে। এখানে প্রকৃতি কোনো বিশিষ্ট প্রকৃতি নয়, এখানে তা শান্তি, মমতা এবং নিঃশব্দ-তার পটভূমি। রবীন্দ্রনাথ এখানে নীল গিরিশিখরের উপর শুভ্র হিম রেখার কথা বলছেন, তরুশ্রেণীর মধ্যে নিঃশব্দে অরুণোদয়ের কথা বল-ছেন। আর বলছেন শূন্য নদীপ্রান্তে অবনতমুখী সন্ধ্যার কথা। এখানেও প্রকৃতি তার বিশেষ রূপে উদ্ভাসিত নয়, কতকগুলো আরোপিত তাৎপর্যকে বহন করে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। 'বিজয়িনী' কবিতাটি আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। সেখানেও কবি স্নানরতা যৌবনবতী রমণীর জন্য একটি শান্ত প্রফুল্লিত এবং নিঃশব্দ পটভূমি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ কবির বক্তব্যকে উপস্থাপনার জন্য একটি পরিমণ্ডল নির্মিত হয়েছে যে পরিমণ্ডলে ঘন বনের মধ্যে মধ্যাহ্নের জ্যোতি মূর্ছিত হয়ে পড়ে, আলো-ছায়া ভূমিতে খেলা করে, ছায়া এবং রৌদ্র উভয়ে মিলে অরণ্যের শান্তি নির্মাণ করে এবং কখনও কখনও বাতাসে বনফুলের গন্ধ প্রবাহিত হয়। শুধুমাত্র প্রথম দিককার কাব্যগ্রন্থগুলোতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতিকে এ ভাবে ব্যবহার করেছেন তাই নয়, শেষের দিককার অনেক রচনাতেও

প্রকৃতির সেই একই ব্যবহার আমরা নতুন করে লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ কোথাও প্রকৃতির নিজস্ব স্বভাব অথবা গুণাবলী আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেননি। অথবা বলা যায় তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃতি যে ভাবে প্রতিভাত হয়েছে সেই রূপকেই তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব যে একটা সত্তা আছে যা তার বর্ণ-বৈচিত্রে, রেখায় এবং বিভিন্ন স্বভাবে ধরা পড়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সেগুলোকে পরিস্ফুট করেননি।

প্রকৃতির উপর মানব স্বভাবের গুণাবলী আরোপ করা যায়। আবার প্রকৃতির গুণাবলী মানুষের উপর আরোপ করা যায়। এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কবি যখন বলেন 'বিষণ্ন নদীতীর' তখন মানব চিত্তের বিষণ্নতা নদীতীরের উপর আরোপ করেন। এভাবে 'উদার আকাশ,' 'ভ্রূকুটি-কুটিল তরঙ্গ,' 'নদীর কল্লোল-ক্রন্দন,' এসব কিছুই প্রকৃতির উপর মানব স্বভাবের প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব-স্বভাবকে এভাবে প্রকৃতির উপর আরোপ করেছেন। প্রকৃতিকে আবার ভিন্ন রূপেও উপস্থিত করা যায়। অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতির বিশেষ পরিচয়-লিপি মানুষের উপর আরোপ করে মানুষকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন শেকস-পীয়র শীতের পাতা-ঝরা গাছের সঙ্গে একজন বয়স্ক ব্যক্তির তুলনা করেছেন। তিনি তাঁর একটি সনেটে বলছেন, "যে ঋতু তুমি আমার মধ্যে দেখ সে ঋতুর নাম শীত"। রবীন্দ্রনাথ, আমরা পূর্বেই দেখেছি, নির্বিশেষকে উপস্থিত করবার জন্য সর্ব মুহূর্তে আগ্রহান্বিত ছিলেন। যার ফলে ইংরেজীতে যাকে বলে generalization, সেই জেনারেলাইজেশনের পরিচয় তাঁর কবিতায় সবচেয়ে বেশী। "চিত্রা"তেও যেমন দেখেছি, তেমনি "পূরবী" কাব্যগ্রন্থে আমরা প্রকৃতির এই প্রয়োগ লক্ষ্য করি। অর্থাৎ আরোপিত গুণাবলী নিয়ে প্রকৃতি উপস্থিত। তার কারণ প্রকৃতি পটভূমি নির্মাণ করেছে। ধরা যাক 'লীলা-সঙ্গিনী' কবিতাটি। এক সময়কার বসন্তের উদ্দামতা এবং আকুলতাকে প্রকাশ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'চৈত্র-হাওয়ায় উতলা-কুঞ্জের' কথা বলছেন, 'বকুল গন্ধে বসন্তের স্মৃতি-লিপির' কথা বলছেন এবং 'বায়ুস্রোতে অতীতের পরিমল প্রবাহের' কথা বলছেন। প্রকৃতির সাহায্যে তিনি মানুষকে চিহ্নিত করেননি। মানুষের পরিচয়-লিপির জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন স্বভাবের চিত্র অংকন করেছেন।

শেকসপীয়র তাঁর সনেটগুলোতে প্রকৃতির সত্তাকে মানব-সত্তায় রূপান্তরিত করেছেন। অর্থাৎ মানুষের পরিচয়লিপি অাঁকতে যেয়ে তিনি প্রকৃতির গুণাবলী তার উপর আরোপ করেছেন। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। ৭৩ নং সনেটে প্রেমিক প্রেমিকাকে সম্বোধন করে বলছে—

"বছরের যে ঋতুতে তুমি আমাকে সমাবৃত দেখ সেই ঋতু হচ্ছে শীত ঋতু। যখন গাছের পাতায় দুই একটি পীত পত্র ঝুলে থাকে এবং শূন্যে শাখাগুলো ঠাণ্ডা বাতাসে দোলে। এভাবে তুমি আমার মধ্যে গোধূলিকালকে আবিষ্কার কর।"

কবি এই সনেটে অপস্রিয়মান যৌবন-শেষে শরীরে যখন বার্ধক্যের জীর্ণতার আভাস দেখা যাচ্ছে, সেই জীর্ণতার আভাসকে শীত-ঋতুর সঙ্গে তুলনা করে অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতির সত্তা মানবসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। কবির উদ্দেশ্য এখানে মানব সত্তাকে পরিচিত করান এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে তিনি প্রকৃতির সত্তাকে মানবের উপর আরোপিত করে মানব-সত্তার তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেছেন। ঠিক একই উপমা ২ নং সনেটে শেকসপীয়র ব্যবহার করেছেন। সেখানে নায়িকাকে লক্ষ্য করে নায়ক-পুরুষ বলছেন, "যখন চল্লিশটি শীত-ঋতু তোমার ভ্রূযুগলকে আচ্ছন্ন করবে এবং তোমার দেহের সৌন্দর্য-প্রান্তরে গভীর রেখা টানবে, তখন যদি জিজ্ঞাসিত হও যে তোমার সৌন্দর্য কোথায় ছিল, তখন সলজ্জ কাতরতায় এ কথা কি বলবেনা যে তোমার চোখের গভীরে একদিন সৌন্দর্যের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল?" ৬ নং সনেটেও শীত-ঋতুর কথা আবার এসেছে। সেখানে নায়ক বলছেন, শীতের কর্কশ হাত তোমার যৌবনের গ্রীষ্মকালকে যেন অপরিচ্ছন্ন না করে। আরো উদাহরণ শেকস্‌পীয়র থেকে উপস্থিত করা যায় কিন্তু আমাদের আলোচনার পক্ষে এ কটিই যথেষ্ট।

একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার, য়ুরোপীয় কাব্যে উপমা হিসাবে শীত-ঋতু যত প্রবলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা কাব্যে সেভাবে হয়নি। তার কারণ সে দেশের এবং আমাদের দেশের ঋতু বৈচিত্রের তারতম্য। ইউরোপে শীত-ঋতু বড় বেশী লক্ষ্যগোচর, কেননা তখন চতুর্দিকের সবুজ হারিয়ে যায় এবং বড় বড় গাছ তাদের সব পাতা ফেলে দিয়ে শূন্য শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং শীত ঋতু মানুষের নিঃস্বতা,

সহায়হীনতা, বার্ধক্য এবং একাকীত্বের প্রতীক হয়ে কবিতায় বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও হয়। ওদেশে যখন আবার বসন্তকাল আসে তখন চতুর্দিকে সবুজের অপূর্ব সমারোহ দেখা দেয়। নানা পুষ্প সম্ভারে বনভূমি আলোকিত হয় এবং চতুর্দিকে একটি আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়। সে কারণে শীতের পরে যখন সবুজ আসে তখন সবুজও তাদের চোখে বেশী স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সে দেশের কবিতায় তাই সবুজের বর্ণনা যখন আসে তখন তা খুব ঘনিষ্ঠভাবে আসে। অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে তা উদ্ভাসিত হয়। যেমন ধরা যাক কবি "ইয়েট্‌স্‌" এর Innisfree হ্রদ নামক কবিতাটির কথা। সে কবিতাটিতে কবি যে একটি শান্ত নির্জন সবুজের অবস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন তা একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। সেখানে ঘরের ছাদ বেয়ে সীম গাছ, সবুজ গুল্ম এবং তার বিন্যাসের বৈচিত্র একটি অপূর্ব মনোজ্ঞ নয়নাভিরাম দৃশ্যের উন্মোচন ঘটায়। কবি তাঁর বর্ণনার কুশলতায় একটি বিশেষ স্থানকে আমাদের পরিচয়ের ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলে নিয়ে আসেন। আমরা প্রায় দেখবো যে পাশ্চাত্য কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা যখনই আসে তখন বিশিষ্ট রূপে তা আসে। একটি গাছের শাখা, পাতা, ফুল, ফল তাদের রেখা বৈচিত্র এবং বর্ণচিত্র নিয়ে আমাদের দৃশ্যগোচর হয় এবং আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে। তাদের জীবনে সবুজকে তারা অল্পকালের জন্য পায় বলে সবুজকেও পুংখানুপুংখভাবে তারা জানে এবং বৃক্ষলতার সকল স্বভাবকে তারা যথার্থ-ভাবে উপস্থিত করতে প্রয়াসী হয়। আমাদের দেশের অবস্থাটি এর বিপরীত। আমাদের দেশে শীত নেই বললেও হয়। সবুজ আমাদের চোখে সব সময় পড়ে। এর ফলে গাছের ছায়া আমাদের সর্বকালীন সম্পদ, তেমনি চতু-র্দিকে সবুজের বন্যাও আমাদের সর্বকালীন সম্পদ। তাই এগুলোকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করি, এদের গভীরে প্রবেশ করবার প্রয়োজন পড়েনা। তাই আমাদের কবি বিষণ্ন বৃক্ষছায়ার কথা বলেন, প্রসন্ন পুষ্পিত কাননের কথা বলেন। এগুলো সাধারণ কথা, বিশিষ্ট কোনো কথা নয়।

শেলীর কবিতাতেও আমরা প্রকৃতির গুণাবলী মানুষের উপর আরোপ করবার একটা চেষ্টা দেখতে পাই। যেমন Episychidion-এ কবি তাঁর প্রার্থিত নায়িকার বর্ণনা এ ভাবে করছেন—

"এ সঙ্গীত তোমার গোলাপ। এর পাপড়িগুলো মলিন এবং মৃত কিন্তু একটা কোমল শান্ত গন্ধ এখনও তাতে ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া তোমার বুকে বিঁধবে এমন কোনও কাঁটাও এ ফুলে নেই।"

অন্য একটা উদাহরণ—

"একটি অলৌকিক দীপ্তি তার সর্ব শরীরে কম্পমান যেন কুয়াশার মেঘ ভেদ করে উজ্জ্বল আকাশ প্রকাশিত।"

উভয় ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কবি তাঁর নায়িকার চিত্র দৃশ্যগোচর করাবার জন্য প্রকৃতির কাছ থেকে উপমারূপক সংগ্রহ করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃতির কোনো বিস্তৃত প্রয়োগ নেই, কিন্তু একটি বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ আছে। Adonais-এ আমরা দেখতে পাই শেলী বলছেন—

"উষা তার কেশগুচ্ছ উন্মোচন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে ভূমিকে অলংকৃত করেছে।" এখানে অবশ্য মানবীয় গুণাবলী প্রকৃতির উপর আরোপ করা হয়েছে।

আবার প্রকৃতির উপর মানবীয় গুণাবলী আরোপ করার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেলীর সাদৃশ্য আছে। মানুষের স্বভাব, কল্পনা, চিন্তা, ইচ্ছা, আচরণ প্রকৃতির উপর আরোপ করে প্রকৃতিকে কল্পনায় সমৃদ্ধ এবং অলৌকিক মাধুর্যে মহিমান্বিত করবার চেষ্টা শেলী করেছিলেন। যেমন Epsychidion-এ তিনি enchanted mountains এর কথা বলেছেন, enamoured air এর কথা বলেছেন এবং বলেছেন plumes of fire এর কথা। তিনি একটি কাল্পনিক সমুদ্রতট-প্রান্তে তাঁর নায়িকাকে আবিষ্কার করেছেন। সেখানকার দৃশ্যাবলীকে ব্যাখ্যা করবার জন্য এ-সমস্ত বিশেষণ এবং উপমা কবিকে ব্যবহার করতে হয়েছে। আমরা দেখতে পাব, রবীন্দ্রনাথের 'বিমুগ্ধ প্রান্তর', 'ছায়া সুনিবিড় গ্রাম', ইত্যাদি বিশেষণে বিশোভত প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় শেলীর বর্ণনার খুবই কাছাকাছি। প্রকৃতির উপর মানব গুণাবলী আরোপের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শেলীর নিকটবর্তী এই কারণে, শেলী যে অর্থে একটি আদর্শ পরিমণ্ডল নির্মাণ করবার জন্য প্রকৃতিকে বিশেষ রূপে আবিষ্কার করবার কথা ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর মানস-সুন্দরীকে, জীবন-দেবতাকে অথবা অলৌকিক সৌন্দর্যকে আবিষ্কারের জন্য আরোপিত বিশেষ বিশেষ স্বভাবে অলংকত করে প্রকৃতিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা ছিল অন্তর্মানসকে শব্দে উপস্থিত করা অথবা বলা যায় কবির অন্তরতম সত্তাকে শব্দের মধ্যে প্রবাহমান করা। এই চেষ্টা করতে যেয়েই কবি রবীন্দ্রনাথ যতটা গুরুত্বারোপ করেছেন মর্ম-বস্তুর উপর, ততটা গুরুত্বারোপ করেননি প্রকৃতির যে উপমার সাহায্যে অথবা বর্ণনার সাহায্যে মর্মবস্তুকে প্রকাশিত করেছেন তার উপর। কথাটা আরো একটু স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের চিত্তের গভীরে যে বাসনা ছিল কবি তার প্রবর্তনা-রূপে তাকে সক্রিয় করবার জন্য ছন্দকে এনেছেন, শব্দকে নির্বাচন করেছেন এবং বিবিধ প্রকার উপমা-রূপকের সাহায্য নিয়েছেন এবং এ-সব ক্ষেত্রে প্রকৃতি তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এদিক থেকে শেলীর কবি-প্রেরণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রেরণার একটি সাদৃশ্য আছে। শেলী যেমন তাঁর Ep'sych'dion কাব্যে একটি সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা খুঁজেছেন যে সৌন্দর্য হচ্ছে কবির অন্তর্মানসজাত এবং যে সৌন্দর্যকে চিত্তের গভীরে তিনি উপলব্ধি করেছেন। এই সৌন্দর্যকে প্রকাশ করবার জন্য তিনি বহির্জাগতিক অনেক সম্ভার এনেছেন এবং এই সমস্ত সম্ভার উপাদান রূপে সৌন্দর্যের বিভিন্ন চিত্র নির্মাণ করেছে। অর্থাৎ কবির উদ্দেশ্য ছিল একটি অলৌকিক সৌন্দর্যের সত্তাকে প্রকাশ করা, প্রকৃতি সেই প্রকাশের ক্ষেত্রে কবির সহায়ক হযেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক চিত্রগুলো বিশেষ প্রথাবদ্ধ সাধারণ চিত্রে বর্ণিত হয়েছে, প্রকৃতির নিজস্ব বিশিষ্টতাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। এটাকে এভাবে বলা যায় যে, জাগতিক বস্তু কবি-চেতনার প্রতীক হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, জাগতিক বস্তুর দিকে কবির প্রধান লক্ষ্য কখনও ছিলনা। "সোনার তরী"র 'মানস-সুন্দরী' কবিতাটি উদাহরণ-স্বরূপ উপস্থিত করা যায়। এই কবিতাতে মর্মবস্তু হচ্ছে মানস-সুন্দরী-রূপিণী কবির যে প্রেরণা অথবা যে সৌন্দর্য কবি-চিত্তে একটি উপলব্ধি নির্মাণ করছে সেই অন্তর্চেতনাকে উপস্থিত করা। কিন্তু এই অন্তর্চেতনাকে কবি উপস্থিত করছেন প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে। যেমন মুগ্ধ প্রাণে একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে কবি এবং তাঁর প্রেয়সী শান্ত ও স্তব্ধভাবে বসে আছেন। তখনকার অবস্থাকে কবি দুটি চিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করছেন, চিত্র দুটি প্রকৃতির। একটি হচ্ছে শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেহকে প্রসারিত করে সায়াহ্ন-আলোকে যে পদ্মা জেগে আছে সেই পদ্মার উপমা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে, সন্তর্পণে নদীতীরে সন্ধ্যার পদার্পণের

স্নিগ্ধ রূপকল্প। যে পরিমণ্ডল কবি নির্মাণ করতে চেয়েছেন সে পরিমণ্ডলের জন্য এ-দুটি চিত্র খুবই প্রয়োজন ছিল। তেমনি আবার এ কবিতাটিতে শেষের দিকে কবি নির্জনতাকে এবং প্রশান্তিকে সর্বত্র প্রবাহিত করে পৃথিবীর বুকে যে রাত্রি নেমে এসেছে সেই রাত্রির বিবরণ দিয়েছেন:

"রজনী গভীর হল, দীপ নিবে আসে;
পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম আকাশে
কখন যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখা
মিলাইয়া গেছে; সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে; শেষ ঘট পূর্ণ করে
কখন বালিকা-বধূ চলে গেছে ঘরে;
হেরি কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, একাদশী তিথি,
দীর্ঘপথ, শূন্যক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী;
কখন গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মাঠপারে কৃষিপল্লী হতে; নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটিরে
কখন জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যাদীপখানি,
কখন নিবিয়া গেছে—কিছুই না জানি।"

এই কবিতায় কবির উদ্দেশ্য কিন্তু সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে রাত্রি আসছে, এই বর্ণনা উপস্থিত করা নয়. কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি বিশেষ মানসিক বস্তুকে পরিদৃশ্যমান করা। তিনি একান্তে একটি নির্জনতার মধ্যে নিজেকে ক্রমশ আবিষ্কার করছেন। এই আবিষ্কারের মধ্যে কবির সমস্ত সত্তা নিহিত এবং এই আবিষ্কারের প্রবর্তনার জন্য অথবা বলা যায় কবির নিভৃত-লোক বা অন্তর্মানসকে আলোড়িত করবার জন্য এই বর্ণনার তিনি প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। বর্ণনাটি বহির্জাগতিক কিন্তু অন্তর্মানসকে জাগ্রত করবার জন্য এই বহির্জাগতিক বর্ণনার প্রয়োজন ছিল। তাহলে বলা যায় যে কবি মানব-চিত্তের বিভিন্ন অবস্থার বিকল্প হিসাবে প্রকৃতির চিত্তকে উন্মোচন এবং তার মাধ্যমে মানব-চিত্তের বিভিন্ন অবস্থাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। এই কৌশল ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক যগে শেলী, কীটস্

এঁরা সকলেই করেছিলেন এবং সেই একই ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী-সংস্করণের "চৈতালী" কাব্যের ভূমিকায় প্রকৃতির ব্যবহার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন, সে মন্তব্যের মূল কথা হচ্ছে তিনি চতুর্দিকে যে সমস্ত দৃশ্য দেখছেন সে দৃশ্যের কোন কোনটি তাঁর কাছে অভাবিত মনে হয়েছে এবং সেই অভাবিত দৃশ্যের খণ্ড খণ্ড অংশ "চৈতালী" কাব্যে উপস্থিত করেছেন। পদ্মা নদীতে বোটে করে যখন তিনি ভ্রমণ করছেন তখন চতুর্দিকের দৃশ্যাবলী তাঁর চোখে পড়েছিল। প্রকৃতির সেই বহির্দৃশ্যগুলো কবির মনে যে ছাপ রেখেছিলো তার ছায়া "চৈতালী" কাব্যে ঘটেছে এবং তিনি সেই সমস্ত দেখার স্মৃতিকে নিরলংকৃত ভাষায় "চৈতালী"তে প্রকাশ করেছেন। দুটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে। একটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ নদীপথে যাত্রায় নদী তীরবর্তী যে সমস্ত শোভা দেখেছেন সেই শোভাগুলোর বহিরঙ্গকে খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপে উপস্থিত করবার প্রয়াস করেছেন কাব্যে। দ্বিতীয় হচ্ছে বহির্জাগতিক সমস্ত দৃশ্যাবলী স্মৃতিনির্ভর হয়ে কবিতায় রূপলাভ করেছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি বিশেষ ধরনের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে একান্ত হয়েছিল, যেখানে কোলাহল ছিলনা কিন্তু শান্ত স্নিগ্ধতা ছিল, যে প্রকৃতিকে দেখে মানুষের মনে বিশ্রামের কথা জাগে। "চৈতালী"র কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে একটি বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন যে বক্তব্য হচ্ছে নির্জনতা এবং শান্ত শ্রীর বক্তব্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠিক প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করলেন না, করবার তাঁর প্রয়োজনও করল না, কেননা তিনি একটি মুড বা আবহকে উপস্থিত করতে চাচ্ছিলেন যে মুড হচ্ছে একটি নির্মল শান্তির এবং প্রসন্ন নির্জনতার। যেমন ধরা যাক 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটি। কবিতাটিতে কবি দুপুরের একটি সুষুপ্ত অবস্থার পরিচয় অংকন করেছেন। অনেকগুলো চিত্র আছে এখানে, খণ্ড খণ্ড চিত্র। একের পর এক দৃশ্যপট উন্মোচিত হচ্ছে এবং সব কটি দৃশ্যমূলে একটা পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধতার পরিচিতি লিপিবদ্ধ হচ্ছে। প্রকৃতি এখানে মূল লক্ষ্য নয়। প্রকৃতিকে অবলম্বন করে মধ্যাহ্নের আবহ নির্মাণই কবির মূল লক্ষ্য ছিল। এ অবস্থাটি কবির অন্তর্লোকের। 'প্রভাত' কবিতাটিতেও আমরা একই আবহের নির্মাণ কৌশল লক্ষ্য করি। সেখানে পরিচ্ছন্ন উষার স্নিগ্ধতা এবং শীতলতাকে কবি

প্রভাতকালের আবহ নির্মাণের জন্য ব্যবহার করেছেন। প্রভাতকালের নীরবতা এবং নির্জনতা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে কবি বলছেন, জলে রাজহাঁসগুলো নামেনি এবং সাদা পাল তুলে নৌকো দূরের পথে যাত্রা করেনি। অর্থাৎ জলের নিস্তরঙ্গতা তখনও বিদ্যমান। সর্ব-কোলাহল বিবর্জিত একটি ঊষালগ্নে কবি নিশ্চিন্ত প্রশস্তিতে মুহূর্ত অতিবাহিত করছেন। এ কবিতায় প্রশান্তির পটভূমিকা সৃষ্টিই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো। আবার "পদ্মা" কবিতায় পদ্মা নদীর সঙ্গে সর্বকালীন একাত্মতা নির্মাণের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো স্মৃতি-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সব চিত্রগুলোই প্রকৃতির জনহীন পদ্মার তটপ্রান্ত, আকাশে একাকী সন্ধ্যাতারা। সন্ধ্যায় রুদ্ধদ্বার গ্রামের কুটির। আমি এখানে স্মৃতির কথা বলেছি। স্মৃতিতে কবি দৃশ্যগুলোকে লালন করেছেন এবং অবশেষে শব্দে তা সমর্পণ করেছেন। গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে স্মৃতিচিত্রগুলো পূর্ণাঙ্গ নয় এবং বিচিত্রও নয়। তিনি একই স্বভাবের কয়েকটি দৃশ্য বারবার উপস্থিত করেছেন। যার ফলে বর্ণনাগুলো এক প্রকার Poetic diction-এ পরিণত হয়েছে। এটা একটা সীমাবদ্ধতা কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তা গ্রাহ্য করতে আমাদের অসুবিধা হয়না, তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালী' কাব্যে বিরাট কিছু করবার প্রত্যাশী ছিলেন না। তিনি অল্প যে কয়টি মুড বা ভাবাবহকে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন সেগুলোর জন্য এই সংক্ষিপ্ত চিত্রগুলোই যথেষ্ট ছিল।

দেখতে পাচ্ছি যে, প্রকৃতিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বিশেষ শব্দের সাহায্যে কিছু নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কিছু বলতে চেয়েছেন এ কথা আমি বলবোনা কেননা কবিতার মধ্য দিয়ে কবি মূলতঃ কিছু বলছেন না, কবিতার মধ্যে শব্দের সাহায্যে কবি কিছু নির্মাণ করেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একটি সংগতিতে পরিপূর্ণ। এই সংগতি অথবা ইংরেজীতে যাকে বলা হয় harmony 'চিত্রা', 'সোনার তরী', 'চৈতালী', 'উৎসর্গ', 'খেয়া', এই সমস্ত কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। শেকস্পীয়র Merchant of Venice নাটকে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধ্যমে বিশ্বজগতের সংগতিপ্রবণতা এবং দুটি প্রেমাকুল চিত্তের পরস্পর নির্ভরতার চিত্র অংকন করেছেন। সেখানে শেকস্পীয়রের মূল বক্তব্য হচ্ছে harmoney বা সুসংগত বিশ্বসুষমা। আমি নিম্নে উদ্ধৃতিটি উপস্থিত করছি:

"How sweet the moonlight sleeps upon this bank!
Here will we sit, and let the sounds of music,
Creep in our ears : soft stillness and the night
Becomc the touches of sweet harmoney.
Sit, Jessica. Look how the floor of heaven
Is thick inlaid with patines of bright gold ;
There's not the smallest orb which thou behold'st
But in his motion like an angel sings,
Still quiring to the young-ey'd cherubims :
Such harmoney is in immortal souls ;
But, whilst this muddy vesture of decay
Doth grossly close it in, we cannot hear it."

শেকস্‌পীয়র সংগতির একটি কাল্পনিক অভিজ্ঞতার চিত্র এখানে নির্মাণ করেছেন। এখানে চাঁদের আলোর বিস্তৃত বর্ণনা নেই, কিন্তু তার মধুরতা ও ঔজ্জ্বল্যের উল্লাস আছে, নদীতীরও স্পষ্ট নেই কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার আশ্রয়ভূমি হিসাবে নদীতীরকে কবি নির্মাণ করেছেন। গাছের পাতার মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো ভূমিতে এসে পড়েছে। তারও সূক্ষ্ম বর্ণনা নেই কিন্তু তার স্বর্ণকান্তি শোভার উল্লেখ আছে। এভাবে কবি একটি সৌন্দর্যের পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। কবির মূল লক্ষ্য ছিল সৌন্দর্যকে উপস্থিত করা এবং একটি সুশৃঙখল আনন্দলোককে নির্মাণ করা, কেননা এই সুশৃঙখল আনন্দলোকে প্রেমের আশ্লেষ যত মধুরভাবে প্রকাশিত হবে অন্য কোনোভাবে তা প্রকাশিত হতে পারবেনা। শুধু মাত্র এই বিবেচনায় একটি কাল্পনিক মোহময় স্বপ্নগত তন্ময়তাকে শেকস্‌-পীয়র প্রেমের পটভূমি হিসাবে নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই রোমাণ্টিক কারু-কর্মের প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথও শৃঙখলায় বিশ্বাসী ছিলেন, সংগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং একটি প্রশান্ত স্থিরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। "উৎসর্গের" ১৫ সংখ্যক কবিতায় তিনি পৃথি-বীতে মত্ততা এবং ঘূর্ণিপাকের কথা বলে বলছেন যে, বিরাট ঘূর্ণির মধ্যে শুধু একটি বিন্দু চিরকাল স্থির অচঞ্চল রয়েছে :

"হে প্রেম, হে ধ্রুবসুন্দর,
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর।
দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত,
ঝরে নির্ঝর কলভাষে,
অসীমের চির-চরম শান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে।"

যে দৃশ্যগুলো সকল সময়ের জন্য একই অর্থাৎ যে সব দৃশ্য কল্পনা করে নির্মাণ করতে হয়না অথবা স্মৃতি থেকে নির্বাচিত করে উপস্থিত করতে হয়না, 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'উৎসর্গ', এ-সব কাব্যে এগুলোর প্রয়োগই বেশী। 'গোধূলীর শুভ লগ্ন', 'পশ্চিমের অস্তমান সূর্য', 'একাকিনী সন্ধ্যাতারা', 'নিস্তব্ধ গ্রাম', অথবা 'নির্জন তীরভূমি' এগুলো বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের পট উন্মোচিত করেনা। পল্লীগ্রামে এ-গুলো সব সময়ের জন্য সত্য। আবেগগত শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ একটি অন্তর্জাগতিক ভাবাবহ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন, তাঁর মানসলোকের অনুভবগুলো এ-সব শব্দগুচ্ছের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যাবে যে সকল ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একটি সুষম সংগতিতে cosmic harmony তে বিশ্বাসী ছিলেন। কবিতার মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে কবি বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একটি মৌলিক সংগতিতে সংরক্ষিত। বিভিন্ন কবিতায় কবি এই সংগতির সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। নিম্নে দুটি কবিতা উদ্ধৃত করছি, যেখানে এই সংগতি বা শৃংখলার রূপাভিষেক ঘটেছে ঃ

১. ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

২. তোমার বীণায় কত তার আছে
কত না সুরে,

আমি তার সাথে আমার তারটি
দিব গো জুড়ে।
তারপর হতে প্রভাতে সাঁঝে
তব বিচিত্র রাগিনী মাঝে,
আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া
বাজিবে তবে।
তোমার সুরেতে আমার পরাণ
জড়ায়ে রবে।
তোমার তারায় মোর আশাদীপ
রাখিব জ্বালি,
তোমার কুসুমে আমার বাসনা
দিব গো ঢালি।
তারপর হতে নিশিথে প্রাতে,
তব বিচিত্র শোভার সাথে,
আমারো হৃদয় জ্বালিবে ফুটিবে,
দুলিবে সুখে—
মোর পরাণের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে।

এই মৌলিক সংগতি, শৃংখলা বা সৌষম্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-ধারায় প্রবাহিত। "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থে 'বোধন' কবিতাটিতে আমরা দেখি যে কবি নির্দয় নব যৌবনের ভাঙনের কথা বললেও মূলতঃ সে ভাঙনটা হচ্ছে একটি আনন্দের নতুন পট উন্মোচনের মতো। নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে কথাটি স্পষ্ট হবে :

"বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়' ;—
কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,

থর থর করি উঠুক পরাণ
প্রান্তরে পর্বতে।

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়,—
করো ত্বরা, করো ত্বরা।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগলভ রক্তিমরাগে,
মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে,
মধুপের মনোহরা।''

প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিকগণ পরিমিতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সুশৃংখলা ও সমস্ত ঘটনার অথবা বিষয়ের সুসংগত পরিমাণে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী একটি সংগতিপূর্ণ স্থান যেখানে একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য একটি বস্তুর সম্পর্ক আছে, যে সম্পর্কের ফলে প্রতিটি বস্তুই আপন নির্ভরতা-চক্রে মূল সংগতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আবর্তিত হয়। তখন তারা গুরুত্ব দিতেন যা যথাযথ তাই করার উপর। যদি কেউ এই যথাযথ-তাকে স্বীকার না করে পরিমাপের বাইরে চলে যেতেন অথবা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেন তাহলে তাঁরা মহা পাপী হতেন। গ্রীকরা এই পাপের নামকরণ করেছিল hubris বলে। যে ব্যক্তি আত্মম্ভরী অথবা নিজের উপর একমাত্র বিশ্বাসী সে সমস্ত শৃংখলাকে পদদলিত করে নিজের জন্য সর্বনাশকে টেনে আনে। এই শৃংখলার স্খলনজনিত পাপের শাস্তি বহু কাব্য ও নাটকে দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই রকম একটি শৃংখলায় বিশ্বাসের পরিচয় পেয়েছি। প্রকৃতিকে তিনি ব্যবহার করেছেন এই শৃংখলা বা সংগতির শোভমানতাকে পরিদৃশ্যমান করবার জন্য। ''মহুয়া''র 'দায়মোচন' কবিতায় কবি বলছেন—

''প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাবনা ফাঁকি
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি তাই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড়ো সেই নয়।)

চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।''

এখানে আমরা দেখি যে কবি একটি পরিমিতিতে বিশ্বাস করতেন, ঘটনা বা বস্তুর সুসংগত পরিমাণে বিশ্বাস করতেন, সকল অবস্থার শৃংখলিত সীমাবদ্ধতায় বিশ্বাস করতেন এবং সর্বোপরি একটি শান্তি ও নিশ্চিন্ততাকে কামনা করতেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিলো যে, রূঢ়তার স্পর্শে, স্বপ্নভঙ্গের বিভ্রান্তিতে অশান্তির আশঙ্কায়, সুসঙ্গত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু মুহূর্তের জন্যও চঞ্চল হয়না। তাই দেখি ''মহুয়া'' কাব্যগ্রন্থের 'পরিচয়' কবিতায় কবি দুর্যোগের কথা বলেছেন যে দুর্যোগের দুর্বাসার ক্রোধ বিচ্ছুরিত হয় অগ্নিকাণ্ডে, কিন্তু কদম্বপুষ্প রৌদ্রের স্বপ্নের রোমাঞ্চ তবুও বহন করতে থাকে। দুর্যোগের মধ্যেও নৈরাশ্যজয়ী একটি পটভূমির কল্পনা কবি করছেন :

'সে-দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী,
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষণ্ন ছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে।'

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট সংগতিতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি, বেদান্তের মূল সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি বিপুল সুশৃংখলাবর্তে পৃথিবী সর্বসময় আবর্তিত, যেখানে প্রতিনিয়ত যাত্রা অন্ধকার থেকে আলোতে এবং অসত্য থেকে সত্যে। উপনিষদের এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কোনো পরীক্ষা করতে হয়নি অথবা কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতে হয়নি। জাতি হিসাবে এইগুলো ছিল তাঁর মজ্জাগত এবং বিশেষ পারিবারিক ঐতিহ্যে এগুলো ছিল তাঁর জীবনের একটি স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্য। এই কারণে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই ঐক্য সম্পর্কে অথবা সংহতি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হতে দেখিনি। যেহেতু কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হচ্ছেনা সুতরাং কোনো উত্তরও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে

নেই। এটা অবশ্য একজন কবির বিরাট সমস্যা হতে পারতো। যেমন হয়েছিল গ্যয়টের। ফাউষ্ট নাটকে গ্যয়টে বিভিন্ন বিপর্যয়, সর্বনাশ, প্রলোভন এবং মহাপাপের চিত্র অঙ্কন করে এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে ভয়াবহ যাত্রার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে অবশেষে মুক্তির সম্ভাবনার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। নাটকের উন্মোচনে স্বর্গোদ্যানে দেবতাদের প্রস্তাবনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলছেন "সমুদ্র থেকে ভূমিতে এবং ভূমি থেকে সমুদ্রে প্রবল ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই ঝঞ্ঝা ভূপৃষ্ঠে একটি আবেষ্টনী নির্মাণ করেছে যে আবেষ্টনী থেকে পৃথিবীর কোনো খণ্ডাংশ মুক্ত নয়। প্রবল বজ্র বিদ্যুৎ খেলা করছে সর্ব মুহূর্তে, তবুও হে ভগবান চতুর্দিকের এই ভয়াবহ আবর্তের মধ্যে তোমার শান্ত যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। পর্বতের গাত্রে সমুদ্রের প্রচণ্ড আঘাত ভয়াবহ রাত্রিতে যে বিপুল শব্দের সৃষ্টি করছে তাতে সবকিছু বিচূর্ণিত হয়ে যেতে পারে মনে হয়, কিন্তু তবুও একটি বিপুল শৃংখলায় পৃথিবী তার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।" দেবতাদের এই প্রস্তাবনার পরে মেফিষ্টোফিলিস বা সদা জাগ্রত অশুভ বুদ্ধি পৃথিবীর শৃংখলা ভাঙবার অধিকার দাবি করলো এবং বলল যে ফাউষ্ট যে বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে তার পদস্খলন সে ঘটাবে। ভগবান বললেন যে তিনি ফাউষ্টের আত্মাকে তার অধিকার এবং মৌলিক উৎস থেকে বিভ্রান্ত করবার সুযোগ তিনি মেফিষ্টোফিলিসকে দিচ্ছেন, কিন্তু এই অধিকার মেফিষ্টোফিলিসকে দিয়ে তিনি শুধু তাকে এই কথা জানাতে চান, যে পথ উপযুক্ত, মানুষ সকল সর্বনাশের শেষে সে পথেও এসে উপস্থিত হয় যদি তার মুক্তি লাভের ইচ্ছা থাকে। এই প্রস্তাবনার পর নাটকটি আরম্ভ হয়েছে। আমরা এ নাটকে মানুষের আত্মার পদস্খলনের ভয়াবহতার চিত্র দেখতে পাই কিন্তু যথেষ্ট বিপর্যয়ে নির্যাতিত মানবাত্মার আকুল কন্ঠস্বরও শুনি এবং অবশেষে তার মুক্তি দেখি। গ্যয়টে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শৃংখলাকে বা কসমিক হারমনিকে প্রমাণ করবার জন্য বিভিন্ন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন এবং অবশেষে মানুষের মুক্তির চিত্র এঁকেছেন। রবীন্দ্র কাব্যে কোথাও এই শৃংখলাকে প্রমাণ করবার জন্য বিশৃংখলা এবং যন্ত্রণার আবর্ত নির্মাণের চেষ্টা নেই। কেননা পূর্বেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে এই শৃংখলা ছিল একটি স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ সংশয়ী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। গ্যয়টেও বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু সংশয়কে নির্মাণ করে তার মধ্য দিয়ে তিনি

বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থের 'যাত্রী' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, পৃথিবীতে আঘাতের অন্ত নেই কিন্তু বিপুল শান্তি তবুও অক্ষুণ্ণ থাকে। চতুর্দিকে তরঙ্গ-বিক্ষোভগত ভাঙা-গড়া কিন্তু অবশেষে একটি পরম শান্তি, পৃথিবীতে বহু ধূলিকণা পথকে মলিন করছে এবং বহু ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করছে কিন্তু এগুলো কখনও চিরস্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী হচ্ছে একটা পরম শান্তি। তাই কবির প্রার্থনা—"সে পরম শান্তি মাঝে হোক তব অচঞ্চল স্থিতি।" 'দুর্দিনে' নামক অন্য একটি কবিতায়ও কবি একই কথা অন্য ভঙ্গিতে বলছেন, বলছেন যে পৃথিবীতে কুয়াশা আছে এবং সেখানে আবর্জনার অচল কুঞ্জে যাত্রার পথ রুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু—

"মন মোর কয়, 'এ কিছুই নয়,
মিথ্যে, এসব মিথ্যে,
আপনায় ভুলে গাও প্রাণ খুলে
নাচো নিখিলের নৃত্যে।"

'দুয়ার' কবিতাটিতে সেই একই কথা। সেখানেও বলছেন, যা কিছুই ঘটুক না কেন, যত সর্বনাশই আসুক না কেন, পরম দেবতার ইঙ্গিতে নৈরাশ্য-নিশিথেও মাভৈঃ বাজবে।

যাই হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন আপন চিত্তের অসংশয়কে প্রকাশ করবার জন্য এবং একটি বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটাবার জন্য। তাই তাঁর কাব্যে প্রকৃতির ভয়াবহতার চিত্র নেই বললেও হয়। দুই একটি ক্ষেত্রে বৈশাখের রুদ্র দাহনের কথা বলছেন কিন্তু তা একটি বিরাট শৃংখলার মধ্য দিয়ে দাহন হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। খুব স্পষ্টভাবে এই কথাটি কবি 'আছি' নামক কবিতাটিতেও উপস্থিত করেছেন। সেখানেও তিনি বলছেন, বৈশাখে সব কিছু রুক্ষ, আতপ্ত ধূলি-ম্লান কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবির মন বিরূপ হচ্ছেনা। তার কারণ তিনি সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির খুব কাছাকাছি এসেছেন। একমাত্র বার্তা তাঁর মনে জাগছে যে তিনি সকলের মধ্যে সকলের প্রাণে সকলের সঙ্গে এক হয়ে নেচেছিলেন। এখানেও আমরা দেখি একটি শৃংখলা এবং সুসংগতির কথা।

সংস্কৃত কাব্যে প্রকৃতির যে ব্যবহাব তার মধ্যে গভীর বা জটিল কোনো জীবন-তত্ত্ব নেই। সেখানে প্রকৃতি এসেছে ঐশর্য, আনন্দ এবং উপঢৌকনকে

প্রমাণ করবার জন্য। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো সমস্ত কাব্যটি সবুজ প্রকৃতির উৎসব-শোভায় সজ্জিত। কবি কালিদাস অসাধারণ কুশলতায় ভারতের উত্তরাংশে, বিশেষ করে হিমালয়ের পাদদেশের মেঘের যাত্রা-পথ বর্ণনা করেছেন। মূল বক্তব্য এই কাব্যে এই, নব জলধর দর্শনে মানুষের চিত্তে যে সুখের ইচ্ছা জাগে সে সুখ হচ্ছে প্রিয়জনের সংগে মিলিত হওয়া। বর্ষার বর্ষণকে বিরহের সংগে সমন্বিত করে কবি বলছেন, বিরহীর পক্ষে নিদারুন বর্ষাকাল সহ্য করা একান্ত কঠিন। তাই প্রফুল্ল হৃদয়ে পর্বতজাত সদ্য প্রস্ফুটিত কূটজ-কুসুমের দ্বারা অর্ঘ্য স্থাপন করে প্রীতি-পূর্ণ বক্ষে মেঘকে অনুরোধ জানাতে হয় যেন সে প্রেয়সীর কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়।

এই কাব্যে কবিকল্পনার অসাধারণ লীলাবিলাস আমরা লক্ষ্য করি এবং মানব জীবনের হর্ষ, আকাংখা, কামনা এবং উচছলতার পটভূমি হিসাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করার একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত আমরা পাই। পৃথিবীতে কোনো কাব্যে প্রকৃতির এই উচছল এবং সমৃদ্ধ ব্যবহার আর আমরা পাইনা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মেঘকে লক্ষ্য করে যক্ষ বলছে—"যখন তুমি দশার্ণ নামক জনপদের নিকটবর্তী হবে তখন সেখানকার উপবনের গ্রাম্য চৈত্যবৃক্ষে বিভিন্ন পাখীরা নীড় নির্মাণে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। কেতকি পুষ্প বিকশিত হওয়াতে সেখানকার তপোবন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করবে। আরো দেখবে পরিপক্ক ফলসমূহে শ্যামবর্ণ জম্বুবন দ্বারা সে স্থান সুদৃশ্য হবে। কিছুদিন মরাল-মরালী ঐ স্থানে বাস করে পরে মানস-সরোবরে গমন করবে। এরপর তুমি উপস্থিত হবে বেত্রবতী নদীর তীরদেশে, চঞ্চল তরঙ্গে ঐ জল বিলসিত এবং ভ্রূকুটি সংযুক্ত মুখের ন্যায় প্রিয়দর্শন।" কবি অন্যত্র বলছেন, "হে জলধর উজ্জয়িনী নগর হয়ে গমন করলে যদিও তোমার পথ কিছুটা বাঁকা হবে তবুও সে রাজধানীতে উপস্থিত হওয়া তোমার কর্তব্য, সেখানকার উচচ অট্টালিকার উপর একবার উপবেশন করতে বিমুখ হয়োনা। সেখানকার পুরনারীগণের নয়ন-কটাক্ষ চকিত-চঞ্চল এবং বিদ্যু-তের ন্যায় স্ফুরিত, যদি তুমি সেই কটাক্ষের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুকে বঞ্চিত হও তাহলে তোমার জন্মধারণ নিষ্ফল। উজ্জয়িনী গমনকালে পথিমধ্যে নির্বিন্ধ্যা নাম্নী নদী তোমার নয়ন পথে পড়বে। সে নদীর প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষোভ এবং বিহঙ্গকূল সেই বিক্ষোভের কারণে সেখানে অনবরত কোলাহল

করে। বিহঙ্গের রসনাদামে ঐ নদী অলংকৃত। নদী তোমাকে তার আবর্ত-রূপ নাভি প্রদর্শন করবে।" আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কালিদাস প্রকৃতিকে মানুষের মতো সজীব করেছেন এবং মানুষের স্বভাব তার উপর আরোপ করেছেন। এদিক থেকে কালিদাসের এই কৌশল রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন আমরা বলতে পারি, কেননা কালিদাসের মতো রবীন্দ্রনাথ মানুষের গুণাবলী এবং মানব-চিত্তের বিভিন্ন অবস্থাকে প্রকৃতির উপর আরোপিত করে প্রকৃতিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন।

কালিদাসের "মেঘদূত" কাব্যে প্রকৃতিকে আমরা পাই সমৃদ্ধিশালিনী যৌবনবতী রমণীর মতো যে তার দেহের সর্বপ্রকার শোভাকে এবং আভরণকে পরিদৃশ্যমান করছে, আবার "শকুন্তলা" নাটকে আমরা প্রকৃতিকে পাই মানুষের সঙ্গে একটা নিবিড় আত্মীয়-বন্ধনে আবদ্ধ। "শকুন্তলা"য় যে তপোবনের কথা কবি বলেছেন, সে তপোবনের স্নিগ্ধ প্রশান্তি প্রকাশ করবার জন্য হরিণ-শিশু, নবীন দুর্বাদল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু এবং অন্যবিধ লতা এবং পুষ্পবান বৃক্ষকে মানুষের সঙ্গে একটা মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। শকুন্তলা যে তপোবনে অবস্থান করছেন সেখানকার পরিবেশ হচ্ছে একটা শান্ত, স্নিগ্ধ, হিংসা-রহিত, বিনয় এবং অর্ঘ্যের পরিবেশ। এই পরিবেশকে প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কবি কালিদাস প্রকৃতির একটা বিশেষ স্বরূপকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। "মেঘদূত" কাব্য এবং "শকুন্তলা" নাটক উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃতি এসেছে কাহিনী অথবা ঘটনার পট-ভূমি হিসাবে। "মেঘদূত" কাব্যে মেঘ যখন একজন নায়কের আর্তি এবং কামনা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তখনকার দৃশ্যগুলো সেই কামনা এবং আর্তির সঙ্গে সঙ্গত। তেমনি আবার শকুন্তলা যখন তপোবনে অবস্থান করছেন এবং রাজগৃহে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখনকার প্রকৃতির বর্ণনা তপো-বনের শান্তি এবং স্নিগ্ধতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। আবার আমরা "রঘুবংশ" কাব্যে প্রকৃতিকে উপমা এবং রূপক রূপে ব্যবহৃত হতে দেখি। কালিদাস বিভিন্ন ঘটনা অথবা বিভিন্ন আচরণ অথবা বিভিন্ন অবস্থাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য প্রকৃতি থেকে উপমা-রূপক আহরণ করেছেন। যেমন ধরা যাক রাণী সুদর্শনা যখন গর্ভিণী হয়েছেন তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে কবি বলছেন, তিনি প্রকাশ-উন্মুখ শশাংক-রশ্মির মতো গর্ভ-লক্ষণ ধারণ করলেন। আবার বলছেন তার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হলো, সুতরাং অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ সমস্ত অলঙ্কার ধারণ করতে সমর্থ হলনা এবং তার বদনমণ্ডল লোধ্র-পুষ্পের মতো পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল। প্রভাত-উন্মুখী রজনী যেমন অল্প সংখ্যক নক্ষত্র ও ক্ষীণপ্রভ চন্দ্রে পরিশোভিতা হয়, তিনিও সেইরূপ শোভা ধারণ করলেন। কোথাও প্রকৃতির নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু কবি কালিদাস প্রকৃতিকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন—সৌন্দর্যের, শোভার, অলঙ্কারের এবং যৌবনের। কবি কালিদাসকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য রচনা করেছিলেন অর্থাৎ "কল্পনা", সেখানে প্রকৃতির এই ঐশ্বর্যের এবং শোভার ব্যবহার আমরা পাই।

কালিদাসের কাব্য সম্পর্কে এবং এক কথায় সংস্কৃত কাব্য সম্পর্কে এ কথা বলা যায়, সেই প্রাচীন যুগের কবিরা তাঁদের সমৃদ্ধমান উপভোগকে প্রকাশ করবার জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছিলেন এবং সর্বত্রই সেই উপভোগের কথাটি দৃশ্যগোচরতায় রূপলাভ করেছে। রবীন্দ্রকাব্যে মানুষের যে স্বভাব এবং অনুভূতি প্রকৃতির উপর আরোপ করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেই অর্থে সংস্কৃত কাব্য মানুষের অনুভূতিকে প্রকৃতির উপর আরোপ করা হয়নি, তার কারণ সেখানে ঘটনা এবং অবস্থা বর্ণনাই ছিল বড় কথা কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথের মুড বা চিত্তের ভাবাবহকে প্রকাশ করাই ছিল বড় কথা। কালিদাস যেখানে মানুষের শোভা, সৌন্দর্য এবং বিনয় প্রকাশের ভঙ্গিকে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত করে উপস্থিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাঁর কবির অনুধ্যান, উপলব্ধি, এবং নিভৃত চিন্তাকে প্রকাশ করবার জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি একটি নতুন স্বভাবের ব্যঞ্জনা পেয়েছে যা সংস্কৃত কাব্যে তার জন্য ছিলনা। যে কথা রবীন্দ্রনাথ "নবজাতক' 'কাব্যগ্রন্থের 'শেষ বেলা' কবিতায় লিখেছেন, সে কথা সাধারণভাবে তাঁর সকল কাব্যকর্মের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে। সেখানে বলছেন, অন্তর-বিধাতার সৃষ্টির নির্দেশে তিনি সবকিছু করছেন এবং বাইরে যখন প্রদীপ অন্তরে তখন আলো দেখা যায় এবং অন্তরের আলোর ইশারায় তিনি তাঁর পথ চিনে নেবেন। কবিতা-টিতে কবির একটি ব্যঞ্জনা আছে। 'রূপ-বিরূপ' কবিতায় কবি বলছেন, সমস্ত জীবনব্যাপী তিনি প্রকৃতির বিচিত্র ভাষা পাঠ করবার চেষ্টা করেছেন, কোথাও তা রহস্যঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা, কোথাও তা কুসুমপ্রগলভ বনপথের ভাষা, কোথাও তা প্রাচীন পর্বতের ধ্যানমৌনতার ভাষা। কবির

বক্তব্যে এই যে প্রগলভতা, রহস্য এবং ধ্যানমৌনতার কথা বলা হয়েছে এইগুলো মূলতঃ কবি চিত্তের রহস্য-প্রবণতা, প্রগলভতা এবং ধ্যানমৌনতার অনুভূতি। মনে হয় কবি যেন বিভিন্ন সময় প্রকৃতির কাছে তাঁর বিভিন্ন অনুভূতির সমর্থন সন্ধান করেছেন। "সানাই" কাব্যগ্রন্থের 'জানালায়' কবিতায় কবি নিজের জীবনের অপরাহ্ন-বেলায় পুরাতন কালের একটা সৃষ্টিকে আবিষ্কার করেছেন প্রকৃতির একটা বর্ণনার মাধ্যমে। তিনি বলছেন, বেলা হয়ে এসেছে এবং জানালায় রৌদ্র বাঁকা হয়ে নেমেছে, এলোমেলো বাতাস বইছে আমলকির ডালে এবং গাছের শাখায় নানা রকম পাখীর মিশ্রিত কাকলী শোনা যাচ্ছে। এই দৃশ্যটা দূরের একটা ইতিহাসকে কবির মনে জাগ্রত করছে। এখানেও প্রকৃতি উপাদান মাত্র, প্রকৃতির চর্চাটা এখানে মুখ্য নয়।

৬

একজন কবি তাঁর কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করেন বিচিত্রভাবে ।এ সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হয় কখনও ইতিহাস থেকে, কখনও পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে, কখনও অধীত গ্রন্থরাজি থেকে, কখনও রাজনীতি থেকে, কখনও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনা-বিন্যাস থেকে, কখনও সুনির্মল কল্পনা থেকে এবং ইত্যাকার আরো অনেক ঘটনা বা অবস্থা থেকে। মোট কথা একজন কবিকে উপকরণ সংগ্রহ করতেই হয় এবং এই উপকরণ সংগ্রহের পদ্ধতির দ্বারা একজন কবির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা চলে। আইরিশ কবি ইয়েটস্ উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন আয়াবল্যাণ্ড-এর অতীত ইতিহাস থেকে, আয়ারল্যাণ্ড-এর রাজনৈতিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী থেকে, প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে এবং সামগ্রিকভাবে খৃষ্টান ধর্মবোধ থেকে। দেখা যাচ্ছে যে কবি কোনো অবস্থাতেই তাঁর পরিচিত দৃশ্যাবলী থেকে অথবা ইতিহাস থেকে অথবা কখনও সংগঠন থেকে দূরে যেতে চাননি এবং এই যে উপকরণ কবিতায় এসেছে তা শুধু বক্তব্য হিসাবে আসেনি অর্থাৎ কবিতার মর্ম-বাণী হিসাবে আসেনি, তা এসেছে কবিতার গঠন প্রণালীর পরিবর্তন সাধন করে। ইয়েটস্-এর কবিতায় দেখা যাবে যে যখন তিনি প্রথম জীবনে প্রেমমূলক কবিতা রচনা করেছেন তখন তাঁর শব্দ আনন্দ-উচ্ছল, ধ্বনি-ব্যঞ্জনাময় এবং সেখানে কল্পনার বিচিত্র ব্যবহার আছে। কল্পনার ব্যবহার এই অর্থে যে, বাস্তবে যা বিবেচনায় আসেনা, স্বপ্ন এবং কল্পনায় কবি তাকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, যেমন একটা কবিতায় কবি বলছেন—"যদি আমার কাছে সমস্ত আকাশটি থাকতো মণিমুক্তা-খচিত অপূর্ব দ্যুতিময়, তবে তাকেই তোমার পায়ের তলায় বিছিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি দরিদ্র কবি, আমার একমাত্র সম্বল স্বপ্ন, আমি সেই স্বপ্নকে তোমার পায়ের তলায় বিছিয়ে দিচ্ছি, তুমি স্বপ্নের উপর ধীর পদসঞ্চারে হেঁটে যাও।" অনেক পরে কবি যখন মহাযুদ্ধের ঘটনায় আলোড়িত হলেন তখন তাঁর কবিতার বাণী-

ভঙ্গী অমসৃণ হয়েছে দেখতে পাই। কোনও রকম উপমা নেই রূপক নেই, একটা নিষ্ঠুর প্রকাশ-ভঙ্গীতে কবির বক্তব্য আবর্তিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ কবির মনে যে দাহনের সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ যুদ্ধের উপলক্ষে লেখা তাঁর বিভিন্ন কবিতার ছন্দ এবং শব্দে ধরা পড়েছে দেখতে পাই। ঠিক এভাবেই ইয়েটস্-এর পরবর্তী ইংরেজ কবি টি. এস. ইলিয়ট-এর কাব্যে আমরা ইউরোপের যন্ত্র-শাসন এবং বিজ্ঞানের প্রচণ্ড প্রতাপের পরিচয় পাই। আবার ইউরোপের ইতিহাসকে নতুন করে নির্বাচিত এবং ব্যবহৃত হতে দেখি, আবার কখনও কখনও মুক্তির জন্য ক্যাথলিক বিশ্বাসকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি। দেখা যাচ্ছে যে কবি, যে কোনও কবি, তাঁর সত্তাকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেন এবং এভাবে সত্তাকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়েই একজন কবি তাঁর সময়ে সকল মানুষের চেয়ে অগ্রগামী থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ধর্মবোধকে তাঁর কবিতার উপকরণ করেছেন, বাংলাদেশের পল্লী-প্রকৃতি থেকে তাঁর চিন্তার শান্ত অবলম্বন হিসাবে অনেক উপকরণ গ্রহণ করেছেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে মহাযুদ্ধ ঘটেছিল—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ একজন সক্ষম এবং পূর্ণ সফলকাম কবি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পথ-যাত্রী। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই মহাযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৌশলে বিশেষ পরিবর্তন আনেনি। যে পরিবর্তনটা আমরা ইউরোপের কাব্যে লক্ষ্য করি, সেই পরিবর্তনটা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আসেনি। এর ফলে এই বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগে যে সমসাময়িক ঘটনা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে আলোড়িত করেছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর গদ্য রচনায় কিন্তু কবিতাকে তিনি রেখেছিলেন তাঁর নিভৃতলোকের শান্তি হিসাবে। তাই সেখানে এ সমস্ত পরিবর্তন বিশেষ রূপে কখনও চিহ্নিত হয়নি। আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথ শৈশবে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন সেই পরিবেশ ছিল একটা শান্ত নিভৃত পরিবেশ। সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে এবং সমাজক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং কোলাহল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকালে প্রায় লুপ্ত হয়েছিল বলা যেতে পারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এঁরা উনিশ শতকের প্রবল আবর্তের মধ্যে বসবাস করে একটি

স্থিতিশীল চিন্তা এবং সামাজিক প্রেরণা নির্মাণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই স্থিতিশীল শান্ত পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাই এ কথা বললে অন্যায় হয়না যে কোনও সংঘর্ষের দুর্বিপাকে রবীন্দ্রনাথকে পড়তে হয়নি, কেননা সমাজক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, সকল ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকালে সংঘর্ষের স্মৃতি বিলুপ্তপ্রায়। এছাড়া যে পরিবারে তাঁর জন্ম সেই পরিবারের একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ছিল। সে স্বাতন্ত্র্য ছিল মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা ও জীবজন্তুর স্বাতন্ত্র্যের মতো। এই স্বাতন্ত্র্য আজীবন রবীন্দ্রনাথকে লালন করেছে, যে স্বাতন্ত্র্যের ফলে একটা আভিজাত্য নির্মিত হয়েছিল। এই আভিজাত্যের নিশ্চিন্ত শাসন রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সকলের পোষাক এবং পরিচ্ছদে, গৃহশয্যায়, ধর্মচর্চায়, সংস্কৃতিতে, অনুসরণে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা নির্মাণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই বিশিষ্টতার ঐশ্বর্যে লালিত। এই সব বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া অন্যান্য মানুষের চেয়ে ভিন্নতর, এক কথায় বলতে পারি, অনন্য। সুতরাং যে অর্থে ইয়েট্‌স্ অথবা টি. এস. ইলিয়ট তাঁদের সময়ের শাসনের সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তা নন। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের পরিবারের একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রবাহ ছিল যার সংগে বাইরের পৃথিবীর কোনও সমন্বয় ছিলনা, অথবা এ কথাটা এভাবে বলা যায়, যে বাইরের পৃথিবী তার নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্ররূপে রবীন্দ্রনাথের পরিবারও তার নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এ দুটি প্রবাহ ছিল সমান্তরাল এবং কোথাও একে অন্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়নি। যে যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সে যুগে এই মিশ্রণের অভাবে কোথাও কোনও আর্তনাদ শোনা যায়নি অথবা কোনও বিকলতার সৃষ্টি হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবার স্বতন্ত্ররূপেই শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং সকলের বিনয়-নমস্কারের অধিকারী ছিলেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটি বিশেষ স্বভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে। কোনও দিন তাঁর কবিতা এই আভিজাত্যের নিজস্ব স্রোতোধারা থেকে গণ-কন্ঠের ধারায় মিশ্রিত হতে পারেনি। তাই দেখি যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রচিত "বলাকার" কবিতাগুলো কত নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় রচিত। সে নির্ভাবনার পরিচয় কবিতাগুলোর ছন্দে, শব্দ-ব্যবহারে এবং রূপকল্পে খুবই স্পষ্ট হয়। তিনি মর্তসাগর পাড়ি দেওয়ার কথা বলছেন, একটি অলৌকিক যাত্রার পরিণতি হিসাবে। কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে

তত্বজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ হিসাবে প্রকাশ পেয়েছেন কেননা এখানে তিনি মানব-সমাজের জন্য একটা প্রবোধবাণী উচচারণ করেছেন। এই মানসিক অবস্থাটি রবীন্দ্র-নাথের শিক্ষা এবং চিন্তাধারার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ একটি কেন্দ্রীভূত শান্তি এবং শৃংখলায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত তিনি ছিলেন সকল কোলাহলের বাইরের একটা নিভৃতলোকের অধিবাসী।

বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য শতাব্দী, বিশেষ করে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধ। বাংলা সাহিত্যের সকল দিকেই বিচিত্র কলা-কৌশলের পরীক্ষা এই সময় হয়েছে এবং সাহিত্যের সকল অঞ্চল সংগতরূপে আবিষ্কৃত এবং যথাযথভাবে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের এই সাহিত্যগত দিক অথবা কলা-কৌশলগত আঙ্গিকের দিক আমাদের বিচারের বাইরে রেখেও আমরা এই যুগের সাহিত্য-বিচারে সমসাময়িক ধর্ম-চিন্তা, সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক বিচারের বাইরে থাকতে পারিনা। দেখা যাবে, এই সময়কার প্রতিটি ব্যক্তি সমসাময়িক কোনও না কোনও চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। রাজা রামমোহন রায় সামাজিক জীবনে বিশেষ ধরনের পরিচ্ছন্নতায় বিশ্বাসী ছিলেন, যার পরিচয় পাই তাঁর সতীদাহ নিবারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনায়। ধর্মক্ষেত্রেও তিনি তৎকালান মানুষের বিশ্বাসের নতুন মূল্যায়ন করেছিলেন। বহুদিনের অন্ধ বিশ্বাসের ফলে এবং মুক্ত-বুদ্ধির অভাবে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে কতকগুলো ধর্মীয় অর্থহীন অনড় বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলো থেকে মানুষকে মুক্ত করে তাদেরে যুক্তি-বাদী করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এটাও তাঁর সময়-কার নতুন সামাজিক চেতনার ফল। তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি যুক্তিবাদী ভিত্তিভূমি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য সকল ধর্মের চিন্তা-ধারা থেকে একটি আদর্শগত সাধারণ ঐক্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে-ছিলেন। এর ফলে আমরা খৃষ্টান ধর্মের বিশ্বাস ও আচারের দিক গভীর-ভাবে পরীক্ষিত হতে দেখি, তেমনি আবার হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস ও আচারের দিকও পরীক্ষিত হতে দেখি। এই যে ধর্ম নিয়ে রামমোহনের চিন্তা, এটাও তাঁর সময়কালের চিন্তা, অর্থাৎ যুগের প্রভাবে এই চিন্তাটি রূপলাভ করেছিল। রাজা রামমোহন রায় কোনওরূপ জিজ্ঞাসা ছাড়া প্রচলিত ধর্মরীতিকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রামমোহনের সময়ই এই জিজ্ঞাসার ফলে সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি

হয়েছে এবং মানুষের সামাজিক বিচার এবং বিবেচনার মধ্যে নতুন কৌশল এবং যুক্তি এসেছে। রামমোহনের চিন্তার মধ্যে আমরা আরও আবিষ্কার করি, তিনি তাঁর সময়কার বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করতে চাননি। তিনি ইউরোপের চিন্তাধারার সংগে তাঁর কালের মানুষকে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রমাণ করেছিলেন যে বঙ্গবাসী হিসাবে তিনি পৃথিবীর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নির্জন অঞ্চলের অধিবাসী নন, বরঞ্চ সকলের সঙ্গে, পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত। রামমোহন ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীন চিন্তা-ধারায় তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তেমনি আবার ইংল্যাণ্ডের জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কল্যাণবোধের আদর্শ দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এভাবে পরীক্ষা করে আমরা বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও সময়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারি। তবে এঁরা দুজনই প্রাথমিক বিচারে সমাজ-হিতৈষী এবং পরবর্তী বিচারে সাহিত্য-কর্মী, তাই এঁদের কথা যদি আমরা বাদও দিই, তবুও দেখবো উনিশ শতকের কাব্য-ক্ষেত্রের প্রধান পুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমসাময়িক চিন্তা থেকে নিজেকে আড়াল করেননি। তাঁর "মেঘনাদবধ কাব্যে" যে মানুষের পরিচয় পরিস্ফুট সে মানুষ উনিশ শতকের নব জাগ্রত মানুষ। দুঃখ সহ্য করবার এবং সংগ্রামকে নতুনভাবে পরীক্ষা করবার যে পরিচয় মধুসূদন দিয়ে- ছেন সে পরিচয় উনিশ শতকের পূর্বে আমরা কখনও পাইনি। আমরা এতদিন দেখে এসেছিলাম যে জয় এবং পবাজয় বলে দুটি জিনিষ আছে—জয় হচ্ছে ন্যায়ের, পরাজয় হচ্ছে অন্যায়ের। পাপ এবং পুণ্যের দ্বৈত সত্তার কারণে ন্যায়-অন্যায়ের রূপকল্প গড়ে উঠেছিল এবং তারই পরিণতি হিসাবে জয়-পরাজয়কে মধ্য-যুগের কাব্যে আমরা চিত্রিত হতে দেখেছি। মধুসূদনের কাব্যে এর প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি একটা নতুন বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করলেন। জীবনক্ষেত্রে জয় অথবা পরাজয় একটি সংগ্রামের ফললাভের সাথে সম্পর্কিত নয়। যুযুদ্ধমান দুই পক্ষ সমভাবে সংগ্রাম করে, এদের মধ্যে এক পক্ষের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী, অন্য পক্ষ বাস্তব দৃষ্টিতে পরাজিত হয়, কিন্তু সংগ্রামের দিক থেকে বিচার করতে গেলে উভয়ই সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য তার কারণ উভয়ই নিষ্ঠার সঙ্গে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। "মেঘনাদবধ কাব্যে" আমরা রাবণের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কে চিহ্নিত

হতে দেখি। কিন্তু এই পরাজয়ের ফলে রাবণ আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রকায় হচ্ছেন না, বরঞ্চ এই পরাজয়ের কারণে রাবণের মহত্ত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই যে জয় পরাজয়ের নতুন তাৎপর্য মধুসূদন দিলেন এ তাৎপর্যটা উনিশ শতকে আমাদের কাব্যে প্রথম এল। উনিশ শতকেই প্রথম আমরা জানলাম যে জীবনে সংগ্রাম করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, সংগ্রামে জয়লাভ অথবা পরাজয় একটা সাময়িক ঘটনা মাত্র। স্থায়ী প্রকল্প হচ্ছে সর্বমুহূর্তে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকা। সংগ্রাম সংক্রান্ত এই বোধটি ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক কবিদের মধ্যেও ছিল। শেলী, কীটস্, বায়রন, এঁরা এই রোমান্টিক চৈতন্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কীট্স্ তাঁর 'হাইপেরিয়ন' কাব্যগ্রন্থে এ কথা বলেছেন যে, যে মানুষ সংগ্রাম করে তাঁর মৃত্যু হতে পারে কিন্তু তিনি পৃথিবীর বুকে তাঁর সংগ্রামের চেতনাকে এবং শক্তিকে রেখে যান। সংগ্রামের শক্তি অথবা প্রবৃত্তি, সেগুলো কখনও বিনষ্ট হয়না। পৃথিবীতে নতুন মানুষ আসে, তারা আবার নতুন করে এই চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নতুন শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নতুন বিশ্বাস এবং নতুন অনুভূতি জেগেছিল, তারা জীবনকে নতুন করে বিবেচনা করেছিল। চিরাচরিত অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে তারা যুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়েছিল এবং যুক্তির দ্বারা যা গ্রাহ্য হয়েছে তাকেই তারা লভ্য বলে প্রমাণ করেছে। মধুসূদনের কাব্যে এই চেতনা স্বাভাবিকভাবে এসেছিল, তার কারণ তিনি একটি বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রতিনিধি ছিলেন। এই বিক্ষোভের মধ্য থেকে তাঁকে একটা স্থির সত্তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সকলেই একটা বিক্ষোভের কালে বাস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকালে এই বিক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে। ধর্মক্ষেত্রের বিক্ষোভ অর্থাৎ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সনাতন এবং আধুনিকতার দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে একটি গ্রহণযোগ্য পটভূমি নির্মিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মের এই গ্রহণ-যোগ্য পটভূমি নির্মাণে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করেছিলেন। তাই আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বীকৃত পন্থার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কৃত দেখতে পেলেন এবং এ ক্ষেত্রে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আনুষ্ঠানিক দিক থেকে ব্রাহ্ম ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের দিকটা নেই। তিনি ব্রাহ্ম হিসাবে সাধারণ হিন্দু থেকে

বিযুক্ত একটি গোত্রভুক্ত হননি, তিনি উক্ত সমাজের নেতৃত্বও দেননি অথচ ব্রাহ্মদের যুক্তি এবং বিবেচনাকে অনুসরণ করেই একমাত্র উপনিষদের উপর নির্ভরতা তাঁর চিত্তে জেগেছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই ধর্ম-ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কোলাহল মুক্ত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এমন একটা বিশ্বাসকে নিজের অবলম্বন করেছিলেন যেখানে সনাতন এবং আধুনিকের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। তিনি পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোনো বিবাদ করেননি, তিনি শুধু উপনিষদের উপর তাঁর নির্ভরতাকে জ্ঞাপন করেছিলেন। সুতরাং ধর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেলাম সংশয়মুক্ত একজন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসী পুরুষ হিসাবে। তেমনি আবার তৎকালীন সমাজ-জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের কোনো অসদ্ভাব না থাকার কারণ সাধারণ মানুষের জীবন-স্রোতের মধ্যে তিনি প্রবাহিত ছিলেন না। পূর্বেই বলেছি সাধারণ জীবনধারা থেকে ভিন্নতর একটি অভিজাত জীবন-প্রবাহে তিনি শৈশব ও কৈশোরে লালিত হয়েছিলেন এবং এই অভিজাত জীবনধারার প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো ঈর্ষা বা অশ্রদ্ধা ছিলনা। ঠাকুর পরিবারের প্রতিটি মানুষ মমতার দিক থেকে সকল মানুষের সংগে সম্পর্কিত ছিলেন। গর্ব ও ঔদ্ধত্যে তাঁরা নিজেদেরে বিচ্ছিন্ন করেননি। শুধু মাত্র উচচ সংস্কৃতির প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্নরূপে সমাজে গৃহীত হয়েছিলেন। তাই তৎকালীন সমাজের সঙ্গে তাঁদের কোনো সংঘর্ষ ঘটেনি। এখানেই রবীন্দ্র-নাথের জীবনে একটা প্রশান্তি এবং নিশ্চিন্ততার পটভূমি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অন্তর-বাহির' প্রবন্ধে বলেন যে বাইরে আমরা যে কোলাহল শুনি সে কোলাহল শুধু বাইরের কিন্তু মূলত তাঁর অন্তরে একটি গান আছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি সমুদ্রের কথা বলেছেন। সমুদ্রের নিঃশ্বাসে যা উচ্ছ্বসিত হচ্ছে তা আমাদের কানে শব্দ হিসাবে বাজে কিন্তু তা মূলত সমুদ্রের অন্তরের গান। এটাকে আরো একটু ব্যাখ্যা করে তিনি বলছেন যে বাইরের যে শব্দটিকে আমাদের কোলাহল বলে মনে হচ্ছে এবং অন্তরের যে গান এটা মূলত দুই বৈসাদৃশ্যের যোগ, দুই অনুরূপতার নয়। দুটোই সমন্বিত এবং একত্রিত কিন্তু আমরা দুইয়ের মধ্যে মিল যে কোথায় তা দেখতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় এটা হচ্ছে অনির্বচনীয় মিল, এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য মিল নয়। চোখে যখন স্পন্দনের আঘাত লাগে তখন মনে আলো দেখি, আবার দেহে যখন বস্তুর

স্পর্শ লাগে তখন চিত্তে সৌন্দর্য জাগে। বাইরে অনবরত বিচিত্র ঘটনা আর অন্তরে তরঙ্গিত হচ্ছে সুখ-দুঃখ। বাইরের সমস্ত কিছুর আয়তন আছে তাই তাকে বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু অন্তরের বস্তুটাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেননা তার আয়তন নেই, তা অখণ্ড। বাইরে কত শব্দ, কত গন্ধ স্পর্শ এবং কত মুহূর্তের চিন্তা ও অনুভূতি এবং এগুলোর একটার সঙ্গে অন্যটার মিল নেই, অথচ এ সমস্তের মধ্য দিয়ে একটি জিনিস আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পাচ্ছে। যা আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পেল তা বাইরের রূপের প্রতিরূপ নয়, বরঞ্চ তা বাইরের বৈপরীত্যের দ্বারা ব্যক্ত হচ্ছে। এই যে অন্তরের জিনিস একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশ্বরূপের অন্তরে একটা অপরূপ। এই অপরূপকে প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের চিরকালীন একটি ব্যাকুলতা ছিল। তিনি পৃথিবীকে তাঁর চিত্তের দ্বারা গ্রহণ করতে চেয়েছেন, প্রতিদিনের অভ্যাসের আবরণ মোচন করে অরূপতাকে উদঘাটন করতে চেয়েছেন। এটাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের বিশেষত্ব। এটাকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তির বিশিষ্ট উপলব্ধি বলে বিবেচনা করেছি। অন্তরের অরূপতাকে প্রকাশ করাকেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অন্তরের অরূপতা কি? রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে এই অরূপতার তত্তটি আমরা আবিষ্কার করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, বাইরের পৃথিবীতে যা কিছু ঘটুকনা কেন, আপন কালের সঙ্গে মানুষ যত ভাবেই সম্পর্কিত থাকুকনা কেন, সব কিছুকে অতিক্রম করে যদি সে অন্তরের নিভৃতলোকে প্রবেশ করতে পারে তবেই তার পরিত্রাণ ঘটবে, সেই পরিত্রাণ হচ্ছে যথার্থ-রূপে বন্ধন থেকে মুক্তি এবং আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ সকাল-বেলাকার রাগিণীর কথা উল্লেখ করেছেন। গুণীরা ভৈরোঁ রাগিণীকে সকালবেলার রাগিণী বলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে সকালবেলার নব-জাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়না। এখানে যা শুনতে পাওয়া যায় তা হচ্ছে সকাল-বেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সঙ্গীত। এটা হচ্ছে এক প্রকার নিভৃতলোকের সাধনা। একেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন বাইরের প্রকাশের অন্তরালে একটি অন্তরের গভীরতর প্রকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথের এই অন্তরের প্রকাশ কথাটা সাধারণ কথায় ব্যাখ্যা করা যায়না, কেননা এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের

নিজস্ব একটা উপলব্ধি। আমরা শুধু মাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগত পরিভ্রমণ করে এ কথাই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবীর কোনো প্রকার আলোড়ন রবীন্দ্রনাথকে কখনও বিচলিত করেনি। সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে খুব কম সংখ্যক কবিতাই বাইরের পৃথিবীর কোনো ঘটনা বা সংঘর্ষের পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথের শৈশব কালের বিভিন্ন ঘটনা পরীক্ষা করলে আমরা দেখি যে, তিনি মূলত আচ্ছন্ন হয়েছিলেন প্রকৃতির একটি অনাবিল প্রশান্তির দ্বারা। জীবনস্মৃতির মধ্যে শৈশবের এই প্রশান্তির বিবরণ আছে। সমগ্র জগত থেকে-বিচ্ছিন্ন একটি নির্জন অঞ্চল বালক রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্য নির্মাণ করে নিয়েছিলেন। একটু বড় হয়ে পিতার সঙ্গে গিয়েছিলেন হিমালয়ে। শান্তিনিকেতনে বাসকালে বালক রবীন্দ্রনাথ জীবনে প্রথম ছাড়া পেয়েছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর থেকে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি স্মৃতির সম্পদ-রূপে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর পরের ঘটনাই হচ্ছে হিমালয়-যাত্রা। হিমালয়ে তিনি পেয়েছিলেন শান্তি এবং একটি মধুর নির্জনতা। কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন-প্রত্যূষের এ দুটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির উদার-তার মধ্যে অবস্থিতি, আর একটা হচ্ছে হিমালয়-যাত্রা। এ দুটি প্রভাব এত গভীরভাবে রবীন্দ্রনাথকে আলোড়িত করেছিল যে চিরকাল এই স্মৃতি-কেই তিনি বহন করেছেন। কোনো দিন মুহূর্তের জন্যও অন্তরের নির্জন অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথ হারাননি। কেউ কেউ হিন্দু মেলার কথা উল্লেখ করেন এবং হিন্দু মেলার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চিত্তে পড়েছিল এ কথা বলেন। আমরা দেখতে পাই যে হিন্দু মেলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যেন একটা উৎসবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক। এটাকে আমরা দেশাত্মবোধ অথবা স্বাদেশিকতা আখ্যা দিতে পারিনে। যাঁরা হিন্দু মেলা প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের চিন্তায় দেশপ্রেম হয়ত ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যা ছিল তা হচ্ছে হিন্দু মেলার উচ্ছ্বাস ও উৎসব। বালক রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকে অনুকরণ করে তথাকথিত কয়েকটি স্বদেশী কবিতা রচনা করেছিলেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে হিন্দু মেলার বিশেষ কোন গুরুত্ব

নেই। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যে সমস্ত প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর কার্যকর হয়েছিল তার সর্বপ্রধান হচ্ছে প্রকৃতি, দ্বিতীয় হচ্ছে একটা অভিজাত সংস্কৃতির প্রভাব। এই অভিজাত সংস্কৃতির পরিচয়রূপে আমরা 'ভারতী' ও 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সংগে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা বলতে পারি। তা ছাড়া আহমেদাবাদ এবং বোম্বাই-প্রবাস উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা এবং সতের বৎসর বয়সে বিলেত যাত্রাও অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিলেত থেকে যে চিঠিগুলো তিনি লিখেছিলেন, যা পরে 'ইউরোপ-প্রবাসীব পত্র' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে আমরা একজন যুবকের কৌতূহল-দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হই। এ সমস্ত পত্রের মধ্যে লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের ড্রয়িং রুমের ঘটনা, পরিচিত কয়েকজন বিদেশীর বিবরণ এবং ইংল্যাণ্ডের তৎ-কালীন রাজনীতির কিছু উল্লেখ আছে। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে রবীন্দ্র-নাথ গুরুতরভাবে ইংল্যাণ্ডের সমাজ জীবন, রাজনীতি জীবন অথবা মানুষকে চিনবার সুযোগ পাননি। প্রথম বারের ইউরোপ ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের জীবনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেনি। সে সময়কার ইউরোপের পরিচয় কিছু চিঠিপত্রে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যে এই প্রবাস জীবনটি বিশেষ কোনো নতুনত্ব আনতে পারেনি। যৌবনের যে ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকুল করেছিল এবং কবির চিত্তে চিরকালের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল তা হচ্ছে জমিদারী দর্শন উপলক্ষে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নদী-পথে পরিভ্রমণ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমসাময়িক ঘটনা বা রাজনীতি রবীন্দ্রনাথকে বিব্রত করেনা। রবীন্দ্রনাথের একটি নিরাসক্তি ছিল। এই নিরাসক্তি ছিল সংসারের প্রতি এবং বাইরের পৃথিবীর কর্মকাণ্ডের প্রতি। কবির একমাত্র আসক্তি ছিল প্রকৃতির প্রতি। প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশক্তি তাঁকে একটি বিশেষ স্বভাবে বিমণ্ডিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের অথবা বলা যায় কৈশোর-অতিক্রান্ত যৌবন-প্রারম্ভের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চন্দননগরের গংগার ধারের বাগানবাড়ীতে কিছুকাল অবস্থিতি। কবি "জীবনস্মৃতি"তে লিখেছেন—"আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশ ভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গংগার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের

মাঝখানকার দিগন্ত প্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।'' কবি গংগাতীরের সেই দিনগুলোকে স্মরণ করে মন্তব্য করেছেন যে সে সময়কার এক একটি দিন ছিল গংগার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্ম ফুল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ 'চিত্রা' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে যে পরিপূর্ণভাবে পেয়েছিলেন তার উন্মেষ ঘটেছিল এই চন্দননগরে। প্রকৃতিকে তিনি শুধু মাত্র লক্ষ্য করেছেন তাই নয়, প্রকৃতিকে সমস্ত সত্তা ও অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করেছেন তারও উল্লেখ 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। সেখানে বলেছেন "বর্ষার দিনে বিদ্যাপতির এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর'' এই পদটিতে মনের মতো সুর বসিয়ে তিনি বৃষ্টিপাত-মুখরিত মধ্যাহ্ন কাল কাটিয়ে দিতেন, কখনও বা সূর্যাস্তের সময় নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন এবং গান করতেন। পুরবী রাগিণী থেকে বেহাগের সুরে গান গেয়ে তাঁর সময় কাটতো। রাত্রিকালে যে প্রকৃতি তাঁকে মনেপ্রাণে আচ্ছন্ন করেছিল সেই প্রকৃতির উল্লেখ করে তিনি বলেছেন "জলে স্থলে শুভ্র শান্ত, দূরের বনরেখা অন্ধকারের নিবিড় নদীর তরংগহীন প্রবাহের উপর ঝিকমিক করছে।'' রবীন্দ্রনাথের জীবনে যৌবনকালের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে তাঁর বিবাহ এবং বিবাহের অব্যবহিত পরে তাঁর শৈশবের সংগিনী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর আত্মহত্যা। এ দুটি ঘটনাই যে কোনও মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্য আলোড়ন তুলতে পারতো কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ দুটি ঘটনা কোনই আলোড়ন তোলেনি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি নিরাসক্তি আছে এ কথা পূর্বেই বলেছি, তাঁর বিবাহটি নিরাসক্তির পর্যায়ে পড়ে। মনে হয় তিনি সংসারের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই পরিবারের নির্দেশে বিয়ে করেছিলেন। এ বিবাহ তাঁর কবি জীবনে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে ভ্রাতৃবধু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করেছিল। কিন্তু কবিতায় কাদম্বরী-স্মৃতিকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন যার ফলে ব্যক্তিগত শোকের ছায়া সেখানে চোখে পড়েনা, মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বেদনাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছিলেন এবং নিজে যে কথা 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে বাইরে কোলাহল থাকতে পারে কিন্তু তা কখনও চিত্তের নিভৃত শান্তিকে বিনষ্ট করতে পারেনা, এ ক্ষেত্রেও দেখছি তাই। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু

তাদের পরিবারে যত আলোড়নই সৃষ্টি করুকনা কেন এবং কবির জন্য তা যতই দুঃখের হোকনা কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্তে এই বেদনার জন্যও একটি অন্তরাল নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যে সমস্ত কবিতার মধ্যে ভ্রাতৃবধূর গৌণ উল্লেখ আছে বলে সমালোচকরা মনে করেন, সে কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব সেখানে ব্যক্তিগত বেদনার কোনও পরিচয় নেই, অর্থাৎ কোনও একটি বাস্তব রমণী না থাকলে এ কবিতাগুলো হতে পারতনা এ কথা সত্য নয়। কবির মানসিকতা এমনই ছিল যে তিনি সৌন্দর্যের সাধক রূপে অন্তরে নিঃসঙ্গ একাকী ছিলেন একজনের কাছে। 'চিত্রা'য় এ-কথা রবীন্দ্রনাথ এভাবে বলেছেন—"অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী তুমি অন্তরব্যাপিনী।" সুতরাং যাকে তিনি অন্তরের মধ্যে একাকী রূপে কল্পনা করছেন বাস্তব জীবনের সংগে তার সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, না থাকলেও কবিতার কোনও হানি ঘটেনা।

বিশ্বে সমস্ত কিছু আমাদের দৃষ্টিতে এবং অনুভূতিতে বস্তু ও আলো রূপে প্রতিভাত হয় এটা সত্য। এবং সত্য বলেই সূর্যের আলোতে বস্তুর অক্ষর দিয়ে বিশ্বকে পাঠ করা চলে। রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্যমান জগতকে আকার-আয়তনহীন বাণীর ভাবে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ প্রতিদিনের মানুষ যেভাবে পৃথিবীকে জানে তিনি সেভাবে জগতকে জানতে চাননি, তিনি জগতকে জানতে চেয়েছেন অন্তরের একটা উপলব্ধির দ্বারা। অর্থাৎ কোনও ঘটনা অথবা দৃশ্য কবির অন্তঃকরণের তন্ত্রীতে যখনই সুর হয়ে বেজে উঠেছে তখনই তাকে কবি বাণীর ভাবে প্রকাশ করেছেন। একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল ও সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার সময় পায়নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। যুক্তি-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে "ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূর বিস্তৃত সমতল ভূমি আছে এমন ইউরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্য আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে।" জীবন-স্মৃতিতে

এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তিনি অসীমের সাজপরা রূপটি দেখতে চান। এই অসীমের সাজ-পরা রূপটি কোথায় পাওয়া যায়? যখন সকাল বেলায় সূর্য ওঠে, ফুল ফোটে, তখন চতুর্দিকে একটা বিস্তীর্ণ আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়, সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই আনন্দের হিল্লোলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অসীমের সাজ-পরা রূপটি দেখতে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ধারণা পৃথিবীতে কোনও কিছু স্থায়ী নয় কিন্তু প্রকৃতি এক অদ্ভুত মন্ত্র-বলে সে কথাটা আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে এবং সে কারণে আমরা উৎসাহের সংগে সংসারের সকল কাজ করতে পারি। অর্থাৎ কর্ম-ক্লিষ্ট সন্দেহ-পীড়িত বিয়োগ-শোকাতুর সংসারের ভিতরে একটা চির-স্থায়ী সুগভীর বেদনা আছে। এ বেদনার অনুভূতিটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং এটা মানসিক নির্যাতন আনেনা কিন্তু একপ্রকার আনন্দে চিত্তকে উদ্বোধিত করে। ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক যুগের কবি 'কীট্‌স্'-এর একটা কবিতায় এই রোমান্টিক বেদনা-অনুভূতির ব্যাখ্যা আছে। কীট্‌স্ বলছেন "তোমার চিত্তে যদি বেদনা জাগে তবে সেই বেদনা নিঃশব্দে এবং নিভৃতে লালন করবে। যদি সেই বেদনার কথা অন্য কাউকে বল অর্থাৎ তুমি যদি বেদনার সংগী অনুসন্ধান কর তাহলে সে বেদনা হারিয়ে যাবে।" কবির বক্তব্য হচ্ছে সাংসারিক জীবনে যে সমস্ত বিয়োগ-বেদনায় মানুষ পীড়িত হয় সেগুলো থেকে মানুষের মুক্তির দরকার যদি সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়। তাই পার্থিব বেদনা অপনোদনের জন্য আমরা সংগী খুঁজি, আমরা বেদনা-বিস্মৃতির জন্য বেদনার কথা সবাইকে বলি, কিন্তু কবি যে রোমান্টিক বেদনা-বৃত্তির কথা বলছেন তা এক প্রকার সূক্ষ্ম অনুভূতি, তা বাস্তবের বেদনার মতো নয়। রবীন্দ্রনাথও এই রোমান্টিক বেদনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে, একটি নতুন বর্ষার গান রচনা করি। কথাতো ঐ একই—বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য নতুন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহ-বেদনা কেবল গানের সুরে তা প্রকাশ পায়।" সর্ব মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের একটা চেষ্টা ছিল ছন্দে এবং সুরে এমন একটা ইন্দ্রজাল তিনি নির্মাণ করবেন প্রাত্যহিকের করস্পর্শে যার ক্ষয় ঘটবেনা, যেখানে দাগ ধরবেনা। রবীন্দ্রনাথ মনের মধ্যে বস্তু-জগৎ থেকে একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষ নির্মাণ

করে তাঁর সুর এবং ছন্দকে পোঁছে দিতে চেয়েছিলেন লোকান্তরে, সীমান্তরে ; রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় মানব জীবনের বিচিত্রতাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেননি, তিনি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একটা অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং সেই যে রহস্যলোক, সেই রহস্যলোক বড় নিভৃত, বড় নির্জন এবং গভীর। সেখানে নিরত সংসারের জন্য কোনও প্রকার সুব্যবস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গান, নক্ষত্র-খচিত নিশীথিনী এবং নব উন্মেষিত অরূণরাগকে ভাষা দিয়েছে, ঘন বর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ বেদনাকে চিত্রিত করেছে এবং নব বসন্তের বনান্ত প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বক্ষে বিস্মৃত বিহ্বলতাকে বহন করছে।

কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কর্ম-জীবনের আহ্বান আছে এমন কথা বলেছেন এবং তার উল্লেখ স্বরূপ কতকগুলো দুর্বল কবিতার উদাহরণ উপস্থিত করেছেন। যেমন 'এবার ফিরাও মোরে', 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', 'বর্ষশেষ', 'যেতে নাহি দিব', 'বৈশাখ', ইত্যাদি। এ কবিতাগুলোতে বাস্তবের সংগে কবির সংযোগের আভাস পাওয়া যায় কিন্তু সামগ্রিক রবীন্দ্র-চেতনায় এ গুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে এ কবিতাগুলো প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকোলাহল থেকে উদ্ভূত নয় এবং লোক-জীবনের ব্যবহারিক বাণীতে এ কবিতাগুলোর অংগ-প্রসাধন হয়নি। 'বর্ষশেষ' কবিতায় কবি স্পষ্টভাবেই বলছেন যে, যে পথে অনন্তলোক বিচিত্র কর্মপ্রবাহে প্রবাহিত কবি সেই পথে তাদের সংগী হতে চাননি, তিনি পথপ্রান্তের এক পার্শ্বে অপেক্ষা করে বিচ্ছিন্নভাবে সেই পথযাত্রাকে অনুভব করতে চান। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় অসীম শান্তি এবং বিপুল বিরতির কথাই প্রবল। তাই বাইরের জগতের কর্মকাণ্ড তাঁর দৃষ্টিতে বদ্ধ হলেও এবং কখনও কখনও সেগুলোর দ্বারা তিনি আলোড়িত হলেও কবি চেতনায় তার চিরস্থায়ী কোনও স্বাক্ষর ছিলনা।

শেক্সপীয়ারের 'কিং লীয়ার' নাটকে লীয়ারের একটা উক্তি এই আলোচনাসূত্রে উল্লেখযোগ্য। কিং লীয়ার পার্থিব সমস্ত ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে একটি নির্জন বন্দিদশায় তাঁর কন্যা কর্ডেলিয়াকে নিয়ে জীবন-যাপন করতে চাচ্ছেন।

এই বন্দিদশায় জীবন-যাপন করার স্পৃহাকে আমরা এই বলে ব্যাখ্যা করতে পারি যে বাইরের পৃথিবীর কোলাহল এবং কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব কবির নেই। তিনি তাঁর চিত্তের নির্জনতাকে লালন করতে চান এবং সেই নির্জন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপলব্ধির মধ্যে জাগ্রত থাকতে চান। লীয়ারের উক্তিটি নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছে:

"Come, let's away to prison:
We two alone will sing like birds i'the cage:
When thou dost ask me blessing, I'll kneel down
And ask of thee forgiveness: so we'll live,
And pray, and sing, and tell old tales, and laugh
At gilded butterflies, and hear poor rogues
Talk of court news; and we'll talk with them too—
Who loses and who wins; who's in, who's out;—"

এটা সত্য যে একজন কবির কবিতায় যে বক্তব্য ধরা পড়ে তার বাইরে একটি প্রকাণ্ড পৃথিবী থাকে যে পৃথিবী হচ্ছে বিজ্ঞানের পৃথিবী, আবিষ্কারের পৃথিবী, যন্ত্রশক্তির পৃথিবী এবং অর্থনীতির বিচিত্র পৃথিবী। একজন ব্যক্তির কল্পনার মধ্যে পৃথিবীর এই বৈচিত্র কখনও এক সংগে ধরা পড়েনা, পড়তে পারেনা। অতীতে এটা যতটা সম্ভবপর ছিল, বর্তমানে তা একেবারেই নেই। তাই আমরা দেখি যে অতীতের কবিরা সমগ্র পৃথিবীকে তাঁদের বিবেচনায় আনবার চেষ্টা করেছেন এবং যে শক্তি তাঁদের সময়কালের ইতিহাসকে শাসন করতো সেই শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানকালে যে সমস্ত শক্তির দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শাসিত হচ্ছে সেই শক্তির সংগে একজন কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যবধানের কথা শেলী ভেবেছিলেন এবং তাঁর ধারণায় এই ব্যবধানের ফলে সভ্যতায় বিপদ দেখা দেবে। কেননা শেলী ধারণা করেছিলেন যে কবির একটি বিরাট দায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব হচ্ছে সভ্যতাকে রক্ষা করা, কিন্তু যন্ত্র এবং রাজনীতি সে দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে কবিতা কখনও কোনও সভ্যতা রক্ষা করেনা এবং সে দায়িত্ব কোনও কবির হতে পারেনা,

যদিও আমরা জানি যে রাজনীতি, সমাজনীতি কবির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সে প্রভাবের ফলে কবিতার বিশেষ বিশেষ রূপকল্প গড়ে ওঠে। অতীতে ভার্জিল রোমকদের জন্য একটি বিশেষ জীবনধারার পরিকল্পনা করেছিলেন 'দি ইনিড' নামক মহাকাব্যে এবং শেক্সপীয়ার ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের একটি সম্মানিত চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। আমেরিকার কবি হুইটম্যান তাঁর 'Song of Myself' কাব্যগাথায় সমগ্র আমেরিকার জন্য একটি নব জাগরণের প্রেরণা এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে আলোচনা করতে গেলে আমরা সেই একই ধারার সংগে সমন্বিত করে তাঁকে বিশ্লেষণ করবো। শেক্সপীয়ারের যে রোমান্টিসিজম পরবর্তীকালে শেলী, কীট্‌স্‌-এর রোমান্টিক প্রাণ-প্রাবল্যে পরিণত হয় তার সংগে রবীন্দ্র-নাথের মানস-চৈতন্যের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। বাইরের পৃথিবীর কোলাহল এবং কর্মধারা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছে এটা সত্য, কিন্তু সে সমস্ত বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে কবিতা লেখার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ বোধ করেননি। তাঁর বিবেচনায় বাইরের যে কোলাহল অথবা সংঘর্ষ তা সাময়িক একটি বিপর্যয় মাত্র। মানুষকে এই বিপর্যয়ের ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে। তাই প্রথম মহাযুদ্ধ, স্পেনের গৃহ বিপ্লব এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন-সায়াহ্নে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এর কোনটাই রবীন্দ্রনাথের বাণীকে প্রভাবান্বিত করেনি, কেননা যে শান্তি এবং নির্জনতায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন সে শান্তি এবং নির্জনতা হচ্ছে বিশ্ব মানবের জন্য কল্যাণবহ এবং মানব চিন্তের সমৃদ্ধির প্রেরণা।

পৃথিবী পরিবর্তনশীল এবং পৃথিবীর এই পরিবর্তন ধরা পড়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির অনবরত পরিবর্তনের মধ্যে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার-গুলো একটি অন্যকে অতিক্রম করে চলে, এক সময়ের বিজ্ঞানচর্চা পরবর্তী সময়ের জন্য ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। পৃথিবীর এই যে বাইরের দিকটা যে বাইরের দিকে আমরা বিজ্ঞানচর্চা দেখছি, অর্থনীতির নতুন নতুন ব্যাখ্যা পাচ্ছি, রাজনীতির, সমাজনীতির বিভিন্ন আন্দোলন দেখছি, এগুলো সময়কালের গণ্ডির দ্বারা আবদ্ধ। কিন্তু যে মানুষ এই সমস্ত আন্দোলন অথবা কর্মধারায় বিপর্যস্ত অথবা ক্লিষ্ট অথবা আনন্দিত সেই সমস্ত মানুষের পরিচয়কে কবি উপস্থিত করেন এটাই তাঁর প্রধান দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথের

ঐকান্তিক শান্তি সন্ধান অথবা নির্জনতায় অভিনিবেশ, পৃথিবীর মানুষ থেকে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতা বোঝায় না কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্ম থেকে বিচ্ছিন্নতা বোঝায়। একটি বিশেষ সময়কালের রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকলার ক্ষেত্রে শাসিত হয়েছেন এটা বলা যায় না, বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে মানুষকে স্বীকার করেছেন এবং মানুষকে সম্মান দিতে চেয়েছেন। যেহেতু তাঁর কল্পনা ছিল বিরাট, যেহেতু সর্বমানবের জন্য সর্বকালীন একটা ন্যায়ের কল্পনা তিনি করেছিলেন তাই রবীন্দ্রনাথকে জীবনের প্রবহমানতা থেকে বিচ্ছিন্ন কবি হিসাবে আমরা বিবেচনা করবো না। 'বলাকা'র একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এ কথাই বলেছেন:

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।"

সৌন্দর্যকে, মহত্তকে, অনির্বচনীয়কে এবং কল্পনাতীতকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং নিজেকে যেন সেই অনির্বচনীয়ের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি গণ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই অরূপ সৌন্দর্যের কথা বহুবার বলেছেন। সেই অরূপ সুন্দরকে তিনি সন্ধান করেছেন বিরাট একটা নীরবতার মধ্যে। কিন্তু পৃথিবীতে দুঃখ এবং গ্লানি যে আছে তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন এবং এই দুঃখকষ্ট, নির্জনতা রবীন্দ্রনাথের মনকে অনবরত বিচলিতও করত কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত বিচলতা সকল প্রকার সুর ও সংগতির পরিপন্থী, তাই তাকে তিনি সহ্য করতে চাননি। মানুষের শেষ আশ্রয় কোথায়, এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন পৃথিবীতে আমাদের যে পরিচয় সে পরিচয় অসমাপ্ত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নৈবেদ্য দান করি সে নৈবেদ্যও অসম্পূর্ণ। কিন্তু যদি কোনও সুযোগে অন্তরের গহনবাসীরে

আবিষ্কার করতে পারি তাহলে যে বাণী গোপনে লীন আছে সেই বাণীতে আমরা জেগে উঠবো :

"ওরে পান্থ, কোথা তোর দিগন্তের যাত্রাসহচরী।
দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চ'লে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি',
নিকুঞ্জ-ভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করেনা প্রচার
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চ'লে তার স্বর্ণরথ
কোন সিন্ধুপার ॥
জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলেনা নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিণী।
কেন সাজালেনা দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র গানে
জাগায়ে দিলেনা
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা ॥
অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'ল তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী ॥"

রবীন্দ্রনাথের অনির্বচনীয় তত্ত্বটাকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে একটা ফুল যখন ফোটে গাছে, তখন তার জয় হচ্ছে তার আবির্ভাব। এ ফুল যার ভাল লাগল সে সৌভাগ্যবান, যার ভাল লাগলনা সে দূরে রইল।

কবির সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে। সেখানে কর্মের বল নেই এবং অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতির দ্বন্দ্বের কোলাহল নেই। যা সুন্দর তার মধ্যে আয়ত্তের অতীতের একটি রহস্যময় সত্তা আছে। সেই সত্তার সংগে সম্পর্ক মানুষের চিত্তের। এই সম্পর্কের কারণে একজন কবির আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর ও উজ্জ্বল এবং এই সম্পর্কের কারণে কবির সত্তা আয়ত্তের অতীত সত্তার সংগে রঙ্গে-রসে মিশে যায়। রবীন্দ্রনাথ একে অনুরাগ আখ্যা দিয়েছেন। কবি আরো বলছেন কবির কাজ হচ্ছে এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা এবং ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। যে কবি সময়ের শাসন না মেনে এমন বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছেন যার মধ্যে নিত্যতা আছে এবং মহিমা আছে, তিনিই বড় কবি। পৃথিবীর কাব্য-ভাণ্ডার অনুসন্ধান করলে আমরা দেখবো, চিরকালের জন্য সঞ্চিত রয়েছে যে সব কাব্য-সম্পদ সেগুলো মানুষের প্রতি অনুরাগের চিহ্ন বহন করে। যে কোনও দেশের কাব্যের স্থায়ী সম্পদগুলো পাঠ করলে বোঝা যাবে যে সেই কাব্যই বেঁচে আছে যেখানে মানুষকে ভালবাসবার কথা আছে, কোনও বিশেষ সময়কে অথবা সময়ের রীতিনীতিকে অবলম্বন করার কথা নেই। সংসারে অনেক কোলাহল আমরা শুনি, অনেক বেদনার সুর এবং অনেক আনন্দ ও প্রমাদের সুর, কবি এ-সবকিছুকে প্রকাশ করেননা কিন্তু এ-গুলোকে অবলম্বন করে এমন কিছু প্রকাশ করেন যার ইংগিত ধ্রুবের দিকে এবং বীর্যবান ও বিশুদ্ধ চিত্তের দিকে। দূরকাল এবং বহুজনকে প্রাণ-সম্পদ দান করার দ্বারা কাব্য স্থায়ী ভাবে সার্থক হয়। পূর্বেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ কোনও জীর্ণ গণ্ডিতে এবং বিপর্যস্ত জগতে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি যে জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে তা শোভমান ছিল, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ছিল এবং প্রশান্তিতে অনাবিল ও নিরাসক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ চোখ মেলে যে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তাতে তাঁর চোখ কখনও ক্লান্ত হয়নি। অনবরত বিচিত্র বিস্ময় তাঁকে অভিভূত করেছিল। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত, তাতে কবির মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগ যুগ তিনি এই বিশ্ববাণী শুনেছেন। সৌর জগতের প্রান্তে যে ধরিত্রী ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্র সজ্জায় সুসজ্জিত হয়, কবি তাকে অভিষেক জানিয়েছেন

এবং এভাবে প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্রের মধ্যে, ঔদার্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি বিরাট সত্তাকে অনুভব করতে চেয়েছেন যিনি সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব এবং যার আনন্দে নিরন্তর বিচিত্রভাবে কবির চিত্ত উৎফুল্ল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমি এসেছি এই ধরণীর মহা তীর্থে— এখানে সর্বদেশ, সর্ব জাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নর দেবতা তারই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদ-বুদ্ধি স্খালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

আমরা দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিশেষ ব্যঞ্জনায় একান্তভাবে স্বকীয়। অর্থাৎ কবিতার গঠন-প্রণালীতে, ছন্দে, এক কথায় আংগিকে দেশকালের প্রভাবকে কবি এড়িয়ে চলেছেন। উন্মেষ-যুগের কাব্যকালকে পরীক্ষা করলে অনেক সময় মনে হবে যে এই যে বিশেষ রূপকল্প এবং বিশেষ ছন্দের বিন্যাসে প্রবর্তিত বাণীভংগি এ-গুলো বাংলা কবিতায় একেবারেই নতুন। এ-গুলোর মধ্যে একজন বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। চিরাচরিত ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে সৃষ্টির পথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদ-যাত্রা নয়। যে অর্থে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিস্ময়করভাবে নতুন, ঠিক একই অর্থে রবীন্দ্রনাথও বিস্ময়কর-ভাবে নতুন। আমার বলবার কথা এই যে এই বিশেষ স্বকীয়তার কারণে রবীন্দ্রনাথ দেশকালকে কবিতায় প্রশ্রয় দেননি। তাই দেখি, বাংগালীর দৈনন্দিন জীবন গল্পগুচ্ছে এলেও কবিতায় আসেনি। কবিতায় যা এসেছে তার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি, অর্থাৎ স্থানীয় প্রকৃতি, আবাল্য যে প্রকৃতির মধ্যে তিনি একটি মহত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। এই নিঃসর্গের মহত্ত্ব কবিকে তন্ময় রেখেছিলো এবং কবি তাঁর পরিচিত প্রকৃতির বর্ণবিন্যাসে বিশ্বপ্রকৃতির ভাব-মূর্তি এঁকেছিলেন। আমরা এখানে দু'টি উদাহরণ উপস্থিত করবো। দুটি উদাহরণই প্রকৃতির। একটি বিশেষ স্থানের প্রকৃতিকে অবলম্বন করে তিনি রূপময়তা এবং আনন্দময়তার চিত্র অংকন করেছেন যা প্রাদেশিক হয়েও বিশ্বপ্রকৃতির। প্রথম উদাহরণটি 'চিত্রা' কাব্যের 'সুখ' কবিতা থেকে—

> "আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
> হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুন্দর বাতাস
> মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—

অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্‌বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ভাঙা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটির;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো।"

দ্বিতীয় উদাহরণটি 'জন্মদিন' কাব্যের ১৪নং কবিতা থেকে:

"পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দে করতালি।"

এখানে আমরা দেখছি, রবীন্দ্রনাথ যদিও কোলাহলমুখর পৃথিবীকে জানতেন এবং পরিচিত একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই তাঁর চিন্তা-ধারার উন্মেষ ঘটেছিল কিন্তু কবির দৃষ্টি সমাজ এবং সংসারের কর্মধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। চতুর্দিকের কলরব এবং কোলাহল তাঁর চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে পারেনি, তিনি এই সংসারের কোলাহলকে অতিক্রম করে একটি নিত্য উৎসবের অংগনের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করেছিলেন। দেখা যাবে তিনি যে প্রকৃতির কথা বলছেন সেই প্রকৃতি তাঁর পরিচিত প্রকৃতি সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকৃতির প্রত্যক্ষ রূপের মধ্য থেকে তিনি একটি নিত্যকালের সৌন্দর্য-মাধুরী আবিষ্কার করেছেন যাকে নিয়ে কবির চিরকালের আনন্দ আস্বাদ। এই পথে অগ্রসর হয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, কবির কবিতায় যুক্তির নির্দেশ নেই, সর্বত্রই একটি সনাতন সত্যের নির্দেশ। একটি সাধারণ উদাহরণ দিলে কথাটি

স্পষ্ট হবে। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'বলাকা' কবিতাটিতে শব্দময়ী অপ্সর রমণীর কথা আছে। এই বক্তব্যটি যুক্তির বিচারে অসংগত কিন্তু কবি শব্দময়ী অপ্সর রমণীর এমন একটি অনুসংগ নির্মাণ করেছেন যাতে কথাটা কোনও অর্থ ব্যক্ত না করেই আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে। এ-ভাবেই রবীন্দ্রনাথ সর্বমুহূর্তেই সময়সীমার গণ্ডি অতিক্রম করে মুক্তির সন্ধান করেছিলেন। তাই তাঁর কবিতাকে আমরা দেশ ও কালের দ্বারা সমর্থিত ও বিধিবদ্ধ পাইনা, তাকে দেশ এবং কাল অতিক্রম করতে দেখি। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, দেশ এবং কালকে কবি অতিক্রম করলেন এটা ভাল কথা, কিন্তু যে অঞ্চলে কবির জন্ম সেই অঞ্চলকে তিনি এড়াবেন কি করে? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, প্রত্যেক মহৎ কবিরই একটি অঞ্চল থাকবে যে অঞ্চলকে তিনি এড়াতে পারেননা। অঞ্চল অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে 'টেরিটোরী'। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাংলাদেশের ভূমণ্ডল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অঞ্চল হিসাবে কাজ করেছে। যে প্রকৃতির বর্ণনা রবীন্দ্রনাথে আছে সে প্রকৃতি বাংলাদেশের, যে ঋতু-বৈচিত্রের পরিচয় আমরা রবীন্দ্রকাব্যে পাই সে ঋতু-বৈচিত্র বাংলাদেশের, যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পাই তা নদীমাতৃক বাংলাদেশের, কিন্তু কবি তাঁর ব্যক্তিগত অঞ্চলকে একটি বিশেষ সীমানার পরপারে নিয়ে গেছেন। এমনভাবে নিয়েছেন যে অঞ্চলকে না হারিয়েও আমরা সেখানে বিশ্বপ্রকৃতিকে পাচ্ছি।

একটি বিশেষ অঞ্চল বা 'টেরিটোরী' এবং একটি বিশেষ সমাজের আচার নিষ্ঠা বা ধর্মীয় প্রথা উপকরণরূপে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এসেছে কিন্তু কোনও অঞ্চলের পরিচয়-সূত্রে নয় অথবা কোনও প্রথার প্রতিষ্ঠা-কল্পে নয়—এসেছে কবির একটি মুডকে পরিস্ফুট করবার জন্য, যেমন 'চিত্রার' 'সন্ধ্যা' কবিতার—

১. "তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা এবিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা।"

২. "ঐ শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘন্টাধ্বনি।"

৩. "নির্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী—নয়নপল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়নযুগল,
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু-ছলছল
করিয়া গোপন।"

৪. "হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলেনা; শূন্য মাঠ জনহীন,
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই-তিন
কুটির-অংগনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়।"

৫. "অমনি নিস্তব্ধপ্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে।"

অথবা 'অন্তর্যামী' কবিতার—

১. "তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।"

২. "গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গোরু, বধু জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়—
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।"

৩. "জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার,
মহামন্দিরতলে?"

৪. "জীবন-পোড়ানো এ হোম-অনল
সেদিন কি হবে সহসা সফল?
সেই শিখা হতে রূপ নির্মল
বাহিরি আসিবে বুঝি।"

অথবা 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতার—

"দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণসিঁদুর রেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শংখবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কী মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি
প্রভাতে দিয়েছ দেখা।"

অথবা 'উর্বশী' কবিতার প্রথম স্তবক—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
ঊষার উদয়সম অনবগুন্ঠিতা
তুমি অকুন্ঠিতা।"

এই উদাহরণগুলোতে আমরা মন্দিরের কথা পাচ্ছি—মন্দিরের শঙ্খ-ঘন্টাধ্বনি এবং আরতি, প্রতিমা নির্মাণের কথা শুনছি এবং হোম-অনলের

কথা শুনছি। এ-গুলো সবকিছু হিন্দু সমাজের ধর্মীয় কতকগুলো আচারের পরিচয় বহন করে। আবার সন্ধ্যাকে সতী রমণীর সংগে তুলনা করা এবং দিনান্তকে গ্রামের অংগনে বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে এমন এক রমণীর সঙ্গে তুলনা করা আমাদের পল্লী অঞ্চলের হিন্দু গৃহবধুর কথা মনে করিয়ে দেয়। 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতার যে মঙ্গলময়ী রমণীর কল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন সে রমণী হচ্ছে হিন্দু সমাজের গৃহবধু, কেননা তার সিঁথিমূলে সিন্দুরবিন্দু এবং বাহুতে শঙ্খবলয়। এ-ভাবে আবার 'উর্বশী' কবিতায় আমরা দেখছি কবি অলৌকিক এবং অসামান্য একটি সৌন্দর্যের কল্পনা করেছেন কিন্তু সে সৌন্দর্যকে চিহ্নিত করবার জন্য তিনি বাংলাদেশের গৃহবধুদের উপমা এনেছেন। কবি বলছেন, যে রমণী গৃহপ্রান্তে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে অথবা স্তব্ধ অর্ধরাতে যে রমণী দ্বিধা-জড়িত পদে বাসর-শয্যায় গমন করে উর্বশী সে রমণী নয়। কবি এ সমস্ত চিত্র অংকন করে চিত্রগুলোকে প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেননি, তিনি বিশেষ অঞ্চলের এবং বিশেষ সমাজের কতকগুলো চিত্রের মাধ্যমে তাঁর কয়েকটি বক্তব্য পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। 'সন্ধ্যা' কবিতার বক্তব্য হচ্ছে বিশ্রাম ও নির্জনতা, 'অন্তর্যামী' কবিতার বক্তব্য হচ্ছে চিত্তস্থিত অন্তরতমের উপলব্ধি, 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় কবি সর্বকালীন এক রমণী মূর্তির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন, আবার 'উর্বশী' কবিতাতে অনন্ত সৌন্দর্যের পরিচয়-লিপি আঁকা হয়েছে। সর্বত্রই দেশকালকে কবি স্পর্শ করেছেন কিন্তু তাকে অনিবার্য করেননি, তিনি দেশকালকে অতিক্রম করে বিশেষ কয়েকটি মুড বা আবহের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে চেয়েছেন।

''পুনশ্চ'' কাব্য গ্রন্থে 'নূতন কাল' বলে একটি কবিতা আছে। সেখানে কবি তাঁর কাব্যের প্রাণসম্পদ সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য উপস্থিত করেছেন। তিনি বলছেন, চিরকাল তাঁর একমাত্র চেষ্টা ছিল হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করা এবং প্রাণের মিলনমন্ত্রে সমস্ত মানুষকে একটি ঐক্যসূত্রে দেখা। তাই তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা কখনও পুরোনো হবার নয়। তিনি গর্ব করে বলতে চান তিনি অতীত ও এ-কালের অর্থাৎ তিনি সর্বকালের। কবিতাটি তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে, এক সময় যখন কবিতা রচনা আরম্ভ করেছিলেন তখনও প্রাণের দাবীতেই রচনা আরম্ভ করেছিলেন। আজকে নতুন যুগ এসেছে বলে তাঁর বক্তব্য মিথ্যে

হতে পারেনা। তার কারণ এখনও যখন তিনি মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন দেখেন এখনকার দিনের মানুষের চোখের পাতায়ও করুণ প্রত্যাশা লেগে আছে। তাই এই সর্বকালীন বেদনার কথা, মমতার কথা এবং করুণ প্রত্যাশার কথা বলতে যেয়ে তিনি যে গান রচনা করলেন সে গান পুরাতন হয়েও চিরন্তন। অনেক সময় এই ইচ্ছা জাগে যে যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পায়ের চিহ্ন মুছে যায় তাই অতীতের দায় না টানলেওতো হয়, কিন্তু কবি তা পারেননা। কবির বিবেচনায় অতীতকে অস্বীকার করা একটা প্রবল মূঢ়তা মাত্র। এ-কালের আংগিনায় এসে তিনি সে-কাল এবং এ-কালকে একাকার দেখতে পাচ্ছেন। একাকার হয়েছে হৃদয়, মমতা এবং প্রণয়ের প্রত্যাশায়।

৭

একজন কবির জন্য দৃষ্টি একটা প্রবল সহায়। দৃষ্টির সহায়তা না পেলে কবির জন্য কবি হওয়া সম্ভবপর হয়না। তার কারণ আমরা দৃষ্টি-গোচর পৃথিবী থেকে আমাদের চিত্তের সমস্ত সম্পদ আহরণ করি। আমরা চোখে যা দেখি তাকেই নানাভাবে আমাদের সৃষ্টিতে সঞ্চিত রাখি। এ সঞ্চয়গুলো আবেগের অনুসঙ্গে আমাদের দৃষ্টির সঙ্গে ভাস্বর হয় এবং পুরাতন ঘটনাকে অথবা ইতিহাসকে আমরা নতুন করে জাজ্জ্বল্যমান দেখতে পাই। মানুষ তার আবেগকে দৃষ্টির দ্বারা সঞ্চিত করেই গ্রহণ করে এবং দৃষ্টির দ্বারা সমর্থিত না হলে আবেগ পরিস্ফুট হয়না। আমরা যখন কোন বেদনা অথবা মমতার কথা ভাবি তখন বেদনা অথবা মমতার অনু-সঙ্গে কথাগুলো দৃশ্যপটে উন্মোচিত হয়। বেদনার কথা যখন ভাবি তখন হয়ত অতীতের কোন ঘটনা যা আমাদের বেদনার্ত করেছিল সেই ঘটনার চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে উঠে। আবার মমতার কথা যখন ভাবি তখন মমতামধুর ঘটনার চিত্রগুলো একে একে উদ্ভাসিত হয়। তেমনি যখন প্রেমের কথা ভাবি তখন প্রেমের অনুসঙ্গে বিভিন্ন বিভিন্ন ঘটনা আমাদের দৃষ্টির সামনে একে একে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রেমের ঘটনা চিত্ররূপে কিভাবে আমাদের মনকে আকুল করে তার একটি উদাহরণ "পার্ল বাক"-এর একটি গল্পে আছে। গল্পটি একজন বৃদ্ধ পাদ্রীর। যৌবনকালে এই পাদ্রী একজনকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু ভীরুতা ও শংকার কারণে তিনি তাঁর প্রেমের দাবী কখনও প্রকাশ করতে পারেননি। এর পর অবস্থা-বিপাকে তিনি পুরোহিত হলেন, এবং এ-ভাবে অনেক সময় কেটে গেল। অনেকদিন পর তিনি যে গ্রামের গির্জায় পৌরোহিত্য করছেন সেই গ্রামে অবসর যাপনের জন্য এক বৃদ্ধ দম্পতি বাস করতে এল। পুরোহিতের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হোল। পুরোহিত দেখলেন যে বৃদ্ধ-মহিলা তাঁর পূর্ব প্রণয়িনী। অকস্মাৎ পুরোনো ঘটনা তাঁর মনে পড়ল। একদিন যখন খুব বৃষ্টি পড়ছে, চারিদিকে ঝড়-জল, তখন কি মনে করে

পুরোহিত ছাতা হাতে করে সেই অবসর-যাপনকারীদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁর পূর্ব প্রণয়িনীকে একাকী পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি মনে পড়ে অতীতে একদিন ঠিক আজকের মতো বৃষ্টি হচ্ছিল এবং সেদিন আমি তোমার ঘরে ছিলাম। আমার তখন ইচ্ছে করছিল তোমাকে কাছে টেনে নেই এবং তোমার সঙ্গে গোপনে রাত্রি যাপন করি। কিন্তু আমি পারিনি। আমি চলে এসেছিলাম।" মহিলা বললেন "হ্যাঁ, আমার সব মনে পড়ছে। তুমি কি ভেবেছিলে তা আমি জানিনা, কিন্তু হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে তুমি তাড়াতাড়ি সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে চলে গেলে।" পুরোহিত তখন জিজ্ঞেস করলেন "আচ্ছা, তখন যদি আমি তোমাকে খুব ঘনিষ্ঠ করে পেতে চাইতাম তা'হলে তুমি কি করতে?" মহিলা হেসে উত্তর করলেন, "আমি তাতে খুব আনন্দের সঙ্গে সাড়া দিতাম।" পুরোহিত তখন সেই আগের মতোই অতি দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। গল্পটিতে লেখিকা পুরোনো একটি চিত্রের সাহায্যে প্রণয়ের বঞ্চনা এবং হতাশাকে আশ্চর্য্যরূপে চিত্রিত করেছেন। দৃশ্যময়তার কারণে এই চিত্রটি সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এভাবেই আমরা পুরোনো ঘটনাকে স্মরণে রাখি। কবির জন্য এটা আরো বেশী উল্লেখযোগ্য। কবি উপমারূপক সৃষ্টি করেন একটি বস্তু বা ঘটনাকে প্রমাণিত বা গ্রহণযোগ্য করার জন্য। এবং অধিকাংশ স্থলেই এই উপমা দ্বারা একটি ঘটনা বা উপলব্ধি দৃশ্যমান হয়। যেমন কবি শেলী 'Ode to the West Wind' কবিতায় ভূমধ্যসাগরের একটি অসাধারণ উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করেছেন। চিত্রটি এত স্বচ্ছ এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য যে সমগ্র ভূমধ্য-সাগর তাঁর স্বভাব এবং দৃশ্যমানতায় আমাদের চিত্তে চিরস্থায়ী ছবি এঁকে যায়। কবির বক্তব্য ছিল পশ্চিমের যে ঝড় প্রবল আলোড়ন তোলে সেই ঝড়ের একটি বিবরণ দেওয়া। এই ঝড়ের বিবরণ দিতে যেয়ে তিনি নিস্তরঙ্গ নীল ভূমধ্যসাগরের কথা বলেছেন পশ্চিমের প্রবল ঝড়ে যে নিস্তরঙ্গ সলিল উৎক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য তার শোভা ও সৌন্দর্য্যকে হারিয়ে ফেলে। দূরন্ত পশ্চিমের ঝড়ের পরিচয় নির্মাণ করতে যেয়ে কবি শান্ত ভূমধ্যসাগরের একটি ছবি এঁকে বিক্ষোভের দ্বারা তা আহত হলে কি রকম দেখায় তাই বলেছেন। শেলী তাঁর বক্তব্যকে কয়েকটি দৃশ্যগোচর চিত্রের সংযোজনায় প্রমাণ করেছেন।

মানুষ হিসাবে আমাদের শুধু দর্শনেন্দ্রীয়ই আছে তাই নয়, অনুভূতির অন্যান্য ইন্দ্রীয়ও আছে। আমরা শুধু যে দেখি তাই নয়, আমরা দেখি, আমরা কানে শুনি, আমরা আঘ্রাণ নিই, রসনায় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করি এবং স্পর্শের দ্বারা একটি বস্তুর উষ্ণতা, শীতলতা বা আকার অনুভব করবার চেষ্টা করি। সুতরাং দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ এবং স্পর্শন এ-গুলোর সম্মিলিত উপলব্ধিতে আমরা সজীব মানুষ। একজন কবি এই সব কটি উপলব্ধিকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রধানত তিনি বস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন বেশী। মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদবধ" কাব্যে একটি অতি সুন্দর উপমা আছে। হৃদয়ের বেদনাকে প্রকাশ করবার জন্য এই উপমা তিনি ব্যবহার করেছেন। উপমাটি পদ্ম ও পদ্মের মৃণালের। কবি বলছেন, পদ্ম যদি আমরা ছিঁড়ে ফেলি তাহলে মৃণালটি পানিতে তলিয়ে যাবে, তেমনি হৃদয়-বৃন্তের পুষ্প যে পুত্র তার মৃত্যু ঘটলে হৃদয় শোকসাগরে ডুববে। এখানে কবি সূক্ষ্ম একটি হৃদয়-বেদনাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য একটি চিত্রের মাধ্যমে যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু বেদনার বর্ণনা দিলে বেদনার অনুকূলে পাঠকচিত্তে কোনও সাড়া জাগতনা, কিন্তু একটি চিত্রের মাধ্যমে তা উপস্থিত হওয়ায় সহজেই আমাদের চিত্তে সাড়া জাগাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচারে যতই আমরা অগ্রসর হব ততই দেখবো যে দৃষ্টিকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। মনে হয় সকল সময় তাঁর সকল বক্তব্যই যেন মানব-দৃষ্টির অন্তঃসার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই দৃষ্টির চিত্র-প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করবার পূর্বে দান্তের 'ডিভাইন কমেডির' একটি উপমার উল্লেখ আমি করব। যখন কবি স্বর্গ-নরক যাত্রার বর্ণনা করছেন উপমাটি তারই একটি বিশেষ লগ্নের। "স্বপ্ন-যাত্রায়" কবি যখন নরকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন দেখলেন একটি জনতা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীকে দেখছে। কিভাবে দেখছে? যেমন করে একজন বৃদ্ধ দর্জি সন্ধ্যাকালে ভ্রূ ঘন করে সূতো প্রবেশ করাবার জন্য সুঁচের ছিদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তেমনি করে নরকের কয়েকটি অপার্থিব প্রাণী কবি এবং তাঁর সঙ্গীকে দেখছিলো। দান্তে এখানে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভয়াবহতা, নির্জনতা এবং অস্বাভাবিকতাকে প্রমাণ করবার জন্য এই উপমার অবতারণা করেছেন। বিশ্ব-সাহিত্যে এই প্রকৃতির উপমা খুব বিরল।

কবি দান্তে একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রের সাহায্যে একটি অস্বাভাবিক অবস্থাকে পরিশোভিত ও প্রমাণিত করেছেন।

আমরা চোখে অনেক কিছু দেখি এবং দেখি বলেই সেগুলোর চিত্রকল্প আমাদের চিত্তে নির্মিত হয়। যখন কবিতা লিখি তখন আমাদের বিশেষ উপলব্ধি ব্যাখ্যার জন্য দৃশ্যগোচর তাৎপর্য নিয়ে শব্দে স্মৃতিপটগুলো উন্মোচন করি। কবি Wordsworth যখন লিখেছিলেন

"My heart leaps up when
I behold
A rainbow in the sky."

তখন তিনি কয়েকটি শব্দে দৃশ্যগোচর তাৎপর্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। Leap, Rainbow এবং Sky, সবকটি শব্দই আমাদের প্রতিমুহূর্তের দৃষ্টির দ্বারা চিহ্নিত। তাছাড়া Leap শব্দটির অনুসঙ্গে শৈশবের উচ্ছলতার কথাও মনে আসে। কবি বলতে চান যে তাঁর হৃদয় নেচে উঠে যখন তিনি আকাশে রংধনু দেখেন। শৈশবেও তাঁর হৃদয় এভাবে নেচে উঠত এবং এখনও নাচে। সুতরাং শৈশবের ঘটনা মনে করে কবি ভাবছেন শিশুই হচ্ছে মানুষের পিতা এবং কবি আশা করছেন যে মানুষের চিরটাকাল—অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ যদি একটি মমতা-সূত্রে গ্রথিত থাকত তবে তা কতনা আনন্দের হত। অন্য একটি কবিতায় Wordsworth তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য কতকগুলো প্রাকৃতিক দৃশ্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। তিনি বলছেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পাথর ডিঙিয়ে ছুটে চলেছে তাকে তিনি ভালবাসেন, প্রতিদিন নবজাত দিবস একটি নিষ্কলঙ্ক ঔজ্জ্বল্যে যখন উদ্ভাসিত হয় তখন তাকেই তিনি ভালবাসেন, অস্তগামী সূর্যের চারিদিকে যে মেঘখণ্ডগুলো ক্রমান্বয়ে জমা হতে থাকে তার প্রশান্তি কবির চোখে প্রশান্তির ছায়া আনে। এ-সমস্ত দৃশ্য-চিত্রগুলো কবির মনে চিন্তার অতীত মমতা এবং আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি Wordsworth তাঁর সমস্ত বক্তব্য চোখে দেখার অনুভূতির দ্বারা লালন করেছেন। যে দৃশ্যগুলো আমাদের স্মৃতিতে জাগ্রত থাকে, সেগুলো জাগ্রত থাকে তাঁর কারণ, সেগুলো এক সময় আমাদের ভালো লেগেছিল এবং সে ভালোলাগা আমাদের দৃষ্টির সীমায় চিরকাল উজ্জীবিত ছিল। এ-ভাবেই বিভিন্ন ঘটনা এবং দৃশ্য কবিদের দৃষ্টির সীমায় ধরা পড়ে

এবং দৃষ্টিকে সৌভাগ্য দান করে। শেলী যখন ভূমধ্যসাগরের কথা বর্ণনা করতে যেয়ে আকাশের কথা লিখেছেন তখন আকাশের কথা বলার মধ্যে তিনি একটি সীমাহীন অতলতার প্রশান্তির কথা বলেছেন, আবার ভূমধ্য-সাগরের নীল বর্ণের পানির কথা যখন বলেছেন তখন একটি স্নিগ্ধ সম্মো-হনের আবেশ এনেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি কবি ভূমধ্যসাগরের বর্ণনার মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের বর্ণনাকেই উপস্থিত করেননি বরঞ্চ একটি আকূল হৃদয়ের নিভৃত উপলব্ধিকে উপস্থিত করেছেন। এ-ভাবেই আমরা দেখি, একজন কবি দৃষ্টির গোচরীভূত করে উপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেন এবং সেই ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দেখাকে অনেকগুলো চোখে দেখার সঙ্গে মিলিয়ে আনন্দ পান। তাই কবির বক্তব্য একটি বিস্মিত বিকাশের মতো চিরকালের জন্য উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমানতায় পরিপূর্ণ হয়। শুধু মাত্র একটি দেখাকেই যে অনেক দেখার আনন্দের সঙ্গতির মধ্যে আবি-ষ্কার করি তাই নয়, অনেক সময় কোন একটি উপলব্ধি, চিন্তা ও আবেগকেও আমরা দৃশ্যমান বস্তুর চিত্রকল্পে প্রমাণিত করি, যেমন মধুসূদন করেছিলেন পদ্ম ও তার মৃণালের সঙ্গে পুত্র ও হৃদয়ের তুলনা করে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলীতে শব্দের দ্বারা উপলব্ধিকে দৃশ্যমান করবার উদা-হরণ প্রচুর পাওয়া যাবে। পদকর্তা গোবিন্দদাস লিখলেন, "নখর খোয়ায়লুঁ দিবস লিখি লিখি"-এর অর্থ, পথের ধূলায় তার আগমনের অপেক্ষায় দিবস গণনার চিহ্ন রাখতে করনখ ক্ষয় হ'ল। বিদ্যাপতি লিখলেন,

"লোচন-লোর তটিনী নিরমাণ"

অর্থাৎ নয়নের জলে নদী নির্মিত হয়েছে। বিদ্যাপতিতে আরো আছে

"অতি খিন তনু জনু কাঞ্চন রেহা।"

অর্থাৎ নিকষে কাঞ্চনের রেখার মতো উজ্জ্বল ক্ষীণ শরীর। গোবিন্দ-দাসের অন্য একটি পদে আছে,

"শুভ-সূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত।"

অর্থাৎ কল্যাণের অথবা উল্লাসের সমস্ত চিহ্নগুলো তার সমস্ত অঙ্গ-রেখায় ব্যক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ গানেও আমরা দৃশ্যমানতার নিদর্শন পাই যেমন

ভুসুকুর একটি পদে আছে—

"তরংগতে হরিণার খুর নদীসঅ।"

অর্থাৎ দ্রুত ধাবমানতার জন্য হরিণের ক্ষুর সঞ্চালন দেখা গেলনা। কৃষ্ণাচার্যের একটি পদে আছে—

"গন্ধ পরসরস জইসোঁ তইসোঁ।
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসোঁ।"

অর্থাৎ গন্ধ, স্পর্শ রস যেন নিদ্রাবিহীন স্বপ্নের মতো।

দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন কবিগণও উপলব্ধিকে প্রকাশ করবার জন্য দৃষ্টির সীমারেখাকে প্রসারিত করেছেন এবং দৃষ্টিতে আবদ্ধ অথবা দৃষ্টির দ্বারা নির্মিত চিত্রকল্পের দ্বারা হৃদয়ের অনুভূতিকে সুসজ্জিত করে ব্যক্ত করেছেন। তুলসীদাসের একটি পদে আছে।

"সসিকর সম সুনি গিরা তুমহারী।
মিটা মোহ সরদাতপ ভারী।"

অর্থাৎ শরৎকালে দিনের তাপ যেমন চাঁদ উঠলে দূর হয় তেমনি আমার মোহরূপ শরৎকালের সূর্যতাপ তোমার চাঁদের কিরণের মতো কথায় দূর হ'ল।

গৌতম বুদ্ধ চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করার কথা বলেছেন। কবির কাছে এ শুভ নিমিত্ত হচ্ছে অকস্মাৎ বিস্মিত নয়নে পৃথিবীর রূপ দর্শন করে আনন্দকে আবিষ্কার। অবশ্য মনে রাখতে হবে, কবির একটি দেখা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন চিত্তের এবং নয়নের প্রত্যয় সম্মিলিত হয়। নয়নের প্রত্যয় ছাড়া বস্তু দর্শনে চিত্ত অক্ষম, আবার চিত্তের উপলব্ধি ছাড়া নয়ন একাকী রূপ দর্শন করতে পারেনা। আমরা পূর্বে শ্রবণের কথা, আঘ্রাণের কথা, স্পর্শের কথা, দেখার কথা, স্বাদের কথা বলেছি। এই দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন, এ সব প্রত্যয় সম্মিলিত হয়ে যখন চিত্তক্ষেত্রে জাগরিত হয়, একজন সফলকাম কবি সেই জাগরণকেই প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র পাঁচ সংখ্যক কবিতায় অনেকগুলো চিত্র উপস্থিত করে ধ্বংস ও গ্লানি-অতিক্রান্ত একটি শান্তির উষালগ্নকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কবির বক্তব্য, বিপর্যয় এবং বিপাকের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই আমাদের সকল সন্দেহের অবসান ঘটবে,

দৈন্য দূর হবে এবং সফলতা আসবে। এই দার্শনিক বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়েছে কয়েকটি চিত্র-পরম্পরার কারণে। প্রথম স্তবকের চিত্রটি হচ্ছে একটি বিপুল ঝড়ের রাত্রে একাকী একটি নৌকা বিরাট সাগর পার হবার চেষ্টা করছে। এই চিত্র নির্মাণ করতে যেয়ে কবি নৌকার পালের কথা বলেছেন, সাগরের উজ্জ্বল ঢেউয়ের কথা বলেছেন, দিগন্তে অন্ধকারে আকাশ এবং সাগরের একাকার হওয়ার কথা বলেছেন। দ্বিতীয় স্তবকে ঘাটের কথা আছে, পূজার আঙ্গিনার কথা আছে এবং এই ঘাট ও পূজার আঙ্গিনার কথা বলে কবি একটি সংশয়কে উপস্থিত করেছেন যে নৌকো সমুদ্র-পথে বিক্ষোভের মধ্যে ছুটে চলেছে সেকি ঐ পূজার আঙ্গিনায় এসে থামবে, অথবা তীরে ভীড়বে? তৃতীয় স্তবকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ হাতে করে অগ্রসর হওয়ার কথা আছে এবং গলায় মালা পরিয়ে দেওয়ার কথা আছে। চতুর্থ স্তবকে একটি গৃহকক্ষের বর্ণনা আছে যার ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে কম্পমান দীপের আলো দেখা যায় এবং সে ঘরে যারা আছে বাতাসের তাড়-নায় তাদের চুল এলোমেলো। এ-ভাবে বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে কবি তাঁর বক্তব্যক সুচিহ্নিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। পরস্পর সংলগ্ন এই রকম কয়েকটি চিত্রকল্প নির্মিত না হলে কবির বক্তব্য সুস্পষ্ট হ'তনা। এখানে মূলতঃ কবি প্রশ্রয় দিয়েছেন দৃষ্টিকে। দৃষ্টির অঙ্গীকারে যে দৃশ্যগুলো আবদ্ধ হয়েছে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সেই দৃশ্যগুলো কবির সহায়ক হয়েছে। এমনি আবার 'বলাকার'' ছয় সংখ্যক কবিতার প্রস্তাবনায় কয়েকটি দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে—পটে আঁকা ছবি, নিহারিকালোক, আকাশ, মশাল হাতে যাত্রীদল এবং আকাশে বিস্তীর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জ। চোখের দেখার দ্বারা চিহ্নিত এ-সমস্ত চিত্রের মাধ্যমে কবি একটি পুরোনো ছবির তাৎপর্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন।

আবেগকে শিল্পে রূপ দিতে যেয়ে কবিরা তার একটি বস্তুগত সম্পর্ক নির্মাণ করেন, ইংরেজীতে যাকে বলে অবজেকটিভ কোরিলেটিভ, অর্থাৎ এমন কতকগুলো বস্তু বা ঘটনা কবিকে নির্মাণ করতে হয় যা বিশেষ আবেগকে সমর্থন করে অথবা প্রকাশ করে। এ সব ক্ষেত্রে দৃশ্যগোচর বস্তুটি প্রধান নয় কিন্তু দৃষ্টির সমর্থনে জাগ্রত আবেগটি প্রধান। উদাহরণ-স্বরূপ শেকসপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। লেডী ম্যাকবেথ যখন স্বপ্নে ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছেন তখন কবি মানুষের

কতকগুলো দেহগত অনুভূতির চিত্র নির্মাণ করে লেডী ম্যাকবেথের মানসিক যন্ত্রণাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। লেডী ম্যাকবেথ ঘরের মেঝেতে রক্তের কথা বলেছেন, হাতে রক্তের গন্ধ পাচ্ছেন বলে সে গন্ধ দূর করবার জন্য আরব দেশের সুগন্ধি দ্রব্যের উল্লেখ করছেন। এ-ভাবে বিচিত্র উপলব্ধিগ্রাহ্য দৃশ্য নির্মাণ করে শেকসপীয়র লেডী ম্যাকবেথের চিত্তসঙ্কটকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এসব ক্ষেত্রে কবির লক্ষ্য হয় বাইরের দৃশ্যমান ঘটনাগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা যাতে একটি বিশেষ আবেগ জাগ্রত করবার জন্য তা যথোপযুক্ত হয়। টি. এস. ইলিয়ট বলছেন—

"The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an 'objective correlative'; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked. If you examine any of Shakespeare's more successful tragedies, you will find this exact equivalence; you will find that the state of mind of Lady Macbeth walking in her sleep has been communicated to you by a skilful accumulation of imagined sensory impressions; the words of Macbeth on hearing of his wife's death strike us as if, given the sequence of events, these words were automatically released by the last event in the series. The artistic 'inevitability' lies in this complete adequacy of the external to the emotien"

আবেগকে এ-ভাবে দৃষ্টির সাহায্যে প্রমাণিত করা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কৌশলের একটি প্রধান দিক ছিল। 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "তুমি নিজেকে কিছুতেই গোপন করতে পারবেনা কেননা যে হৃদয়কে তুমি আড়াল করতে চাচ্ছ সে হৃদয় তোমার চোখে ধরা পড়েছে। কবিতার প্রথম স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"আপনারে তুমি করিবে গোপন
কী করি।
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।

আজ আসিয়াছ কৌতুকবেশে,
মানিকের হার পরি এলোকেশে,
নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়পুলিনে।
ভুলি নে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,
ভুলি নে চতুর নিঠুর বাক্যে
ভুলি নে।
করপল্লবে দিলে যে আঘাত
করিব কি তাহে আঁখিজলপাত।
এমন অবোধ নহি গো।
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো।"

এখানে অনেকগুলো চোখের দেখা সম্মিলিত হয়ে একটি অনুভূতি রূপ লাভ করেছে। তিনি এখানে মানিকের হার গলায় পরে নয়নে হাসি রেখে কৌতুক বেশে একজন রমণী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এ দৃশ্যটি উন্মোচন করেছেন। লক্ষ্যটা এই দৃশ্য নির্মাণ করা নয়, লক্ষ্য হচ্ছে এই দৃশ্যকে অবলম্বন করে একটি অনুভূতিকে প্রকাশ করা। 'উৎসর্গে'র অন্য একটি কবিতায় কবি তাঁর মনোহরণকে তাঁর দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে বলছেন যেন তিনি তাকে অনুভব করতে পারেন। কবিতাটি নিম্নরূপ—

"দেখো চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
আর কোরো না দেরি।
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরণ,
দাঁড়াও, তোমায় হেরি।"

এ-ভাবে আমরা যতই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতাগুলো পরীক্ষা করবো, আমরা দেখবো যে চোখের দেখা কবির কাছে অশেষ মূল্যবান এবং তিনি হৃদয়কে দৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন। ঠিক একই স্বভাব আমরা

ইংল্যাণ্ডের কবি কীট্‌স্‌-এর মধ্যে লক্ষ্য করি। কীট্‌স্‌ তাঁর বিভিন্ন অনুভূতিকে বিচিত্র চিত্রপরম্পরায় উন্মোচিত করেছেন এবং কবির অনুভূতিগুলি শুধু মাত্র যে দেখার অনুভূতি তাই নয় তা স্পর্শের ও ঘ্রাণেরও। কীট্‌স্‌ তাঁর একটি সনেটে কয়েকটি দৃশ্যের সাহায্যে একটি প্রণয়-নিষ্ঠার আবেগ নির্মাণ করেছেন। আকাশের তারার দিকে লক্ষ্য করে কবি বলছেন, "হে উজ্জ্বল তারকা, আমি যদি তোমার মতো চিরস্থায়ী রূপে আকাশে জ্বলজ্বল্যমান থাকতাম এবং যেভাবে তুমি তোমার চক্ষুপল্লব চিরকাল উন্মোচিত রেখে সমুদ্র তরঙ্গ লক্ষ্য করো অথবা পর্বতের শিরোদেশে জমাট বরফ লক্ষ্য করো অথবা প্রান্তরকে লক্ষ্য করো, সেভাবে চিরকাল আমি আমার প্রেমিকাকে অনন্ত আবেশে গ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমি আমার প্রেমিকার কম্পমান পরিপূর্ণ বক্ষকে উপাধান করে শুয়ে আছি এবং অনবরত একটি মধুর অস্থিরতায় জেগে উঠছি। এ-ভাবেই চিরকাল বেঁচে থাকা আমার কাম্য, অন্যথায় মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়।" কবিতাটি প্রেমের একনিষ্ঠতার ব্যঞ্জনা বহন করছে এবং কবি কয়েকটি বাস্তব দৃশ্যের সাহায্যে এই ব্যঞ্জনাকে নির্মাণ করেছেন। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করছি:

Bright star, would I were steadfast as thou art—
Not in lone splendour hung aloft the night,
And watching, with eternal lids apart,
Like nature's patient sleepless Eremite,
The moving waters at their priestlike task
Of pure ablution round earth's human shores,
Or gazing on the new soft-fallen mask
Of snow upon the mountains and the moors—
No—yet still steadfast, still unchangeable,
Pillow'd upon my fair Love's ripening breast,
To feel for ever its soft fall and swell,
Awake for ever in a sweet unrest,
Still, still to hear her tender-taken breath,
And so live ever,-or else swoon to death."

অন্যান্য যে সকল অনুভূতির কথা কবি বলেন, যেমন স্পর্শের অনুভূতি, আঘ্রাণের অনুভূতি ইত্যাদি, সেগুলোও মূলতঃ রবীন্দ্র-কাব্যে দেখার অনুভূতি

থেকে উৎসারিত। যেমন কবি কীট্‌স্ 'The Eve of St. Agnes'' কবিতায় ম্যাডেলিন-এর শয্যা-কক্ষের একটি অপূর্ব বর্ণনায় স্পর্শ-তাপের একটি অনুভূতিকে দৃশ্যমান ঘটনা-চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কবি বলছেন, ম্যাডেলিন একে একে তার কেশ-গুচ্ছ থেকে মুক্তাগুলো খুলে রাখলো এবং একে একে উষ্ণ-অলঙ্কারগুলো দেহ থেকে মুক্ত করলো। উষ্ণ অলঙ্কার এ কথাটায় আমরা একটি রমণীদেহের উষ্ণতার ব্যঞ্জনা পাই, এই ব্যঞ্জনাটি একটি দৃশ্যমান রূপকল্পের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে।

"Anon his heart revives : her vespers done,
Of all its wreathed pearls her hair she frees ;
Unclasps her warmed jewels one by one ;"

অনুরূপ স্মরণীয় কিছু পংক্তি রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় পাওয়া যাবে। 'বিজয়িনী' থেকে একটি নিদর্শন উপস্থিত করছি—

"তীরে শ্বেতশিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিতগৌরব
অনাদৃত—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে—আয়ুপরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে। নূপুর রয়েছে পড়ি,
বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।"

উপরের উদ্ধৃতিতে আমরা একটি যৌবনবতী রমণীর স্নানের প্রস্তুতি-পর্বের একটা দৃশ্য উন্মোচিত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। শুধু মাত্র দৃশ্যটাকে প্রকাশ করা কবির উদ্দেশ্য নয়, এই দৃশ্যের সাহায্যে কবি যৌবনের উষ্ণতা এবং কামনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এখানে একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে কয়েকটি অনুভূতি রূপ লাভ করেছে। চিত্র নির্মাণ করা কবির উদ্দেশ্য ছিলনা, কবির উদ্দেশ্য ছিল যৌবনের আবেশকে হিল্লোলিত করা এবং চিত্রের সাহায্যে তা সম্ভবপর হয়েছে। 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটিতে একটি উদ্দেশ্যহীন যাত্রার আনন্দ এবং

দীপ্তি কবি প্রকাশ করেছেন কয়েকটি চিত্রের মাধ্যমে। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে কবি পশ্চিম দিগন্তে যেখানে সূর্য অস্ত যায়, সেখানকার দৃশ্য অঙ্কন করে সেই অপরিচিত এবং বিস্ময়কর দেশে তিনি তাঁর কল্পনার রমণীর সঙ্গে যাত্রা-শেষে উপস্থিত হবেন কিনা সেই প্রশ্ন করেছেন। এই বর্ণনায় সন্ধ্যার বিবরণটি অপূর্ব সুন্দর :

"বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায়
অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
জ্বলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিকবধূ যেন ছলছল আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
উর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে।"

এখানে কয়েকটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভাসছে, একটি হচ্ছে দিগন্তে যেখানে আকাশ সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে সেই দৃশ্যটি, অন্য একটি দৃশ্য হচ্ছে অগ্নির—সূর্য ডুবে যাচ্ছে সেই অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা দেখে কবির মনে হচ্ছে আকাশ যেন অগ্নি শিখায় গলে গলে পড়ছে, অন্য একটি দৃশ্য হচ্ছে অশ্রুসজল একটি রমণীর—কবি দিগন্তকে রমণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্য একটি দৃশ্য হচ্ছে পর্বতের চূড়ায় মেঘের ঘনঘটা। এই কয়েকটি দৃশ্যের সাহায্যে কবি একটি অপরিচিত রহস্যময় রোমাণ্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। সবক'টি দৃশ্যই দৃষ্টির সাহায্যে আমাদের অনুভূতিতে সাড়া জাগায়। 'সোনার তরী'র "কণ্টকের কথা" কবিতায় কবি কণ্টকের বক্তব্য হিসাবে বলছেন, "আমাকে তোমরা তোমাদের চোখের

দৃষ্টি দিয়ে দেখনা। তোমাদের রূপ আছে, তোমাদের শাখা আছে, ফুল আছে এবং ফল আছে। আমি রিক্ত ও ক্ষুদ্র, তবু আমার অস্তিত্ব আছে।" কথাটি কবিতা হিসাবে এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও আমি তা উল্লেখ করছি তার কারণ রবীন্দ্রনাথ এখানেও চোখের দেখাটার উপর বিশেষত্ব দান করেছেন।

জার্মান কবি রীলকে তাঁর সময়কার একজন তরুণ কবিকে একটি পত্র লিখেছিলেন, "তুমি তোমার মধ্যে আত্মস্থ হও এবং যে উৎস থেকে তোমার জীবন জেগেছে সে উৎসের গভীরতাকে নির্ণয় কর। সৃষ্টি-ধর্মী শিল্পীর জন্য প্রয়োজন একটি নিজস্ব বিশ্ব সংস্থা, যে সব কিছু নিজের মধ্যে পাবে এবং প্রকৃতির মধ্যে পাবে যে প্রকৃতির সে নিগূঢ়তম অংশ। তুমি তোমার একাকীত্বকে ভালবাসতে শেখ এবং সুসংগত আর্তনাদে সেই এককীত্বের বেদনাকে প্রকাশ কর।" রীলকে এখানে পৃথিবীকে অস্বীকার করার কথা বলছেননা কিন্তু কবির নিজস্ব বক্তব্য তাঁর চিত্তের নিভৃত কক্ষ থেকে উৎসারিত হোক তাই তিনি চাচ্ছেন। তাই কবি দৃশ্যমান চিত্র যখন নির্মাণ করেন তখন সেই চিত্রের সাহায্যে তাঁর অন্তরের গভীরতম চিন্তাকে প্রকাশ করেন অথবা উপলব্ধির নিগূঢ়তম ব্যঞ্জনাকে চিহ্নিত করেন। এখানে আমি ইয়েট্‌স্‌-এর একটি বক্তব্যকে উপস্থিত করবো। ইয়েট্‌স্‌ বলছেন যে রান্নাঘরের আঙ্গিনা পরিকার করা অথবা সকল ঋতুতে বুড়ো ভিখারীর মতো পথের পাথরভাঙ্গা খুব কঠিন কাজ নয়। কঠিনতম কাজ হচ্ছে অন্তরের নিভৃততম অঞ্চল থেকে সঙ্গীত নির্মাণ করা--

"Better go down upon your marrow-bones
And scrub a kitchen pavement, or break stones
Like an old pauper, in all kinds of weather ;
For to articulate sweet sounds together
Is to work harder than all these, and yet
Be thought an idler by the noisy set
Of bankers. schoolmasters, and clergymen
The martyrs call the world."

কবির জন্য এই নিভৃতলোক হচ্ছে সেই একাগ্র একান্ত অঞ্চল যেখান থেকে কবি তাঁর অনুভূতি এবং মর্ম-বস্তুকে উদ্ধার করেন এবং এই

মর্ম-বস্তু বা অনুভূতিকে উদ্ধার করতে যেয়ে কবিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য অনেক চিত্র-কল্প নির্মাণ করতে হয়। যেমন ধরা যাক 'বর্ষশেষ' কবিতাটি। কবিতাটিতে একটি বিশেষ মর্ম-বস্তু আছে। সেই মর্ম-বস্তু হচ্ছে মানব জীবনের জীর্ণতাকে অস্বীকার করে জীবনের চিরন্তন গতিধারাকে স্বীকৃতি এবং এই যে জীবনের গতিধারা, একে আবিষ্কার করা যায় একমাত্র ধ্বংসের মধ্যে। এভাবে কবি ভাবছেন, ভয়ঙ্কর ধ্বংসের মধ্যে মাধুর্য ও সজীব প্রাণের আশীর্বাদ আছে। এই বোধটাকে অথবা মর্ম-বস্তুকে প্রকাশ করবার জন্য কবি বিভিন্ন চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। যেমন "ঈশানের পুঞ্জ-মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে বাধাবন্ধহারা", "গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া হানি দীর্ঘধারা", "ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য হোক তবে", "রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজ-সম গর্বিত নির্ভয়।" এই চিত্রকল্পগুলো কতকগুলো অনুভূতির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে। অনুভূতিগুলো হচ্ছে উৎসাহ, হর্ষ, বিস্ময়। একটি প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে নতুন জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে. এই আবির্ভাবের প্রকাশ এমন একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যাতে হর্ষ প্রমাণিত হয়, যেমন 'ঝড়ের নূপুর পরে কালবৈশাখী নৃত্য করছে'। এ কথা কবি বলছেন নতুনের আবির্ভাবের কারণে যে হর্ষ সেই হর্ষের উপলব্ধির প্রকাশের জন্য, এবং এখানে একটি ভয়ঙ্কর এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি মধুর, এ-দু'টি বিপরীত আবেশেরও পরিচয় আছে। আমরা দেখি যে চিত্তের যে বিশেষ বিশেষ অনুভূতি সে অনুভূতির জন্য কবিকে বাইরের কতকগুলো অভিজ্ঞতা অথবা ঘটনা অথবা কতকগুলো দৃশ্য নির্মাণ করতে হয়েছে যেগুলো চিত্তের মর্ম-বস্তুকে সমর্থন করে। এই সমস্ত দৃশ্য নিজস্ব রূপে মহিয়ান কখনও নয়, এ-গুলো চিত্তের বিশেষ অনুভূতি বা রসাবেশ সৃষ্টির জন্যই মূল্যবান।

আমরা যদি কবিতার চিত্রকল্পগুলো অনবরত দৃষ্টির সম্মুখে রাখি তাহলে বিভ্রান্ত হব। তার কারণ, কবির উদ্দেশ্য কখনও কতকগুলো চিত্র নির্মাণ করা নয় বরঞ্চ চিত্রের সাহায্যে কতকগুলো মানসিক অনুভূতিকে রূপ দেওয়া। এই চিত্রগুলো হচ্ছে অনুভূতি, নির্মাণের জন্য একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া। মনে রাখতে হবে যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অধিকাংশ শব্দই বস্তুর সম্পর্ক থেকে তৈরী হয়েছে। কবিতায়

একজন কবি শব্দের সমস্ত প্রতীকী ব্যঞ্জনা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে থাকেন এবং এর সাহায্যে আমরা আমাদের মানসিক অবস্থাকে অনুভব করতে শিখি।

একটি সংলাপে যেমন দু'টি পক্ষ থাকে তেমনি একটি বক্তব্যেরও দু'টি পক্ষ থাকে—যিনি বক্তব্য রাখছেন এবং যিনি তা গ্রহণ করছেন বা শুনছেন। এদের উভয়কেই সতত পরিবর্তনশীল বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে স্থায়ী হচ্ছে ভাষার স্বভাব এবং তার ধ্বনি ও শ্রোত্রগত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। আধুনিক ইংরেজী কবিতায় যে বিস্ময়কর চিত্র ও ধ্বনি-বিপর্যয় আমরা লক্ষ্য করি— যাকে বলা যায় স্বরহীন, দ্বিধাগ্রস্ত, গাছের বিশুষ্ক পীতপত্রের মতো আনত, কখনও উদ্দেশ্যহীন দ্রুততায় অধীর—তা এমন একটি পৃথিবীর পরিচয় বহন করে যে পৃথিবীতে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ভেঙ্গে গেছে এবং যেখানে মানুষের পদক্ষেপ অর্থহীনতায় যেন উৎসর্গীকৃত। রবীন্দ্রনাথের কালে এহেন অর্থহীনতার অনুভূতি আমাদের দেশের মানুষের ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ নিজে একটা সঙ্গতি এবং সমৃদ্ধির রাজ্যে বাস করতেন এবং তাঁর কবিতার মর্মমূলেও সেই সমৃদ্ধি এবং সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তাই বিভিন্ন চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি কেন্দ্রীভূত যুক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন যে যুক্তির সাহায্যে আমরা সমস্ত কিছুকে সুশৃংখল, সমৃদ্ধ এবং আনন্দময় রূপে পাচ্ছি। এই সুশৃংখল আনন্দরূপের প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃশ্যগোচর প্রকৃতির রূপবিবর্তন থেকে। এর একমাত্র কারণ হ'ল পৃথিবীতে মানব জীবনের ক্ষণিকতার তুলনায় একমাত্র প্রকৃতিই তুলনামূলকভাবে চিরস্থায়ী। গাছ বলি, আকাশ বলি, নদী বলি, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির বর্ণ পরিবর্তনের কথা বলি, সবকিছু মানুষের দৃষ্টিতে চিরকালীন। একমাত্র মানুষই অস্থির এবং সতত চঞ্চল। মানুষের বিভিন্ন কর্মের মধ্যেও আমরা এই চঞ্চলতা এবং পরিবর্তন লক্ষ্য করি। যেমন ধরা যাক বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার। এগুলো অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এককালের বিজ্ঞান অন্য কালে মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। যে সমস্ত শ্রমজীবীরা কারখানায় কাজ করে, যন্ত্রের কলা-কৌশলের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের কর্ম-কৌশলেরও পরিবর্তন ঘটে। তাই কবিতায় যন্ত্র এবং বিজ্ঞানের উপমা সাময়িক হতে বাধ্য। একমাত্র প্রকৃতির উপমার ক্ষেত্রে একটি চিরন্তনতা ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের পরিচয় সূত্রে আমরা 'মুক্তধারা' নাটকের উল্লেখ করতে পারি। এই প্রতীক নাটকে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রের প্রতাপকে মানুষের জন্য গ্লানিকর ভেবেছেন, তাঁর কাছে চিরস্থায়ী সুখ এবং আনন্দ হচ্ছে প্রকৃতির সজীবতা এবং জমির উর্বরতা। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে যন্ত্র একটি অহমিকা সৃষ্টি করে এবং এই অহমিকার কারণে মানুষের যথার্থ স্বরূপ যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মাধ্যমে ধরা পড়েনা। "মুক্ত-ধারা"য় একটি বিশেষ রূপকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এ কথাটি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। রূপকটি হচ্ছে জলস্রোতের। বর্ষাকালে জলস্রোত প্রবাহিত হয়ে ভূমিকে উর্বরা করে যার ফলে সবুজ শস্যক্ষেত্রে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়। কিন্তু যন্ত্র সেই স্রোতকে বাধা দিয়ে তার থেকে শক্তি নির্মাণের চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় এর ফলে মানুষ বিকল হয় এবং প্রবল হয় যন্ত্রের প্রতাপ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসকে পৃথিবীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা এ-কালে প্রয়োগ করবোনা, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসকে আমরা মর্যাদা দেব, কেননা এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি চিরন্তন সত্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন যে সত্য বলে যে, মানুষ মানুষের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে মমতা-বন্ধনে আবদ্ধ থেকেই তার চিরকালীন মানব স্বভাবের প্রতিষ্ঠা ঘটায়।

রবীন্দ্রকাব্যে আমরা লক্ষ্য করছি যে কবি যে সমস্ত চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন সেগুলো চোখের দেখা থেকে উদ্ভূত। তাই সেগুলোকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যকল্প আখ্যা দিতে পারি। এই দৃশ্যকল্প বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবি তাঁর বিশেষ কল্পনাকে এবং হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করে-ছেন। কথাটি ঘুরিয়ে এভাবেও বলা যায় যে একটি বিশেষ পরিবেশে একটি অনুভূতির সচলতায় কবি তাঁর কল্পনাকে দৃশ্যরূপ দান করেছেন। একটি সাধারণ উদাহরণ উপস্থিত করছি। "কল্পনা" কাব্যগ্রন্থের "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে", এই চরণটিকে বিশ্লেষণ করা যাক। নৃত্যরত ময়ূরকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের চোখের সামনে সঙ্গে সঙ্গেই একটি নর্তনশীল ময়ূর ভেসে উঠবে এবং তাঁদের মনে হবে যে ময়ূরের এই নর্তনের মধ্যে আনন্দ আছে। অর্থাৎ কবি এই দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ের আনন্দ-উদ্বেলতাকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন। তিনি তাঁর হৃদয়কে নর্তনশীল ময়ূরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এভাবেই কবিচিত্তের আনন্দের

একটি অনুভূতি দৃশ্যরূপ গ্রহণ করে আমাদের দৃষ্টির সামনে জেগে উঠেছে। কবি যা দেখেছেন সেই প্রত্যক্ষ দেখাকে মনের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে তাতে একটি নতুন ব্যঞ্জনা দান করেছেন। তাই এই দৃশ্যকল্প বা চিত্রকল্প একটি বিশেষ দেখার ভিত্তিতে গড়া। অথবা ধরা যাক "সোনার তরী" কাব্যের "যেতে নাহি দিব" কবিতাটির নিম্নে উদ্ধৃত চরণ ক'টি—

"তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে।"

এখানে তরুশ্রেণীর একটি দৃশ্য, রাজপথের বিস্তারের একটি দৃশ্য এবং গাছগুলোর ছায়ার দৃশ্য একত্রিত হয়ে একটি নির্জন উদাসীন প্রহরের সংবাদ বহন করছে এবং এই উদাসীনতাকে উপলক্ষ্য করে কবি একটি বিদায়ের বেদনাকে মূর্ত করতে চাচ্ছেন। আমরা দেখতে পাই যে এখানে যে ক'টি চিত্র মিলে একটি রূপকল্প গড়ে উঠেছে তা সাধারণ জীবনের অন্তর্গত সন্দেহ নয় কিন্তু এর মধ্যে কবি-হৃদয়ের বিশেষ অনুভূতি নব ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে আমাদের বিস্মিত করেছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এখানকার চিত্রকল্পের একটি আশ্চর্য যথার্থতা আছে। 'সোনার তরী'র "বৈষ্ণব কবিতা"য় কবি বলছেন, "আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে রেখেছিল মগ্ন করে"। এখানে সাগরের অতলে ডুবে যাওয়ার একটি চিত্র আছে, কিন্তু সেই চিত্রের মাধ্যমে কবি মানব-হৃদয়ের প্রেমের গভীরতার চিহ্ন রেখেছেন। এখানে আমরা দেখছি একটি বাস্তব দৃশ্যগত উপমার সাহায্যে কবি-হৃদয়ের প্রেমাকুলতার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। এই কবিতায় অন্যত্র আবার সমুদ্রের উপমা এসেছে—

"সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটিরে
আপনার তরে।"

এখানে জলপূর্ণ ঘট কাঁখে নিয়ে যে সব গ্রাম্যরমণীরা গৃহপানে যায়, বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির এই দৃশ্যকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে কবি

বৈষ্ণব কাব্যকে উৎসমূল ধরে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের কাব্যের ব্যঞ্জনার ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। কবি তাঁর আপন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়ের অনুভূতির সমর্থনসূচক যে সমস্ত চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন, বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তা সর্বাংশে নতুন, আকস্মিক এবং অসাধারণ। এই চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা পূর্বেই বলেছি, ইংরেজ কবি কীট্‌স্-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল আছে। To Autumn কবিতায় কবি অটামের রূপকল্প নির্মাণ করতে যেয়ে বলছেন :

"Who hath not seen thee oft amid thy store ?
Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary floor,
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind ;
Or on a half-reap'd furrow sound asleep,
Drows'd with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twined flowers :
And sometimes like a gleaner thou dost keep
Steady thy laden head across a brook ;
Or by a cyder-press, with patient look,
Thou watchest the last oozings, hours by hours."

কীট্‌স্ অবশ্য অটামের ভাব-ব্যঞ্জনা নির্মাণকল্পে মানুষের বিভিন্ন চিত্ররূপের সঙ্গে তাকে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর 'বসুন্ধরা' কবিতায় :

"সুদুর্গম দূরদেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে ;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা 'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়।
কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূরদূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে

চাহিয়া সম্মুখে; চারিদিকে শৈলমালা ;
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি।"

এখানে দেখা যায় কীট্স্-এর মতো রবীন্দ্রনাথও নিঃসর্গের উপর মনুষ্যতা আরোপ করেছেন। অর্থাৎ মানুষের যেমন চৈতন্য আছে যে চৈতন্যের কারণে মানুষ দৃষ্টিপাত করে, স্পর্শ করে, সচল হয়, ঠিক অনুরূপ চৈতন্য রবীন্দ্রনাথ নিঃসর্গের উপর আরোপ করেছেন, যার ফলে নিঃসর্গ নিশ্চেতন জড় পদার্থ থাকেনি, কিন্তু জীবনময় হয়েছে। এভাবে বিচার-বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে আমরা অনবরত দেখবো যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে দর্শনেন্দ্রীয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সবচেয়ে বেশী, রবীন্দ্রনাথের স্পর্শের অনুভূতি, আঘ্রাণের অনুভূতি, এগুলো যে নেই তা নয় কিন্তু প্রধান অনুভূতি হচ্ছে দর্শনের। অন্যান্য অনুভূতিগুলো দর্শনেন্দ্রীয়ের আবেগের সাহায্যে রূপ লাভ করেছে এবং অর্থ ব্যক্ত করেছে। যেমন ধরা যাক 'কল্পনা' কাব্যের 'অশেষ' কবিতাটি। কবি বলছেন :

"নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা,
সোনার আঁচল খসা,
হাতে দীপশিখা।"

এখানে দীপশিখা হতে একটি রমণী-প্রতিমার চিত্রের সংগে কবি সন্ধ্যার তুলনা করেছেন। 'রোগশয্যায়' বিশ সংখ্যক কবিতাটিতে মৃত্যুকে অতিক্রম করে যে অনন্ত জীবনের প্রকাশ তার স্বরূপ ব্যাখ্যাসূত্রে একটি দৃশ্যকল্প নির্মিত হয়েছে---পথযাত্রী উৎসব-মুখরিত একটি গৃহের বাইরের জানালা দিয়ে ভিতরের আলোর খণ্ডিত আভাস পাচ্ছে। এখানে ভিতরের উৎসব প্রাঙ্গণ হ'ল দেশহীন, কালহীন মৃত্যু-অতিক্রান্ত জীবন এবং পথ হ'ল এই পৃথিবী। এখানে মানুষ হ'ল শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন পথের যাত্রী। 'রোগশয্যায়' চার সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—

"অজস্র দিনের আলো,
জানি, একদিন
দুচক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।"

এখানে দৃষ্টির ঐশ্বর্যে তিনি যে আজীবন সমৃদ্ধ ছিলেন তার স্বীকৃতি আছে। এরই প্রমাণ-স্বরূপ অজস্র কবিতায় অসংখ্য উপলব্ধির পরিচিতি-রূপে কবি দৃষ্টি-সমর্থিত বহুবিধ চিত্র নির্মাণ করেছেন। আট সংখ্যক কবিতায় কবি মানুষের আচরণ এবং স্বভাব প্রকৃতির উপর আরোপ করে দৃশ্যমান মনুষ্য-মূর্তির মাধ্যমে একটি অনুভূতিকে চিত্রায়িত করেছেন। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি—

> "মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্মটিকা-পানে
> আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
> দিগন্তের মূকতারে তুলিছে তর্জনী।
> পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
> আকাশের ভালে,
> লজ্জা ঘনীভূত হয়,
> হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
> স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।"

বাইশ সংখ্যক কবিতা "সোনার তরী"র প্রথম কবিতাটির কথা চিত্রকল্পের সাজুয্যে মনে করিয়ে দেয়। এখানে কবি একটি নদীর চিত্র অংকন করেছেন—স্রোতবাহী নদী, যে নদীর স্রোতে অনেক কিছু ভেসে চলে যাচ্ছে। দৃশ্যটি নদীমাতৃক বাংলাদেশের অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য। "সোনার তরী"র প্রথম কবিতাটিতেই ধানকাটা শেষ করে শস্য বোঝাই নৌকো নদীতে চলে যাচ্ছে। এই উভয় দৃশ্যের মধ্যে একটি ঐক্য আছে। কবির বক্তব্য উভয় কবিতার ক্ষেত্রে একই। স্রোতের মধ্যে তাঁর যা কিছু ধন সব প্রবাহিত হয়ে গেল, তিনিই শুধু পৃথিবী থেকে ক্রমশ হারিয়ে গেলেন অর্থাৎ কবির সৃষ্টি বেঁচে রইল এবং প্রবাহিত থাকল যুগ যুগ ধরে। যা প্রবাহিত থাকল তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমিশূন্য আমি"। অত্যন্ত সহজে এবং সংগে সংগে নিগূঢ়ভাবে নদী, নদীর প্রবাহ এবং নৌকোর চিত্র-কল্পের মাধ্যমে কবি তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন। এমনি চিত্র-কল্প 'আরোগ্য' এবং 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থেও প্রচুর পাওয়া যায়। "আরো-গ্যে"র ছয় সংখ্যক কবিতায় প্রকৃতির উপর মানব-স্বভাব দান করে কবি মানুষের চিত্রমূর্তির মাধ্যমে একটি বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন। কবি

বলছেন, "আকাশ অনেক দূরে এবং সে আকাশ সুকুমার পাণ্ডুর এবং নীল। অরণ্য যেন ঊর্ধ্বে দুবাহু মেলে সেই আকাশকে তার অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। আবার অন্যদিকে মাঘের তরুণ রোদ পৃথিবীর উপর তার স্বচ্ছ আলোর উত্তরীয় বিছিয়ে দিল।" এভাবে আমরা ঊর্ধ্ববাহু অরণ্য এবং উত্তরীয় বিছিয়ে দেওয়ার মধ্যে মানবস্বভাবের দু'টি দৃশ্যকল্পকে প্রস্ফুটিত হতে দেখি। ঠিক একই রকম মানবিক চিত্রকল্পের মাধ্যমে তিনি প্রকৃতির একটি পরিচয় 'আরোগ্যে'র ত্রিশ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তিনি, দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, সন্ধ্যা আসছে, এই ঘটনার সংগে মানব জীবনের কর্মপ্রবাহ শেষে মৃত্যুতে তার যাত্রার তুলনা করেছেন। তুলনা করতে যেয়ে বলছেন যে দিবসের চক্ষু বুজে আসছে এবং সে যেন ধ্যানস্থ হয়েছে। সে ধ্যানস্থ হয়েছে অন্ধকার এবং আলোর সাগর-সংগমে নিজেকে নিমজ্জিত করবার জন্য। এমনি ভাবে 'জন্মদিনে'র এগারো সংখ্যক কবিতায় কবি নদী, নদীর তরংগ, তরংগ-শীর্ষে উৎক্ষিপ্ত জলকণার ফেনপুঞ্জ এবং অজস্র বুদ্‌বুদের কথা বলে একটি দৃশ্য নির্মাণ করে মানব জীবনের কাল-প্রবাহকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি পরিচিত গান আছে—"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে"। এখানে আমরা হৃদয়ের উল্লাসকে নৃত্যরতা রমণীর চিত্রকল্পে পরিদৃশ্যমান পাই। এর একটি তত্ত্বব্যাখ্যা 'শ্রাবণগাথার' রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। ব্যাখ্যাটি এই:—"সূর্যচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেলনা ষড়ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সুরলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর, সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিনাটিনী। মানুষের অংগে অংগে স্বর্গের আনন্দকে তরংগিত করবার ভার নিয়েছি আমরাই, তোমাদের মোহাচ্ছন্ন চোখে নির্মল দৃষ্টি জাগাব, নইলে বৃথা আমাদের সাধনা।"

আমরা দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যরূপময় চিত্র-নির্মাণে অসাধারণ পারদর্শী কিন্তু এই দৃশ্যের রূপময়তা ছাড়াও অন্যান্য যে অনুভূতি মানুষের আছে যাকে ইন্দ্রীয়জ অনুভূতি বলতে পারি, তারও পরিচয় রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যাবে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দৃশ্যগোচর রূপকল্পটি প্রাধান্য পেয়েছে। অথবা বলা যায় দৃশ্যগোচর রূপকল্পের মাধ্যমে তিনি ধ্বনি অথবা স্পর্শের

সংবেদনকে উপস্থিত করেছেন। যেমন ধরা যাক 'কল্পনা' কাব্যের "পিয়াসী" কবিতাটি। কবি লিখেছেন—

"নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাতবায়ে।"

এখানে উদগত তৃণের গন্ধ আমরা আঘ্রাণ করি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকালবেলায় বাড়ীর আঙ্গিনায় সবুজ ঘাসের দৃশ্যটিও চোখে ভাসে। অথবা "স্বপ্ন" কবিতাটি,

অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।"

আমরা এখানে অঙ্গের কুঙ্কুম গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে একজন যৌবনবতী রমণীর সাক্ষাৎ পাই যে নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যার দ্বারপ্রান্তে সোপানের উপর প্রতিমার মতো এসে দাঁড়িয়েছে। "পলাতকা" কাব্যে "পলাতকা" নামক কবিতাটিতে গন্ধের অনুভূতির একটি সুন্দর উপমা আছে—

"তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে উঠে আমের বোলের বাসে"

এখানে আম্রমুকুলের সুগন্ধ আমরা পাচ্ছি, সংগে সংগে গ্রীষ্মের আগমনের দৃশ্যটাও চোখের সামনে ভাসছে। খুব স্পষ্ট না হলেও পাঠকের পক্ষে কল্পনায় দৃশ্যটা নির্মাণ করতে অসুবিধা হয়না। অথবা ধরা যাক "আকাশপ্রদীপে"র একটি উদাহরণ—

"শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।"

যদিও এখানে গন্ধটার উপরে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন তবুও আমাদের চোখে সর্বপ্রথম শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা ভেসে উঠে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, স্পর্শের অনুভূতি, ঘ্রাণের অনুভূতি, স্বাদের অনুভূতি অথবা শ্রবণের অনুভূতি, এর কোনও অনুভূতিই একাএকা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারছেনা, এগুলো সবকিছুই চোখে দেখার সঙ্গে সংসক্ত হয়েই রবীন্দ্রকাব্যে প্রকাশিত। কবি 'কীট্স্' এ-কথাটাই সুন্দরভাবে বলেছেন "Ode to Nightingale" কবিতাটিতে। তিনি বলছেন রাত্রির অন্ধকারে যখন কোনও কিছু আমার চোখে পড়েনা তখন আমি অনুভব করে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করি। আমার

পায়ের কাছে কি ফুল আছে আমি দেখতে পাচ্ছিনা অথবা ঝোঁপ থেকে কোন ফুলের গন্ধ আসছে তাও দেখতে পাচ্ছিনা। আমি শুধু সুগন্ধ অন্ধকারে অনুভব করবার চেষ্টা করছি যে কোন্ ফুল কোথায় কি ভাবে বিকশিত হয়েছে। কীট্স্-এর বক্তব্যে একটি কথা খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে চোখে যখন কিছু দেখা যায়না তখন অনুভব করে বস্তুকে নির্ণয় করা যায় কিন্তু এই যে অনুভূতি, এই অনুভূতি দৃশ্যকল্পের সংগে সম্পর্কিত।

"পসারিনী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"দুগ্ধদোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে
আপনি জাগায়ে দিব কালি।"

এখানকার দৃশ্যটি শ্রবণগোচর কিন্তু তাও একটি দৃশ্যের মাধ্যমে উৎসারিত। দৃশ্যটি হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের ঊষালগ্নের। খুব সকালে উঠে গরু দুইছে এবং টিনের পাত্রে দুধ পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই দুগ্ধ পতনের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ দোহনের প্রক্রিয়ার চিত্রটিও আমাদের চোখের সামনে ভাসে। তেমনি ধরা যাক 'বর্ষশেষ' কবিতাটির একটি দৃশ্য। কবি এখানে কালবৈশাখীর একটা তুমুল কোলাহলকে শ্রবণগোচর করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শ্রবণগোচর করবার চেষ্টায় কথাগুলো দৃশ্যে উন্মোচিত হয়েছে, যে দৃশ্যগুলো অবলোকন না করলে কালবৈশাখীর তাৎপর্য্য অনুভব করা যাবেনা—

"বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকারঝঞ্ঝনা
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
ধাও গান, প্রাণভরা ঝড়ের মতন উর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।
আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে

ঝঞ্চার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।"

এমনি আবার স্পর্শের অনুভূতি যখন রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন তখনও কবি কীট্‌স্‌-এর মতো দৃশ্যময়তার মাধ্যমে তাকে প্রাণবন্ত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। "বিজয়িনী" কবিতার উদাহরণ পূর্বেই দিয়েছি। উক্ত কবিতাটির একটি চরণে আছে—

"সিক্ত তণু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে"

এখানে অঞ্চল দিয়ে গায়ের সিক্ততা মুছে ফেলবার মাধ্যমে কবি সিক্ততা এবং তপ্ততার আভাস এনেছেন। দেখা যাচ্ছে যে-কোনও ভাবেই হোকনা কেন রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যময়তার মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রীয়জ সকলপ্রকার অনুভূতিকে প্রকাশিত করবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা কাব্যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির কোনও পরিচয়লিপি নির্মিত হয়নি। মধুসূদনের কাব্যে কিছু কিছু দৃশ্যকল্প নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত কাব্যসাধনায় দৃশ্যময়তাকে বিচিত্রভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন এবং এভাবে বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের মাধ্যমেই প্রাণের সচলতা এবং সৌভাগ্য নির্মিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের চোখের দেখার অনুভূতিকে আমরা একই সঙ্গে দৃশ্যকল্প নির্মাণ এবং চিত্রকল্প নির্মাণ বলে অভিহিত করেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাখ্যাও দিয়েছি যে এই চিত্রকল্প বা দৃশ্যকল্প সর্বক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয় সংবেদন। অর্থাৎ যে ছবি কবি নির্মাণ করছেন সে ছবির সাহায্যে আমাদের চিত্তের বিভিন্ন অনুভূতি রূপ লাভ করছে, তাতে কখনও স্পর্শের অনুভূতি এসেছে, কখনও ঘ্রাণের অনুভূতি এসেছে, কখনও শ্রবণের, কখনও স্বাদের, কখনও মাত্র চোখে দেখার ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই চিত্রকল্পগুলো আমাদের হৃদয়ের কাছে বিশেষ বিশেষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যেমন 'বলাকা'র এই চরণটি—

"পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্যবিলাসে"

এখানে অস্পষ্টতা আছে ঠিক, কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করতে গেলে একটি স্পর্শের চেতনা সচল হয়। অন্য একটি উদাহরণ 'বলাকা' কাব্য-গ্রন্থ থেকে দিচ্ছি—

"শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।"

এখানে ধাবমানতার একটি চিত্র নির্মিত হয়েছে, কিন্তু স্পষ্টভাবে কোনও মানুষের ধাবমানতা অথবা নদীর স্রোতের প্রবাহ অথবা বাতাসের প্রবাহ কোনটারই চিত্র ধরা পড়ছেনা, কিন্তু সবকিছু স্পর্শ করে একটি গতির আবহ নির্মিত হয়েছে।

কবি যখন এই সমস্ত চিত্রকল্প নির্মাণ করেন তখন সূক্ষ্মব্যঞ্জনার সাহায্যে তাকে গভীর করেন, সজীব রাখেন এবং নতুন চেতনায় দীপ্ত করেন। তাহলে কথাটি দাঁড়াচ্ছে এই যে একজন কবি যখন একটি চিত্রকল্প নির্মাণ করছেন তখন তাতে সজীবতা দান করতে হচ্ছে, গভীরতা দান করতে হচ্ছে এবং আবেদনময় করতে হচ্ছে। যাকে ইংরেজীতে বলে 'ফ্রেশনেস', 'ইন্‌টেন্‌সিটি', 'ইভোকেটিভ্‌নেস'। এইযে ইভোকেটিভনেস শব্দটি ব্যবহার করা হলো, যাকে আমরা বাংলাতে বলছি আবেদনময়তা, সেই আবেদনময়তা প্রতিটি চিত্রকল্পে থাকতে হবে। এই আবেদনময়তা না থাকলে চিত্রকল্প প্রাণহীন এবং অবশেষে অর্থহীন হয়ে পড়ে। কবি অল্প পরিসরের মধ্যে অনেক গভীরতার সন্ধান দিয়ে থাকেন, এবং এই গভীর-তার সন্ধান দিয়ে থাকেন বলেই চিত্রকল্পটি নব নব বৈচিত্রে আবেদনময় হয়। একটি কবিতার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি, তা হচ্ছে 'বলাকার' "চঞ্চলা" কবিতা। এখানে গতির আবেগকে প্রকাশ করবার জন্য কবি নদীর একটি দৃশ্যকল্প নির্মাণ করেছেন—নদী এবং তার জলপ্রবাহ। এভাবে নদীর স্রোতের দৃশ্যকল্পের মধ্যে ভৈরবী এসেছে, নৃত্যরতা রমণী এসেছে। অর্থাৎ একই গতিভঙ্গীকে দৃশ্যমান করবার জন্য কবি গতিভঙ্গীতে কতকগুলো বিশিষ্টতা দান করতে চাচ্ছেন। এই বিশিষ্টতার মধ্যে উদাসীনতা এসেছে এবং দ্বিধাহীনতা এসেছে, এবং সমস্ত কবিতাটি পাঠ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চিত্তের কয়েকটি প্রগাঢ় অনুভূতি একটি দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে সুন্দর

ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তেমনি আবার 'বর্ষশেষ' কবিতায় আমরা দেখছি যে অনেকগুলো দৃশ্যের সমন্বয়ে কবি একটি নতুন জাগৃতি বা প্রেরণার আভাস নির্মাণ করেছেন। কবির একটি বিশেষ বক্তব্য কতকগুলো চিত্রকল্পে বিধৃত হয়ে একটি বিশেষ সজীবতায় প্রকাশিত হয়েছে। একই ভাবে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে বিশেষ চিত্রকল্পের সাহায্যে রূপায়িত করা যায় তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত কবি কীট্‌স্-এর 'ইসাবেলা' কবিতাটিতে পাওয়া যায়। প্রেমিক প্রেমিকা যখন একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে তখনকার ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে কবি বলছেন, যেন বসন্তের বাতাসে দু'টি যুগ্ম গোলাপ ফুল একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা যে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার কারণ তারা মিলিত হবে একটি গভীর সৌরভের মধ্যে। সেই সৌরভকে কবি বলছেন হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সৌরভ। চরণ ক'টি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল---

"Parting they seem'd to tread upon the air,
Twin roses by the zephyr blown apart
Only to meet again more close, and share
The inward fragrance of each other's heart.
She, to her chamber gone, a ditty fair
Sang, of delicious love and honey'd dart ;
He with light steps went up a western hill,
And bade the sun farewell, and joy'd his fill."

কীট্‌স্ পুরোপুরিভাবে দৃষ্টির সীমার মধ্যে দুইটি হৃদয়ের মিলনকে উপস্থিত করতে পারেননি, কিন্তু একটি বিশেষ কৌশলে দুটি হৃদয়ের সম্মেলনকে তিনি আমাদের উপলব্ধির মধ্যে এনে দিয়েছেন। এখানেই হচ্ছে কবির বিশিষ্টতা। তিনি যে দৃশ্যকল্প নির্মাণ করেন সেই দৃশ্যকল্প লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়বিধ ব্যঞ্জনায় মূল্যবান হয়। আর একটি কথা এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে কবিই একমাত্র দৃশ্যকল্প নির্মাণ করেন না, এই ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান পাঠকের দায়িত্ব আছে। কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান পাঠকের চিত্তে যদি সংবেদনশীলতা আসে তবেই কবির বক্তব্য যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হ'ল বলা যায়। এ কারণে বলা যায় যে কবি যখন কোনও দৃশ্যকল্প নির্মাণ করেন পাঠকের চিত্ত একই দৃশ্যকল্পে অথবা অনুরূপ দৃশ্যকল্পে সাড়া দেয়। অন্যভাবে এ কথা বলা যায় যে কবি যে

চিত্র নির্মাণ করছেন পাঠক তার দৃষ্টির সামনে সেই একই চিত্র বা অনুরূপ চিত্র নির্মাণ করেন। এভাবেই কবি এবং পাঠকের সম্মিলিত উপস্থাপনায় একটি দৃশ্যকল্প সার্থক হয়।

রবীন্দ্রনাথের দৃশ্যকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি কথা এ পর্যন্ত আমরা আলোচনার বাইরে রেখেছি তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ নিছক চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে চিত্রকলার কলা-কৌশলকে অনুসরণ করেছেন। আমরা জানি যে আলো এবং অন্ধকার একে অপরের বিপরীত। আলো এবং অন্ধকারের বিরোধাভাসের প্রয়োজন থেকেই রেখার জন্ম। আমরা যে কোনও শিল্পীর আঁকা ছবিতে দেখতে পাব যে কখনও অন্ধকার পটভূমিতে আলোকিত অংশ বস্তুর রূপকল্পে উদিত হয়েছে, আবার কখনও আলোকিত বা শুভ্র পটভূমিতে অন্ধকারকে বস্তুর আকৃতিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবা আমরা দেখবো যে বস্তুরূপে আলোকিত অংশ বা অন্ধকার অংশ সর্বাং আলোকিত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়—বস্তুকে বিশিষ্ট এবং গ্রাহ্য করবার জ আলোকিত অংশের মধ্যে মধ্যে কালো রেখা এবং অন্ধকার অংশের ম শুভ্র রেখা প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করা হয়েছে। এ-ভাবেই একজন শিল্প বৈপরীত্যের মাধ্যমে রেখা ও আকৃতিকে দর্শনীয় করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অধিকাংশই আলো এবং অন্ধকারের বৈপরীত্যের খেলা। "সোনার তরী" কবিতাটিতে দেখবো যে বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং নিম্নে অন্ধকার স্রোতোধারার মতো নদী—ছায়া এবং আলোকের সংমিশ্রণে এই চিত্রটি গঠিত হয়েছে, এখানে অন্য কোনও রং-এর ব্যবহার নেই। "শৈশব সন্ধ্যা" কবিতাটিতেও সন্ধ্যার অন্ধকার যখন একটি গ্রামে নেমে আসছে তখনকার চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন। এখানেও চিত্রগুলো আলো ও অন্ধকারের বৈপরীত্যে রূপ লাভ করেছে। "পরশ পাথর" কবিতাতেও আলো ও অন্ধকারের রূপকল্পে বিভিন্ন চিত্রের সমবায়ে গঠিত একটি বক্তব্য। শুধু সূর্যের উদয়কালের এবং সূর্যাস্তের আকাশের সোনার বর্ণের কথাও কবি বলেছেন। আমরা এটা দেখবো যে কবি রং-এর ব্যবহার করেছেন কখনও কখনও, কিন্তু তা এমন প্রবল নয় যে তা আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করবে। আলো এবং অন্ধকার একে অন্যের বৈপরীত্যে যত প্রবল অন্য বর্ণগুলো ততটা প্রবল নয়। আমরা দেখবো যে লাল, নীল, সবুজ এ তিনটি বর্ণ কখনও কখনও এসেছে কিন্তু তা এসেছে কখনও আলো এবং কখনও অন্ধকারের ললাটের

তিলক হিসাবে। "বৈষ্ণব কবিতা"টি আলোচনা করলে এই কথাটি খুব স্পষ্ট হবে। কবিতাটিতে শ্রাবণ রাত্রিতে কালিন্দি নদীর দৃশ্যের বর্ণনা আছে, বনের ছায়ায় যে নদীটি প্রবাহিত তার বিবরণ আছে অথবা বর্ষার দিনে কুটিরের প্রান্তে যে কদম্ব ফুটেছে তার বর্ণনা আছে। এ সব বর্ণনা গুলো আলো এবং ছায়ার। কবি ফুলের কথা বলেছেন বটে কিন্তু ফুলের রং-এর পরিচয় দেননি। একটি ফুলের কথাই আছে তা হচ্ছে কদম্ব ফুল। তারও মাত্র উল্লেখ আছে, বর্ণনা নেই। আর সাধারণভাবে কবি মানুষের কুটির কাননে যে পুষ্প ফোটে সেই পুষ্পের কথা বলেছেন কিন্তু তার বিশিষ্টতা চিত্রিত করেননি। এভাবে আমরা দেখবো যে "আকাশের চাঁদ" কবিতাতেও সকালে-বিকালে অযাচিত ফুলদল ঝরে পড়ছে এ কথা কবি বলছেন। কিন্তু "যে সে ফুল, তার আকৃতিই বা কি, তার বর্ণই বা কেমন তার পরিচয় নি আনেননি। "যেতে নাহি দিব" কবিতাটিতে আমরা দ্বিপ্রহরের বর্ণনা-ই। সে দ্বিপ্রহরে আমাদের দৃষ্টিতে ছায়াটা বড় প্রবল আকাংখিত হয়ে খাঁ দেয়; বিস্তীর্ণ আলোর মধ্যে এখানে গাছের ছায়া বড় মনোরম মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় সেই আলোছায়ার বিচিত্র বিন্যাস আমাদের দৃষ্টির সামনে এনেছেন। এই কবিতায় জীবনের উদাসীনতাকে রূপায়িত করবার জন্য কবি ছায়ার সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন। বলছেন—"রাজ-পথের উদাসীন তরুশ্রেণী সারাদিন আপন ছায়ার দিকে চেয়ে আছে।" "মানস সুন্দরীতে"ও আমরা দেখবো একই আলো এবং অন্ধকারের বৈপরীত্য—সায়াহ্ন-আলোকে শ্রান্ত রমণীর মতো বিস্তীর্ণ আঁচল বিছিয়ে পদ্মা শুয়ে আছে অথবা অন্ধকার নেমে আসছে চোখের পাতার মতো। এ-দু'টি চিত্রই আলো ও অন্ধকারের চিত্র। ফুলের কথা এই কবিতাটিতেও আছে কিন্তু সে ফুল হচ্ছে কোনও বিশেষ ফুল নয়, সকল ফুলের প্রতিনিধি বসন্তের ফুল। অনেক পরে "পত্রপুট" কাব্য যদি পরীক্ষা করি তবে সেখানেও আমরা এই আলো এবং অন্ধকারের বৈপরীত্যের রেখা দেখতে পাবো। "পত্রপুটে"র প্রথম কবিতাটিতে প্রমোদ-মুখর সঙ্গীতের সঙ্গে শৈলশৃঙ্গে উপনীত হবার কাহিনী আছে। সবাই মিলে শিখরদেশে যখন পৌঁছলেন তখন অপরাহ্নের অবসান হয়েছে এবং দৃশ্যগোচর চতুর্দিক ছায়ার মতো। একমাত্র রং-এর প্রলেপ এসেছে পশ্চিমের দিগ্বলয়ে স্বর্ণকান্তি সূর্যাস্তের ছবিতে। এ রংটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুই নম্বর কবিতায় কবি তাঁর

চিত্তের অবসর যাপনকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত করেছেন এবং পদ্মার উপর শরৎকালের শেষ প্রশান্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই দীর্ঘ কবিতায়ও আলো এবং ছায়ার বিচিত্র খেলা। কোথাও কোনও বর্ণ-বিন্যাস নেই। এখানে টগর, জুঁই, বেলী, শিউলী, মালতী এই সমস্ত ফুলের নাম আছে, কিন্তু কবিতাটিতে তারা বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্যতা পায়নি। চার নম্বর কবিতায় সবুজ মঞ্জরীর কথা আছে, শীতকালে সবুজের গায়ে হলুদের ইশারার কথা আছে আবার সোনার ফসলের কথা আছে। এ-গুলো রং-এর ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু কবিতার মূল বক্তব্যে আমরা দেখি ছায়া এবং আলো—

"মাস গেল।

তারপর মাঠের পথ দিয়ে
গোরু নিয়ে চলে রাখাল—
কোনও ব্যথা নেই তাতে, কোনো ক্ষতি নেই কারো।

প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশথ গাছ,
সূর্য-মন্ত্র-জপ-করা ঋষির মতো।
তারই তলায় দুপুরবেলায় ছেলেটা বাজায় বাঁশি
আদিকালের গ্রামের সুরে।
সেই সুরে তাম্রবরণ তপ্ত আকাশে
বাতাস হুহু করে ওঠে,
সে যে বিদায়ের নিত্যভাঁটায় ভেসে-চলা
মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায়না
এক দিনেরও জন্য।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা-সূত্রে আমরা দেখলাম যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের পৃথিবীতে চতুর্দিকে শুধু চোখে দেখার পুঞ্জীভূত সম্ভার। সজীব মানুষ তার বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে দৃষ্টির সাহায্যে অনবরত শুধু সঞ্চয় করছে—সঞ্চয় করছে আলো এবং অন্ধকার, সঞ্চয় করছে বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রজাল, সঞ্চয় করছে স্পর্শের কাতরতা, ভিজে-মাটির গন্ধ এবং আরো

কত কি। কবি এ সমস্ত সঞ্চয়কে দৃষ্টির কারুকার্যে মণ্ডিত করেন এবং তখন তা বিশেষ কোনও পরিমিতিতে আবদ্ধ থাকেনা, সে সকল সীমার বাইরে চলে যায়।

রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'র একটি গদ্য কবিতায় লিখেছিলেন, "সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।" এখানে কবি আলো এবং ছায়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বর্ণ-বিন্যাসের উপর নয়। 'বিথিকা' কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখি যে সেখানে বর্ণাঢ্যতা প্রকাশের প্রকৃত সুযোগ কবির ছিল কিন্তু সে সুযোগের তিনি ব্যবহার করেননি। অনেক ফুলের কথা এই কাব্যগ্রন্থে আছে যার সঙ্গে রং-এর অনভূতি স্বাভাবিকভাবে আসে কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেও কবি বর্ণবৈচিত্রের ব্যবহার করেননি। 'মাটি' কবিতায় একটি চরণ আছে "কৃষ্ণচূড়া শাখে ঝরে শ্রাবণের বারি।" এখানে কৃষ্ণচূড়া ফুলের লাল অথবা পীত বর্ণের কোনো প্রয়োগ নেই, শুধু একটি বড় গাছ শ্রাবণের ধারায় সিক্ত হচ্ছে এই খবরটুকুই আমরা পাই। যে মুহূর্তে খবরটুকু পাই সে মুহূর্তে অস্পষ্ট কুয়াশায় গাছের রেখাগুলো কালো হয়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তেমনি আবার হোমাগ্নির কথা আছে এবং নরবলির কথা আছে, যা সংবাদ হিসাবে আগত কিন্তু বিভীষিকার পরিচয়-সূত্রে রক্তিম বর্ণে চিত্রিত নয়।

আমরা এ প্রসঙ্গের আলোচনা 'শেষ লেখা' কাব্য থেকে কিছু উদাহরণ দিয়েই শেষ করবো। 'শেষ লেখা'য় প্রথম সংখ্যক কবিতাটিতে সন্ধ্যাকাল, সমুদ্র এবং তরণীর কথা আছে, এবং একটি মাত্র জ্যোতির কথা আছে যে জ্যোতি ধ্রুবতারার। আমরা এ কবিতাটিতে আলো এবং ছায়ার বৈপরীত্যে একটি চিত্র রূপায়িত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। দুই সংখ্যক কবিতায় মৃত্যুর কথা আছে। মৃত্যুর পরিচয় দিতে যেয়ে কবি ছায়ার কথা বলছেন। তা ছাড়া গুহাগহ্বরের কথাও এসেছে। কবিতাটির প্রতিটি শব্দে আসন্ন অন্ধকারের ছায়াপাত দেখতে পাই। ১৪ সংখ্যক কবিতায় অন্ধকার ও বিভীষিকার কথা এসেছে, ভয়ের এবং অজানার রূপকল্পে। এভাবে আমরা দেখছি যে 'শেষ লেখা'য় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আলো-ছায়ার বৈপরীত্য নির্মিত হয়েছে একটি জীবনান্তের পরিচয়সূত্রে।

৮

বৈষ্ণব কবিতার প্রেমাভিষেক রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল। সেই প্রেমের মধ্যে একটি বিশেষ আনন্দ আছে এবং বৈষ্ণব কবিতার যে ঐশ্বর্য, সে হচ্ছে এই প্রেমগত আনন্দের ঐশ্বর্য। এ কবিতাগুলোর মধ্যে দুরূহ রসতত্ত্ব যাই থাকুকনা কেন সেই রসতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে নরনারীর প্রেমের ব্যঞ্জনায়। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে যেখানে শক্তির পরীক্ষা, সেখানে জয় পরাজয়ের প্রশ্ন আছে—জয়ে আনন্দ এবং উদ্বেলতা এবং পরাজয়ে গ্লানি। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে জয় এবং পরাজয় বলে কোনও প্রশ্ন নেই। যে যথার্থ প্রেমিক সে প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে চায়, পরাজয়ে যে মুহ্যমান হয়না, জয়ে অবশ্য সে উল্লসিত হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে বঞ্চনার বেদনাতেও আনন্দ আছে, যেহেতু বৈষ্ণব পদাবলী রূপক, তাই পদকর্ত্তাগণ এই বঞ্চনাকে আনন্দ রূপে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

যে সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল তখন তার শিষ্য রূপ-গোস্বামী চৈতন্যের সাধনার বিভিন্ন অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করে একটি সাধন-তত্ত্ব বিষয়ক দুরূহ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'উজ্জ্বলনীলমণি'। আমরা সেই গ্রন্থে দেখি যে সেখানে প্রেমের আলম্বনের ব্যাখ্যা এবং উদ্দী-পনের কথা আছে। উদ্দীপন হচ্ছে নায়কের রূপ এবং আচরণ নায়িকার চিত্তে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে সেই উদ্দীপনাই হচ্ছে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের উদ্দীপন। রূপগোস্বামী বলছেন যে, তিনিই যথার্থ প্রেমিক হতে পারেন যিনি রূপবান, যিনি অপূর্ব লীলার নিধি স্বরূপ, যার কটাক্ষে নারীচিত্ত বিমোহিতা হয়। এভাবে পরম রূপবান হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান এবং তাঁর রূপের অভিব্যক্তি যে পুরুষের মধ্যে জেগেছে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য, তিনি। রূপগোস্বামী বলছেন যে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী, বা ব্যভিচারী ও স্থায়ী ভাব প্রভৃতি যখন কার্যকারণ সম্পর্কে যুক্ত হয় তখনই আস্বাদিত হয় মধুর রতিরস। এই মধুর রতিরসের পরিণতিকে মনীষীরা বলেন প্রেম। 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে নায়কের গুণাবলী ব্যাখ্যাত হয়েছে, নায়-কের শ্রেণীভেদ চিহ্নিত হয়েছে। তেমনি আবার নায়িকার গুণাবলী এবং শ্রেণীভেদ চিহ্নিত হয়েছে। এই বিচিত্র গ্রন্থের মধ্যে প্রেমের সকল অব-স্থারই অভিষেক আছে। মাধুর্যের কথা আছে, প্রগল্‌ভতার কথা আছে, ঔদার্য্যের কথা আছে। ব্রীড়ানতা নায়িকার কথা আছে, বেপথু নায়কের প্রতি ইঙ্গিত আছে। যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদিও গ্রন্থটি

রসতত্ত্বের গ্রন্থ তবুও এই গ্রন্থে সেই রসতত্ত্ব প্রেমের ব্যঞ্জনাকে বহন করছে, দুরূহ সাধনার ইঙ্গিত-তত্ত্বটি বহন করছেনা। আমরা এভাবেই দেখবো যে সাধন-পদ্ধতির দিক থেকে বিচার করলে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব যতটা জটিল মনে হয় প্রেমের ব্যঞ্জনার দিক থেকে ততটা কিন্তু জটিল নয়, তার কারণ, এর মধ্যে ভাব, অনুভাব এবং আনুষঙ্গিক লীলা-বিলাসের যত বিচিত্র বর্ণনাই থাকুকনা কেন, মূলতঃ একটি বর্ণনাই সেখানে প্রধান, তা হচ্ছে প্রেমের। এই প্রেম, অথবা বলা যায় আবহ অথবা চৈতন্য রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-সাধনার মধ্যে এই প্রেমের তত্ত্বটি প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা দেখি যে কৈশোরে তিনি পদ রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন, 'ভানুসিংহের পদাবলী' নামে যেগুলো আজ পর্যন্ত বিখ্যাত হয়ে আছে। বর্তমানে বিভিন্নভাবে পরীক্ষিত হওয়ার পর প্রমাণিত হয়েছে যে 'ভানুসিংহের পদাবলীর' ভাষা কৃত্রিম, এটা মৈথিলী নয়, বাংলাও নয়, বরঞ্চ বলা যায় বাংলাই একটু মৈথিলী ঢং-এ লেখা। এই পদরচনার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স খুব কম ছিল। সে বয়সে রবীন্দ্রনাথের কানে বৈষ্ণব সুরের একটি সম্মোহন ছিল, তার অতিরিক্ত কিছুই ছিলনা। তাই দেখি যে সবক'টি পদের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ ধ্বনি-সাম্য নির্মাণের চেষ্টা করেছেন এবং ধ্বনি-মাধুর্যে কতকগুলো তন্ময়তার সৃষ্টি হয়েছে। যে বয়সে পদগুলো রচনা করেছিলেন সে বয়সের জন্য এটাকে অসাধারণ বলতে হবে। যথার্থভাবে এর মধ্য দিয়ে কোনও নায়ক বা নায়িকার চিত্তের উন্মোচন যদি নাও ঘটে থাকে তাতে কোনও হানি নেই, কেননা নায়ক বা নায়িকার চিত্তের উন্মোচনের জন্য যে রস-জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল, বৈষ্ণব তত্ত্বগত সেই রসজ্ঞান রবীন্দ্রনাথ তখনও পুরোপুরি আয়ত্ত করেননি। এক দিক থেকে এটা ভালই হয়েছে, তার কারণ আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধ্বনি-ব্যঞ্জনাময় কতকগুলো সুন্দর কবিতা পেলাম, যেগুলো যথার্থরূপে বৈষ্ণব কবিতা নয় কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার রস ও রূপে অভিষিক্ত এবং বৈষ্ণবীয় প্রেমের ব্যঞ্জনায় হিল্লোলিত।

বৈষ্ণব পদাবলীর দু'টি দিক আছে—একটি হচ্ছে দেহতত্ত্বগত দিক, আর একটি হচ্ছে সূক্ষ্ম অনুভূতির দিক। দেহের যে লীলা-বিলাসের কথা বৈষ্ণব পদকর্তারা উল্লেখ করেছেন সে লীলা-বিলাস ভারতীয় সাধনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট দিক। মানুষ হিসাবে আমরা সর্বপ্রথম আমাদের শরীরকে

জানি এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকে জানি। শৈশব থেকে আমরা আমাদের শরীরকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে ক্ষয়প্রাপ্ত হই, যৌবনময় হই, বার্ধক্যে উপনীত হই, অবশেষে মৃত্যুতে গত হই। সর্বজীবন আমরা এই শরীরকে বহন করে নিয়ে চলি। কখনও কুশলতার আনন্দ, কখনও অকুশলতার ক্লান্তি; কিন্তু কোনও মুহূর্তে দেহকে এড়াতে পারিনা। সে জন্যই ভারতীয় সাধক-সম্প্রদায় মানব-দেহকে সর্ব-চৈতন্যের মূলাধার বলে বিবেচনা করেছেন। আমাদের দেহ আছে বলেই আমাদের হৃদয় আছে এবং দেহকে কেন্দ্র করেই আমাদের সকল চৈতন্যের উদ্ভব এবং বিকাশ। তন্ত্র সাধনায় এই দেহের অনুভূতিকে পরম প্রাপ্তির জন্য ব্যবহার করা হয়। সেখানে বলা হচ্ছে, যে দেহকে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করছি এবং যে দেহের সকল অনুভূতিকে আমরা জানি সেই দেহের অনুভূতির মাধ্যমে আমাদের ভগবানকে পেতে হবে। বৈষ্ণব সাধনার মধ্যেও এই দেহকে সকল সাধনার মূলাধার হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। নরনারীর দেহগত সম্পর্কের মধ্যে যে একটি মাধুর্যের দিক আছে, যে একটি মমতার দিক আছে এবং যে একটি অপূর্ব উন্মাদনার দিক আছে, সে মাধুর্য এবং উন্মাদনাকে ব্যবহার করা হয়েছে পরমাত্মা লাভের জন্য। একদিকে শ্রীরাধা হচ্ছেন জীবাত্মা, অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা। অনন্তকাল ধরে ভগবান মানুষে এই যে একে অন্যকে পাবার আকাঙক্ষা, সেটাকেই বৈষ্ণব সাধনার মূলতত্ত্ব হিসাবে আমরা বিবেচনা করি। কিন্তু এই জীবাত্মা এবং পরমাত্মার উপলব্ধিগুলো বাদ দিলেও বৈষ্ণব পদাবলীর একটি মাধুর্যময়, মমতাময় মানবিক দিক আছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর এই মাধুর্যের দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন, নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বারা নয়। তাই আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের অলৌকিক ব্যঞ্জনা এসেছে, সকল স্পর্শের অতীত, কল্লোলের অতীত এক আনন্দময় অনুভূতির রাজ্যের কথা এসেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে যেখানে দেহমন্থন, রবীন্দ্রকাব্যে সেখানে হৃদয়ের সূক্ষ্মতম লীলা-বিলাস। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রূপকের দিকটাকে কখনও গ্রহণ করেননি। এর মধ্যে যে একটি রহস্যময় দিক আছে, একটি যে অরূপের ব্যঞ্জনা আছে, সেই রহস্য এবং অরূপের ব্যঞ্জনাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। অল্প বয়সের 'ভানুসিংহের পদাবলী'র মধ্যেই এটা স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব

পদাবলীর রূপ কি ভাবে গ্রহণ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বক্তব্যে ধরা পড়ে। দেখা যায় যে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের সাধন-কর্ম হিসাবে পদাবলীকে গ্রহণ করেননি, নিছক কাব্য হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। তাই সর্বমুহূর্তে পদাবলীর অন্তর্নিহিত রস তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর রচনার বহু স্থানে কবি জ্ঞানদাসের একটি পদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। মনে হয় উক্ত পদটির আবেগ কবিকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। জ্ঞানদাসের পদের উদ্ধৃত অংশটুকু এই—

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

এই পদের তাৎপর্য তিনি নানাভাবে নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিবেচনায় এখানে কবি বিষয়কে অতিক্রম করেছেন। বিষয়কে অতিক্রম করে যে অতিরিক্তটুকু কাব্যে জেগেছে সেটাই হচ্ছে অনির্বচনীয় এবং রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় এই অনির্বচনীয়ের মধ্যে আমরা একটি নিত্য কালকে প্রকাশিত হতে দেখি। অর্থাৎ আমাদের চোখে যা দেখবো মনে অনুভব করবো তার চেয়ে বেশী। অর্থাৎ আমরা যা দেখবো তা প্রাণের মধ্যে দেখবো এবং সেই দেখাটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ এই পদের মধ্যে একটি গতিশীলতা আবিষ্কার করেছেন। সেই গতিশীলতায় তিনি দেখেছিলেন যে সবকিছু শেষ হয়েও যেন শেষ হয়না। একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল সেটা একটি সংবাদ এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদটি ফুরিয়ে যায় কিন্তু জ্ঞানদাসের পদে একথাটাই সুন্দর করে যখন বলা হয় তখন সুর ও মূর্চ্ছনায় কথা থেমে গেলেও বলা থামেনা। এভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রবীন্দ্রনাথ পদাবলীকে নিজের মতো করে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ পদাবলীর অনির্বচনীয় রূপ-মাধুর্যই তাঁর কাম্য ছিল, এবং এই রূপ-মাধুর্য কবির বিশেষ স্বভাবের সঙ্গে অপূর্বভাবে মিশেও গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কখনও দেহকে ভিত্তি করে প্রেমের সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনাকে গ্রহণযোগ্য করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেম একটি হৃদয়বেদ্য সূক্ষ্ম অনুভূতি। বৈষ্ণব পদাবলীর

মধ্যে যেমন প্রেমের এই সূক্ষ্ম দিক আছে তেমনি আবার প্রেমের দেহগত আলিম্পনও আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং চিন্তায় প্রেমের সূক্ষ্ম রহস্যটাই বিবেচিত হয়েছে। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলীর এই সূক্ষ্ম তাৎপর্যময়, রহস্যময় অলৌকিক প্রেমের ব্যঞ্জনাকে স্মরণ করেছেন 'স্বপ্ন' নামক কবিতায়। কবিতাটিতে কবি বলছেন যে বৈষ্ণব কবি শ্রীরাধিকার চিত্র উন্মোচন করবার চেষ্টা করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর কাছে নিশ্চয় শ্রীরাধিকার তত্ত্বটাই বড় হয়ে দেখা দেয়নি। নিশ্চয় শ্রীরাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোনও একটি মেয়ে ছিল যার চোখে কাজল এবং পরনে নীল শাড়ী। রূপকগত ব্যঞ্জনা নিয়ে বৈষ্ণব পদাবলী অতীত হয়ে গেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেকালের স্বপ্নে এবং একালের স্বপ্নে একটি মিল দেখতে পাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে পদাবলীর দুই কবি সম্পর্কে আলোচনা লিখেছেন, সে দুইজন হচ্ছেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হয়ে পড়েন আর মিলনে সুখ খুঁজে পাননা। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকেই সার বলে জেনেছেন, অন্যদিকে চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলে জানতেন। বিদ্যাপতি ভোগ করবার কবি, চণ্ডীদাস শুধু দুঃখকে সহ্যই করেছেন। চণ্ডীদাস দুঃখের মধ্যে সুখ এবং সুখের মধ্যে দুঃখ দেখতে পেয়েছেন। চণ্ডীদাসে সুখের মধ্যে ভয় এবং দুঃখের প্রতি অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে, মিলনেই সুখ এবং বিরহেই দুঃখ। চণ্ডীদাস এর চেয়ে অনেক কিছু জানেন। এই কথাগুলোর মধ্যে একটি সত্য উদঘাটিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ প্রেম নামক অনুভূতিটাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন এবং এই আবিষ্কার করার মধ্যে রোমান্টিক চৈতন্য বিদ্যমান। যে রোমান্টিক চৈতন্য বলে যে দুঃখ এবং যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দ আছে এবং দুঃখকে উপভোগ করাও প্রেমের কর্তব্য। এই চৈতন্য ইংলণ্ডের রোমান্টিক কবিতার মধ্যে ছিল যার প্রতিনিধি হিসাবে আমরা শেলী এবং কীটসকে দেখেছি।

আমার মনে হয় বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি নিত্য সত্যকে উপলব্ধি করবার উপায় মাত্র। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর রূপক এবং তত্ত্বের দায়ভার নিয়ে বিব্রত কখনও হননি বরঞ্চ তিনি এই

পদাবলীর মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য এবং প্রেমের পরিচয় পেয়েছেন, যে সৌন্দর্য এবং প্রেমে তিনি সব সময় উদ্ভাসিত হয়েছেন। তাই কবির কাছে এই সৌন্দর্য এবং প্রেমের কোনও বয়স নেই, এ প্রেম সব মুহূর্তেই জীবন্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর নতুন ব্যাখ্যা পাচ্ছিনা বরঞ্চ বলা যায় তিনি বৈষ্ণব পদাবলীকে উপলক্ষ করে মানুষের চির পুরাতন অথচ চির নতুন প্রেমজনিত বিরহ-বেদনার স্বাদ উপস্থিত করেছেন। একেই রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে বলেছেন "সেই চির পুরাতনের চির নতুনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এই জন্যই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা সর্বমানবের।" রবীন্দ্রনাথ এমন কোনও নবীনতা বরণ করতে চাননি যে নবীনতা ক্ষণিকতার লক্ষণ নিয়ে অল্পক্ষণের জন্য ভাস্বর। তিনি সেই নবীনতাকে বরণ করতে চান যার অভ্যর্থনা-কালে এ কথা বলা যায় 'আমি আজীবন রূপ দর্শন করেছি কিন্তু তবুও আমার নয়ন অতৃপ্ত রয়েছে। আমি লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয় দিয়ে হৃদয় ধারণ করেছি তবুও হৃদয় শান্তি পেলনা।'

কাব্যের রস হচ্ছে নিত্য কিন্তু কাব্যের তত্ত্ব এবং সংস্কার হচ্ছে অনিত্য। অর্থাৎ কাব্যের রস নিত্যকাল ধরে মানুষকে আনন্দ দেয় এবং মানুষের হৃদয়কে জয় করে। কিন্তু কাব্যের সংস্কার এবং তত্ত্বকে আমরা অনবরত অতিক্রম করে চলি। বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সংস্কার আছে এবং একটি তত্ত্ব আছে। সেই সংস্কার এবং তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ মুহূর্তের জন্যও গ্রাহ্য করেননি, এটা ভাল না মন্দ তা বিবেচনা করা যায় এবং বিবেচনা করলে আমরা আবিষ্কার করবো যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ কোনও ব্যাখ্যা আমাদের সামনে উপস্থিত করেননি যে ব্যাখ্যা সর্বতোভাবে গ্রহণ-যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বরঞ্চ বৈষ্ণব পদাবলীকে উপলক্ষ্য করে সৌন্দর্য এবং প্রেম সম্পর্কে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। তাহলে ঠিক বৈষ্ণব রসতত্ত্বের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়েছেন এটা বলা যায় না, বরঞ্চ বৈষ্ণব কবিতার ছন্দ, সুর ও মূর্চ্ছনা এবং শব্দের প্রথাগত আশ্রয়ে প্রকাশিত রসা-বেশকে গ্রহণ করেছেন। প্রথাগত আশ্রয় হচ্ছে তত্ত্ব বা রূপকের আশ্রয় নয়, বরঞ্চ শব্দের অর্থের স্বাভাবিক আশ্রয়। যেমন বলা যায় যে জ্ঞানদাসের 'রজনী শাঙন ঘন' এই পদটির কথা। রবীন্দ্রনাথ এর যে অর্থ করেছেন, পদকর্তাদের কাছে কিন্তু সেই অর্থটা স্পষ্ট ছিলনা। সেখানে তত্ত্বগত যে ভাবের

প্রকাশ ঘটেছে সে ভাবকে আমরা সাধারণ মানবীয় প্রেমের ভাব হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারিনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের দিকে একেবারেই যাননি। পদাবলীর মধ্যে যে সমস্ত শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, রাগভেদ, বিভিন্ন দশা, সখ্য, সম্ভোগ, মোহ, ইত্যাদির বর্ণনা আছে সেগুলো রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিশ্লেষণ হিসাবেই এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্লেষণকে অবলম্বন করেননি। তিনি এর সহজ দিকটা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে কবিরা একটি বিষয়কে উপলক্ষ্য করে ছন্দে, ব্যাখ্যা-বিন্যাসে এবং উপমা সংযোগে যে বস্তু নির্মাণ করেছেন সেটা একটি সমগ্র বস্তু এবং সেই সমগ্র বস্তুটা বিষয়ের অতীত এবং অনির্বচনীয়। সেই অনির্বচনীয়ের উদাহরণ স্বরূপ কীট্‌স্‌-এর একটি কবিতার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে করেছেন। কবিতাটি হচ্ছে "Ode to a Grecian Urn". যে শিল্পী সেই urn তৈরী করেছিল মানুষের প্রয়োজনকে রূপ দেয়া তার উদ্দেশ্য ছিলনা। তাই যদি তার উদ্দেশ্য হতো তাহলে শুধু-মাত্র একটি পাত্র নির্মাণ করলেই হতো। কিন্তু পাত্রের গায়ে বিভিন্ন রেখাঙ্কনের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শুধুমাত্র মানুষের প্রেমকে রূপ দেওয়া শিল্পীর উদ্দেশ্য ছিলনা। প্রয়োজন সাধন এর দ্বারা নিশ্চয়ই হয়েছিল কিন্তু প্রয়োজনের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়নি। ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে এই শিল্প অনেক স্বতন্ত্র এবং অনেক বড়। গ্রীক শিল্পী সুষমাকে, পূর্ণতার একটি আদর্শকে প্রত্যক্ষতা দান করেছে এবং রূপলোকে অপরূপকে ব্যক্ত করেছে। এভাবে অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাইরে প্রত্যক্ষগোচর করবার যে চেষ্টা তাকে আমরা শিল্পীর লীলা বলতে পারি। এই লীলা হচ্ছে শিল্পীর রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি, প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি নয়। এই বৃত্তির মধ্যে মানুষের নিত্য কর্ম এবং দৈনিক জীবনের সম্বন্ধ থাকতেও পারে কিন্তু সেটা মূলত অবান্তর। যেহেতু বৈষ্ণব কবিরা প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং নরনারীর সম্পর্ককে স্পর্শ করে একটি অলৌকিক সাধনের রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই অলৌকিক সাধ-নাকে মানব-ভিত্তিক বলে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি: "আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি কোনো-না-কোনো ঐক্যসূত্রে জানি। কোনো জানা আপনাতেই একান্ত স্বতন্ত্র নয়। যেখানে দেখি আমাদের পাওয়া বা

জানার অস্পষ্টতা সেখানে জানি, মিলিয়ে জানতে না পারাই তার কারণ। আমাদের আত্মার মধ্যে জ্ঞানে ভাবে এই-যে একের বিহার, সেই এক যখন লীলাময় হয়, যখন সে সৃষ্টির দ্বারা আনন্দ পেতে চায়, সে তখন একাকে বাহিরে সুপরিস্ফুট করে তুলতে চায়। তখন বিষয়কে উপলক্ষ্য ক'রে, উপাদানকে আশ্রয় ক'রে একটি অখণ্ড এক ব্যক্ত হয়ে ওঠে। কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর পূজার পূজাপাত্রে বিচিত্র রেখার আবর্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ একাকে চরম রূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়। যে-মানুষ অরসিক সে এই চরম একাকে দেখতে পায় না; সে কেবল উপাদানের দিক থেকে, প্রয়োজনের দিক থেকে এর মূল্য নির্ধারণ করে—

শরদ-চন্দ্র পবন মন্দ
বিপিনে বহল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতী যূথি
মত্তমধুপভোরনী।

"বিষয়ে ভাবে বাক্যে ছন্দে নিবিড় সম্মিলনের দ্বারা যদি এই কাব্যে একের রূপ পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, যদি সেই একের আবির্ভাবই চরম হয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকার করে, যদি এই কাব্য খণ্ড খণ্ড হয়ে উল্কা-বৃষ্টির দ্বারা আমাদের মনকে আঘাত না করতে থাকে, যদি ঐক্যরসের চরমতাকে অতিক্রম করে আর-কোনো উদ্দেশ্য উগ্র হয়ে না ওঠে, তা হলেই এই কাব্যে আমরা সৃষ্টিলীলাকে স্বীকার করব।" (সাহিত্যের পথে: তথ্য ও সত্য।)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণব কাব্যের রসরূপ ব্যাখ্যার সূত্রে যে দু'জন কবিকে গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তাঁরা, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব প্রবর্তিত হওয়ার অনেক আগে তাঁদের কবিতা রচনা করেছিলেন। তাই তাঁদের কবিতা বৈষ্ণব রসতত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি। রাধা এবং কৃষ্ণ তাঁদের প্রেমের রসাবেশ ব্যাখ্যার বিষয়রূপে উপস্থিত সন্দেহ নেই কিন্তু রাধা এবং কৃষ্ণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার লীলারূপে উপস্থিত নয়। শুধুমাত্র এ-কারণে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির পদের লালিত্য গড়ে উঠেছে ছন্দ-মাধুর্যে, রূপের মাধুর্যে এবং প্রণয়াবেগের মাধুর্যে—তত্ত্বের মাধুর্যে নয়। রবীন্দ্রনাথ কোথাও প্রাক্-চৈতন্য এবং চৈতন্য-পরবর্তী কাব্য-ধারার বিশ্লেষণ করেননি, তিনি শুধু হৃদয়াবেগের সমীক্ষার দ্বারা বিদ্যাপতি এবং চণ্ডী-দাসকে গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রহণের দ্বারা একটি সত্য প্রমাণিত হয়

যে কবি বৈষ্ণবতত্ত্বের জন্য আগ্রহী ছিলেননা, তিনি আগ্রহী ছিলেন কাব্য-স্বরূপের জন্য। তাই বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের বর্ণনা-ভংগি, ছন্দ ব্যবহার, ছন্দ সুষমা এবং শব্দের সাধারণ অর্থের গভীরে একটি বিশিষ্টার্থক অর্থদ্যোতনা আবিষ্কার করেছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় তিনি এঁদেরকবিতার মধ্যে কাব্যের মাধুর্য এবং রহস্য পেয়েছিলেন, তত্ত্বের নির্ভরতা পাননি। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে রাধা এবং কৃষ্ণ কোনও বিষয় নয় তারা উপলক্ষ্য মাত্র। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানুষ জ্ঞানে বিষয়কে জানে, যে জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে এবং জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপের সামনে। কিন্তু কবি ভাবে আপনাকে জানে, যেখানে সেই বিষয়টা তাকে উপলক্ষরূপে সেই আপনার সংগে মিলিত। বিষয়কে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব হচেছ বিজ্ঞানের। এইযে জানিয়ে দেওয়া তার মধ্যে ব্যক্তি-পুরুষের কোনও অস্তিত্ব নেই, এই জানার থেকে বিজ্ঞান ব্যক্তিত্বকে সব সময় সরিয়ে রাখে, এখানে শুধু সক্রিয় থাকে মানুষের বিবেচনা, যুক্তি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা ; কিন্তু সাহিত্যে মানুষ আপনাকে দেখে, সাহিত্যের সত্যতা হচেছ মানুষের নিগূঢ়তম উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেই উপলব্ধি অদ্ভূত হতে পারে, অসম্ভব হতে পারে, অতথ্য হতে পারে—তাতে কিছুই আসে যায়না, কেননা অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্য তাকেও সত্য বলে স্বীকার করে। মানুষ শিশুকাল থেকে নানাভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় কাতর। এ-ভাবেই রূপ-কথারও উদ্ভব হয়েছে। নির্বিশেষ কল্পনালোকেও মানুষ অনেক কিছু হতে চায়। তাই কখনও মানুষ গাছের সঙ্গে মিশে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে মিশে হয় নদী এবং আকাশের সঙ্গে আকাশ। আপনার মনকে নিয়ে মানুষের এইযে বৈচিত্র, এই বৈচিত্রের লীলাই সাহিত্যে চিত্রিত হয়। এই লীলায় সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে। সাহিত্যের যে সৌন্দর্য সে সৌন্দর্যের ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। বাইরের জগতের সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। বাইরের পৃথিবীতে প্রাণবান মানুষের জন্য যাকিছু অনিষ্টকর তাই আনন্দহীন এবং অসুন্দর, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা আমরা উপলব্ধি করি তাই সুন্দর, কেননা এই উপলব্ধির মধ্যে আমরা আপনাকে পাই। অর্থাৎ মানুষ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করেছে।

এ-সমস্ত কথায় এটাই প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের একটি অকুণ্ঠ

লীলা-বিলাস লক্ষ্য করেছিলেন বৈষ্ণব পদাবলীতে, সেই অকুন্ঠিত লীলা-বিলাসে তাঁর চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল এবং তিনি তাকে গ্রহণ করে-ছিলেন সুন্দরতম এবং সত্য বলে। তাই দেখি যে বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্র-নাথের জন্য বিপুল আনন্দ-সম্ভোগের উপকরণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' অথবা "বিদ্যাপতির রাধিকা" প্রবন্ধ দু'টি পাঠ করলে আমরা বৈষ্ণব কবিতার বিশ্লেষণ পাইনা, আমরা দু'জন কবির প্রেমমূলক কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে যে সংবেদন জাগিয়েছে তার একটি লীলাময় পরিচয় পাই। "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ-বিশ্লেষণে তা আমাদের খুব বেশী সাহায্য করেনা কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি অনুভূতিকে আমরা পাই। সেখানে স্পষ্ট হয় যে তিনি কি দৃষ্টিতে বিদ্যা-পতি এবং চণ্ডীদাসকে দেখেছিলেন। 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধেও আমরা কবি-চিত্তের একটি উন্মোচন লক্ষ্য করি। একটি অত্যন্ত সুন্দর মনোরম কবি-ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলো সম্পর্কে লিখেছেন "যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে তখন সকলই রহস্য-পরিপূর্ণ। সদ্য-বিকচ-হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে, আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তাই লজ্জায়, ভয়ে, আনন্দে, সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছেনা"। রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলোয় বিদ্যাপতির পদের ব্যাখ্যা নাই। এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের আনন্দ--অভিসার। আমরা এই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে দেখবো যে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদের মধ্যে আবেগগত কতকগুলো অর্থ আরোপ করেছেন, যে অর্থ ঠিক মধ্য-যুগের কাব্যের ব্যঞ্জনার মধ্যে কখনও ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়কালের মনোভঙ্গিকে নিয়ে এবং তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গিকে দিয়ে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীর গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণ করেছেন। আমরা যদি মধ্যযুগের কাব্যের শব্দ-ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা করি তাহলে দেখবো যে, যে অর্থ রবীন্দ্রনাথ আরোপ করেছেন সেই অর্থ ঠিক পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়না। মধ্যযুগে বাংলা কবিতায় শব্দের দু'টি দিক ছিল; একটি হচ্ছে সহজ স্পষ্টবাচ্যতা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে রূপকগত বাচ্যতা। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী রূপকগত বাচ্যতায় বিশিষ্ট

ও অনন্য-সাধারণ। কিন্তু যে সমস্ত কবিদের ক্ষেত্রে এই রূপকগত বাচ্য-তাকে গ্রাহ্য না করলেও চলে তারা হলেন বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস। এদের কবিতার শব্দে একটি সহজ স্পষ্টতা আছে। রবীন্দ্রনাথ এদের কবিতার সেই স্পষ্ট-বাচ্যতাকে মুখ্য করতে চাননি, বরঞ্চ রোমাণ্টিক কাব্য-তত্ত্বের আশ্রয়ে এনে এদের কবিতার শব্দে নতুন এবং আধুনিক অর্থ আরোপ করেছেন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ বিদ্যা-পতি এবং চণ্ডীদাস সম্পর্কে কথা বলতে যেয়ে আপন উপলব্ধির রসাস্বাদকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন চণ্ডীদাসের "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" সম্পর্কে লেখেন তখন চরণটির মধ্যযুগীয় যথার্থ অর্থের উপর নির্ভর না করে তিনি তাঁর নিজস্ব অর্থ তার উপর আরোপ করেন—"শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু যে একটি অদৃশ্যাবেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হ'ল তাই। সেই জন্য কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কবিতাটিকে দুলিয়ে ছিলেন যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবেনা। ঐ কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভাল মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন কোনও দিনই শান্ত হবেনা। ওরা অস্থির হয়েছে এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।" এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উচ্ছ্বাস-ময় বক্তব্যের প্রকরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন, যে ব্যাখ্যাটি ব্যাখ্যা ঠিক নয়, রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তের অভিমত। আমরা দেখতে পাবো যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার শব্দের হিল্লোল এবং ছন্দের তালে অভিভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁর নিজের কবিতায় এর প্রভাবও পড়েছিল। এইযে ভাল লাগা, এই ভাল লাগাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন হৃদয়াবেগের সংঘাত বলে। এই হৃদয়াবেগের সংঘাত জেগেছিল রবীন্দ্রনাথের চিত্তে। তাই আমরা বলতে পারি যে বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলো একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিমত এবং উক্তিগুলো রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুভূতিকে ধারণ করে আছে। বৈষ্ণব কবিতা রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এটা আমরা এই অর্থে বুঝি যে পদাবলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার ছন্দের স্পন্দন এবং সুর সম্মোহনের কারণে। আকর্ষণের অন্য একটি কারণ হলো যে তিনি পদাবলীর মধ্যে প্রেমের কয়েকটি বিশিষ্ট অভিপ্রায়ের পরিচয় পেয়েছিলেন যা তাঁর কাছে নিত্যকালের সামগ্রী বলে মনে হয়েছিল।

কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলী থেকে অনেক শব্দসম্ভার গ্রহণ করেছিলেন। শুধু মাত্র শব্দসম্ভার নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক রূপক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গ্রাহ্য হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে একটি সাবলীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আমরা শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" পাঠ করেছিলেন। তিনি তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে 'গীতগোবিন্দে'র রস উপভোগের কথা লিখেছেন। তখন বয়স কম, সুরের সম্মোহনই কবিকে প্রথমে আচ্ছন্ন করেছিল। জয়দেবের পদাবলীর ধ্বনিমাধুর্য কবিকে মুগ্ধ করেছিল। জয়দেবের পদাবলীর বিশিষ্টতা হচ্ছে তাঁর অনুনাসিক ধ্বনির উচ্ছলতা এবং অনুপ্রাসের অনিবার্য বিস্তার। প্রথম দিককার কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের কাব্য থেকে অনেক শব্দ গ্রহণ করেছিলেন। যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের মৌলিক শব্দভাণ্ডার বিশ্লেষণ করে তবে তার মধ্যে জয়দেবের পদাবলীতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ পাবে। জয়দেব কর্তৃক ব্যবহৃত অলস, গহন, তরল, তল, তিমির, নিবিড়, নিভৃত, নিঃসহ, পুলক, রভস, ইত্যাদি শব্দ রবীন্দ্রনাথের "কড়ি ও কোমল," "মানসী," "গীতাঞ্জলী," ইত্যাদি কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'অলস মায়া' অথবা 'মানসী' কাব্যে ব্যবহৃত অলস মেঘের খেলা, অনিবার্যভাবে জয়দেবের 'অলসনিমীলিতলোচনয়ার' কথা মনে করিয়ে দেয়। তেমনি আবার রবীন্দ্রনাথের মানসীর "এই অরণ্যের তলে" অথবা "গীতাঞ্জলী"র 'নেমেছে ধুলার তলে' অথবা 'পূরবী'র 'এই জনমের রূপের তলে', জয়দেবের 'কিশলয়শয়নতলের' কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার 'মানসী'র 'তিমির রজনী' অথবা 'শ্রাবণ তিমির' জয়দেবের "সতিমির-পুঞ্জম" অথবা "তিমিরমনল্পম" এর কথা মনে করিয়ে দেয়। জয়দেব লিখেছিলেন "নিভৃতনিকুঞ্জ গৃহং গতয়া", রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'মানসীতে' 'নিভৃত সংসারে,' 'নিভৃত সুখে'। জয়দেব লিখেছিলেন "শ্রুতিপুটযুগলে", রবীন্দ্রনাথ 'মানসীতে' লিখলেন "আঁখিপুট, 'পত্রপুট'। এভাবে দেখছি কাব্য-বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে রবীন্দ্রনাথ যতটা নিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী নিয়েছিলেন বৈষ্ণব পদাবলী থেকে। আমরা পূর্বেই বলেছি অল্প বয়সে, খুবই অল্প বয়সে, যখন তাঁর বয়স চৌদ্দ কি পনেরো, অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথের হাতে

পড়েছিল, যার ফলে ব্রজবুলী পদাবলী রবীন্দ্রনাথ পাঠ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই বয়সে গোবিন্দ দাসের অনুকরণে ব্রজবুলীতে কবিতা লিখেছিলেন, অবশ্য সেগুলো যথার্থ ব্রজবুলী হয়নি, না হলেও 'ভানুসিংহের পদাবলী'র শব্দ ও ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় ব্রজবুলীয় আমেজ আছে। 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতাগুলো যখন তিনি লিখেছেন তখন তিনি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি নতুন সংস্করণ উপস্থিত করেছেন। আমরা দেখতে পাবো কিভাবে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব নয়, কিন্তু পদাবলীর শব্দ ও ধ্বনিব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। 'কড়ি ও কোমলে' বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। 'মথুরায়' কবিতাটিতে কবি রাধা-কৃষ্ণের বিরহের কথা স্পষ্ট বলেছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র প্রায় প্রতিটি কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী এসেছে। 'পুরাতন' কবিতাটিতে সুদূরের বাঁশীর সুরে বিলাপ-উচ্ছ্বাস জেগেছে, তরুণ কবি সে কথা বলেছেন। 'যোগিয়া' কবিতাটিতে পায়ের কাছে বাঁশী পড়ে আছে এ কথা বলা হয়েছে, 'মথুরায়' কবিতাটিতে প্রতিটি স্তবকেই শুধু বাঁশরীর কথা। আবার 'বাঁশী' কবিতায় অনবরত শুধু বাঁশীরই সুর-ঝংকার। 'কড়ি ও কোমলে'র, 'মথুরায়', 'বাঁশী', 'বিরহ বিলাপ এবং গান', এ ক'টি কবিতা বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুরের পদগুলোর সংগে সমন্বিত এ কথা বললে অন্যায় হবেনা। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা শুধুমাত্র 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে নেই, 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীতে' প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অনেক পরে 'সানাই', 'বলাকা', 'মহুয়া' ইত্যাদি কাব্যেও রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। যে প্রয়োগ-রীতিতে বৈষ্ণব পদাবলীর শব্দগুলো রবীন্দ্র-কাব্যে এসেছে সেই প্রয়োগ-রীতিও বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ভিন্ন নয়, অর্থাৎ পদাবলীতে এ-শব্দগুলো যে অর্থে এবং যে আবেশে ব্যবহৃত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথও অনেকটা সেই অর্থে এবং সেই আবেশে এগুলো ব্যবহার করেছিলেন। সুকুমার সেন 'মানসী' ও 'সানাই' কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রকাব্যে পদাবলীর কিছুসংখ্যক শব্দ যা এসেছে তার একটি তালিকা দিয়েছেন। আমি সম্পূর্ণ তালিকাটি এখানে উপস্থিত করছি:

মানসী। শব্দ: অনিমিখ, অমিয়, অবহেলে, আঁচোর, উতরোল, উভরায়, উলস, একদিঠি, কভু, কেলি, গরজন, তরজন, তিয়াষ, দরশ, দোঁহায়, নয়ান, নিতি, নিমগন, পরশ, পিয়াসে, পিরিতি, পূরব, বরণ, বরষ,

বরিষা, বরষণ, বয়ান, বায়, বারতা, মাঝার, মুখানি, মোদের, শব্দ, হরষ, হরিষে, হিয়া, ইত্যাদি।

নামধাতু। অন্বেষিয়া, আকুলিছে, আক্রমিছে, আগলিছে, আবরি, আশিসিলা, উথলিয়া, উদিলে, উতরিলা, উত্তরিতে, উছাসি, উদাসিয়া, কুহরে, গ্রাসি (য়া), চুম্বি, চূর্ণি, তরঙ্গিয়া, তেয়াগি (য়া), দহিতেছে, ধ্বনিতেছে, নমিল, নিরখি, নিবেশিলা, নিশ্বসিছে, নিশাসি, নেহারি, পসারিয়া, পরকাশে, পশিতেছে, প্রকাশিতে, প্রবাহিয়া, বরষিয়া, বাহিরিতেছিল, ব্যথিছে, ব্যাকুলিয়া, বিবশে, ভ্রমিয়াছে, মুদিয়া, রচিতেছে, লভিতেছে, লাথিয়ে (কথ্যভাষা থেকে), সন্তারিয়া, সম্বরি, স্বনিছে, ইত্যাদি।

সানাই। শব্দঃ দেয়া, ধেয়ান, নিঠুর, নিঃশব্দ, পরণাম, পরশন, বরণ, বরষ, বায়, মুরতি, হরষ, ইত্যাদি।

নামধাতু। আকুলি (য়া), আলোড়িয়া, আবরি, উজলিয়া, উচছ্বসিয়া, উদ্বারিল, কুসুমি, গর্জিছে, ঘোষিল, চঞ্চলি, পরশি, প্রবেশিতে, প্রসারিল, বঞ্চিতে (বঞ্চনা করিতে), বরষে, বর্ষে, বিচছুরিছে, বিশ্বাসি, বিস্তারিছে, মুখরিয়া, যুঝিতে, রচিছে, লক্ষ্যি, সচকিয়া, সমুচছ্বাসি, সংবরি, ইত্যাদি।

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে পরিচিত সংসার থেকে তিনি যখন দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলেন এবং জীবনে ও কর্মে অভ্যাসের স্থূল হস্তস্পর্শ দূর হলো তখনই মুক্তি এলো মনের রাজ্যে। এই মনের রাজ্যের কাল্পনিক আনন্দ-বিরহ এবং অভিসার 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের বিষয়-বস্তু, এবং এই প্রেম, আনন্দ এবং বিরহ বৈষ্ণব পদাবলীর স্পর্শচকিত। অর্থাৎ পদাবলীতে প্রণয়-লীলার যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন সে প্রণয়-লীলা তাঁর কাছে কবিতার একটি উচ্ছৃঙ্খল উপকরণ হিসেবে মনে হয়েছিল সেই উচছৃঙ্খল উপকরণকে 'মানসী'তে তিনি ব্যবহার করলেন। তিনি মানসীর ভূমিকা-স্বরূপ যে কবিতা লিখেছিলেন সেই কবিতাটিতে বলেছেন যে তিনি এই কাব্যগ্রন্থে মানসীপ্রতিমা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এর পার্থক্য এখানেই যে পদাবলীতে যেখানে আমরা প্রণয়কে রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্যেই প্রকাশিত দেখি, রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'তে সেই সম্পর্কের কথা উত্থাপন না করে আপন চিত্তকেই প্রণয়ের উৎসমূল করেছেন।

'মানসী'র 'পত্র' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকালে রাধিকার বৃন্দাবন-অভিসারের কথা স্মরণ করেছেন:

"পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন-অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিতচরণ—
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছলছল নলিননয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকুলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়।"

বৈষ্ণব পদাবলীতে পদকর্তাগণ বর্ষা এবং বসন্তকে বিপুলভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রেমের বিশিষ্ট ধরণের আবেগ প্রকাশের জন্য এ-দু'টি ঋতু তাদের বহুল প্রয়োজনে এসেছে। যেমন বসন্তকালীন বিরহ এবং বর্ষা-কালীন অভিসার। বসন্তকালে যখন প্রকৃতি পত্রপুষ্পে সুশোভিত থাকে এবং সর্বত্রই আনন্দের হিল্লোল ঠিক সেই মুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদকে বিরহের পটভূমি হিসেবে পদকর্তাগণ নির্মাণ করেছেন। যখন সর্বত্র পরিপূর্ণতা এবং আনন্দের উচ্ছলতা তখন যদি বিরহ আসে তবে সে বিরহ স্বাভাবিক বিচারে অসহনীয় হবে এই কল্পনা করে তাঁরা বসন্তকালীন বিরহকে নির্মাণ করেছেন। এখানে মানুষ গৌণ কিন্তু বিরহের আবেগটাই হচ্ছে মুখ্য। অর্থাৎ বিরহ নামক আবেগকে কোন্ অবস্থায় যথার্থরূপে প্রকাশ করা যায়, তা চিন্তা করতে যেয়ে পদকর্তাগণ বসন্তকালকেই বেছে নিয়েছিলেন। তেমনি আবার বর্ষার ঘনঘটা এবং দুর্যোগকে ঐকান্তিক অভিসারের যথার্থ সময় বলে তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন। বর্ষাকালে যখন চতুর্দিকে ঘোর ঘনঘটা, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং বিপদের আশংকায় মানুষ রুদ্ধদ্বার কক্ষে আশ্রয় নিচ্ছে তখন শ্রীরাধিকা সর্বপ্রকার বিশ্রাম এবং আশ্রয়কে অস্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আকাংখায় দুর্গম পথে বেরিয়েছেন। প্রেমাকুলতার তীব্রতাকে প্রকাশ করবার জন্য পদ-কর্তাগণ দুর্যোগের মধ্যেই অভিসারের চিত্র তৈরী করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখবো যে বিশেষ আবেগ প্রকাশের জন্য কখনও বসন্ত, কখনও বর্ষার প্রয়োজন হচ্ছে। পুরুষ এবং রমণীর সম্পর্ক এখানে বড় নয়,

এখানে বড় হচ্ছে কয়েকটি আবেগ অথবা রসাবেশ। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সমগ্র কাব্য-ধারায় বর্ষা এবং বসন্তকে বিপুলভাবে গ্রহণ করেছেন। বর্ষা-কেই গ্রহণ করেছেন বেশী এবং এই গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী এবং বাংলাদেশের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছে। "সোনার তরী"র 'বর্ষাযাপন' কবিতার মধ্যে বৈষ্ণব পদা-বলীর বর্ষার কথা কবি স্মরণ করেছেন :

"আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ
রচি "ভরা ভাদরের" সুর।
খুলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি "মেঘে অম্বর মেদুর।"
স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে—
শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায়
'রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন'
সেই গান মনে পড়ে যায়।
'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে'
মনসুখে নিদ্রায় মগন—
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস অধরে লাগিছে হাস
কেঁপে উঠে মুদিত পলক ;
বাহুতে মাথাটি থুয়ে, একাকিনী আছে শুয়ে,
গৃহকোণে ম্লান দীপালোক।
গিরিশিরে মেঘ ডাকে, বৃষ্টি ঝরে তরুশাখে
দাদুরী ডাকিছে সারারাতি—
হেনকালে কী না ঘটে, এ সময়ে আসে বটে
একা ঘরে স্বপনের সাথি।
মরি মরি স্বপ্নশেষে পুলকিত রসাবেশে
যখন সে জাগিল একাকী,
দেখিল বিজন ঘরে দীপ নিবু নিবু করে
প্রহরী প্রহর গেল হাঁকি।

বাড়িছে বৃষ্টির বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ,
ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,
সেই ঘনঘোরা নিশি স্বপ্নে জাগরণে মিশি
না জানি কেমন করে হিয়া।"

তেমনি আবার বসন্তের কথা এসেছে "সোনার তরী"র 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতায়। সেখানে তিনি লিখেছেন:

"নূতন-জাগা কুঞ্জবনে
কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে
বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে
ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরির
গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক
গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে
বাঁশিতে উঠে তান।
শীতলছায়া নদীর পথে
কলসে লয়ে বারি--
কাঁকন বাজে, নূপুর বাজে—
চলিছে পুরনারী।"

'বৈষ্ণব কবিতা' নামক কবিতায় কবি বলছেন যে বৈষ্ণবের গান শুধু যে বৈকুণ্ঠের জন্য তা তিনি স্বীকার করেননা। এ-সব গানে যে সমস্ত রাগ-অনুরাগের কথা আছে, মান-অভিমানের লীলা আছে, অভিসার ও বিরহ-মিলনের বিবরণ আছে সেগুলো শুধুই দেবতাদের—এটা ভাবতে কবির ইচ্ছে হয়না। তিনি ভাবতে চান যে পৃথিবীর মানুষের অনুরাগের চিত্র বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্য-শরীর নির্মাণ করেছে। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর মানবীয়তা প্রমাণ করতে

যেয়ে রবীন্দ্রনাথ নিগূঢ়ভাবে একটি কাল্পনিক প্রণয় বিলাসকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কবি বসন্তকালের অধীরতার কথা বলেছেন, আনন্দ উচ্ছ্বাসের কথা বলেছেন এবং বিশেষ প্রহর এবং কালগত প্রণয়ের যে লীলাবিলাস তার সঙ্গে যে যথার্থ ভাবে মানব-জীবনের সম্পর্ক নেই এটা কবির চিন্তায় জাগেনি। তবুও রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি সত্যকে আবিষ্কার করেছি তাহলো যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রণয়ের আবেশটুকুই গ্রহণ করতে চান কিন্তু তার তত্ত্বকে গ্রহণ করতে চাননা। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম কবিতার একটি বিষয়। এবং সে বিষয় নির্বাচন করতে যেয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রণয়ের রসাবেশ দ্বারা কবি প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তারই পরিচয়সূত্রে আমরা বৈষ্ণব কবিতা নামাঙ্কিত কবিতা পাচ্ছি। 'সোনার তরী'র 'হৃদয়যমুনা' কবিতাটিও বৈষ্ণব ভাবাবেশে আপ্লুত। কবিতাটি অনিবার্যভাবে যমুনায় শ্রীরাধিকার স্নানের দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে। কবিতাটির প্রথম স্তবকটি নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছেঃ

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।"

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ উপকরণ গ্রহণ করেছেন, প্রতীকও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবেদন এতো প্রগাঢ় এবং বিপুল হতে পেরেছে। 'মানসী'র 'বর্ষার দিনে' কবিতাটির কথা আমাদের মনে পড়ে। যে বর্ষার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এবং সে বর্ষাকালে প্রেমিক প্রেমিকার চিত্তের আকুলতার যে কথা তিনি বলেছেন সেই বর্ষা বৈষ্ণব পদকর্তাদের বর্ষা সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর চির পরিচিত বর্ষা। এর ফলে কবিতাটি একটু নতুন স্বভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এই গ্রহণযোগ্যতার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব রসপ্রভাবে আচ্ছন্ন থাকেননি বরঞ্চ তাকে অতিক্রম করে এসেছেন।

'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'শ্যামা' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা কখনও ঘোচেনা এবং 'সুন্দর' নিকটে এসেও সব সময় দূরে থাকে এবং তার এই দূরত্ব কখনও ক্ষয় হয়না। কাছে পেয়েও না পাওয়ার যে বেদনা, তাই পরিচয়টাকে সুন্দর এবং আনন্দময় করে তোলে। প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সংগে বৈষ্ণব পদাবলীর বক্তব্যের আশ্চর্য একটি মিল আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে গেলেন তখন শ্রীরাধা তাঁকে বারবার আকাংখা করেও পেলেননা এবং পেলেননা বলেই অবশেষে হৃদয়ের মধ্যে তার উপলব্ধিকে প্রবল রাখলেন। এখানে দেহগত দূরত্ব সত্ত্বেও 'সুন্দর' অলভ্য রইলনা। ঠিক এই কথাই বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে আছে, "দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। অত্যন্ত সান্নিধ্যে পাওয়ার পরেও বিচ্ছেদের কথাটি প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে, তার কারণ নিকটে পাওয়াই চরম পাওয়া নয়, হৃদয়ে পাওয়াই চরম পাওয়া। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থেও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের ব্যঞ্জনা কয়েকটি কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে। "বিচ্ছেদ" নামক কবিতায় কবি বলছেন যে, অভিসারিকা যে দুর্যোগের রাত্রে আনন্দে কাঁটা মাড়িয়ে চলে সে হয়ত তার নিত্য পূর্ণতাকে পায়না, কিন্তু বিরহিনী হিসেবে পূর্ণতার পথে যাত্রাই তাকে মূল্যবান করে। কবি আরো বলছেন, সে যে এগিয়ে চলে তার কারণ দূর থেকে পরিপূর্ণতার বাঁশি বাজে, সে বাঁশির সুর হচ্ছে বাঞ্ছিতের আহ্বান। একদিকে বাঞ্ছিতের আহ্বান, অন্যদিকে অভিসারিকার পথ চলা—এ দু'য়ের সমন্বয়ে প্রেমের পরিপূর্ণতা। বৈষ্ণব রসতত্ত্বে বলা হয়েছে যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মিলনেই প্রেমের পরিপূর্ণতা। জীবাত্মা হচ্ছে শ্রীরাধা, যিনি অভিসারে চলেছেন আর পরমাত্মা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মিলনের প্রতীক্ষায় বাঁশি বাজাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিচ্ছেদ' কবিতায় কবির অজ্ঞাতসারে এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়েছে :

"অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে ;
নিত্যপুষ্প, নিত্যচন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা—সেই তো একান্ত বিরহী।

যে অভিসারিকা তারই জয়।
আনন্দে সে চলেছে
কাঁটা মাড়িয়ে।
ভুল বলা হল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি—
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।"

'পুনশ্চে'র 'বাঁশি' কবিতাটির কথা মনে করা যাক। কবিতাটিতে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের একটি প্রতিচিত্রণ আছে। কবিতাটির শেষে কবি বাঙ্গালী বধূকে শ্রীরাধার সংগে একাকার করে ফেলেছেন, যেখানে 'তমালের' ঘন ছায়া আছে এবং ঘরের 'আঙিনায়' অপেক্ষা করা আছে। এখানকার 'তমাল' এবং 'আঙিনা' অনিবার্যভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। যেখানে 'তমালের' তলায় শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা করেন এবং ঘর থেকে আঙিনা যার বিদেশ সেই রাধিকা অন্ধকার রাত্রে অভিসারে গমন করেন:

"এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধুলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী;
তীরে তমালের ঘন ছায়া;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"

'পুনশ্চে'র 'মুক্তি' কবিতায় বৈষ্ণবীয় কীর্তনের কথা কবি স্মরণ করেছেন:

"কীর্তনী গাইছে,
'তমালকুঞ্জে বনের পথে
শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে,
ধুলায় তারা ছিল যে কান পেতে,

পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে আঁকা
এই ছিল প্রত্যাশা।”

রবীন্দ্রনাথের ‘কল্পনা’ কাব্যগ্রন্থে ‘স্পর্ধা’ নামক কবিতাটি পদাবলীর শ্রীরাধিকার রসোদগার বিষয়ক পদের সংগে সংগতিপূর্ণ। জ্ঞানদাসের একটি পদে আছে:

“যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপায়লু লাজে।
করে কর বারি ফুয়ল চির মোর।
পিয়া বড় ঢিঠকর রাখল আগোর॥”

এই সংগে ‘স্পর্ধা’ কবিতাটির প্রথম তিনটি স্তবক অতি সহজেই মিলিয়ে পাঠ করা যায়:

“সে আসি কহিল, ‘প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।’
দূষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু, ‘যাও।’
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।

দাঁড়ালো সমুখে; কহিনু তাহারে, ‘সরো।’
ধরিল দু হাত; কহিনু, ‘আহা কী কর।’
সখী ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে,
তবু ছাড়িল না মোরে।

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি,
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, ‘ছি ছি।’
সখী ওলো সখী, কহিনু শপথ ক’রে
তবু সে গেল না সরে।”

‘কল্পনা’র অন্য একটি কবিতা হচ্ছে ‘লজ্জিতা’। লজ্জিতা কবিতাটি পদাবলীর কুঞ্জভঙ্গের পদের সংগে সংগতি রাখে। বসু রামানন্দের একটি পদে আছে:

“প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল।

মৃগমদচন্দনবেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর।।"

আর 'লজ্জিতা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে!
আলোকপরশে মরমে মরিয়া
হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে।"

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মান্তর' কবিতায় কবি বলছেন যে তিনি আধুনিককালের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান হওয়ার চাইতে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় জীবনকেই পছন্দ করেন বেশী। তিনি বলছেন তিনি পরজন্মে ব্রজের রাখাল বালক হতে চান। পদাবলীর কয়েকটি চিত্র এই কবিতাটিতে কবি নতুন করে নির্মাণ করেছেন। একটি চিত্র হচ্ছে যেখানে ব্রজের রাখাল বালকগণ বংশীবটের তলায় ধেনু চরায়, গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে পরস্পরের গলায় দেয়, কৃষ্ণের বংশীবাদন শোনে এবং যমুনার জলে অবগাহন করে। অন্য একটি চিত্র হচ্ছে যেখানে সখীরা সকাল বেলা পরস্পরকে জাগিয়ে দেয় এবং ব্রজবধূরা দুগ্ধ দোহন করে। সর্বশেষ চিত্রটি হচ্ছে বর্ষার দিনে নৌকা-বিলাসের চিত্র। যেখানে গোপাঙ্গনারা কৃষ্ণের নৌকায় চড়ে ভয়ে কাঁপছেন। কবিতাটির একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি যেখানে পদাবলীর মাধুর্য পুরোপুরি পাওয়া যাবে:

"ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরই কূলে।

ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া-তরীর 'পরে,
হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে।"

বৈষ্ণব পদাবলীর সুর ও ঝংকার এবং তার প্রণয়লীলা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বক্তব্যে। "বাংলাভাষা পরিচয়" গ্রন্থে বাংলা ভাষার বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ পদাবলীর কথা দু'জায়গায় স্মরণ করেছেন। এগারো সংখ্যক অধ্যায়ে তিনি কবিতার গতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করতে যেয়ে বলছেন যে সংসারে যেমন চলৎশক্তি প্রয়োজন---আদান প্রদান না হলে সংসারে কাজ চলেনা, তেমনি ভাষার কাজ হলো মুখে মুখে কথাকে চালিয়ে দেওয়া; কিন্তু যখন কবিতায় আমরা আসি তখন বলার সঙ্গে সঙ্গেই বক্তব্য শেষ হয়ে যায়না, কবিতায় একটা বিশেষ গতিশীলতা থাকে। তাই আমরা দেখি কবিতা পাঠ করার পরেও কবিতা শেষ হয়না। গদ্যে যখন একটা কথা বলি তখন বলার মধ্যে সংবাদটি ফুরিয়ে যায় কিন্তু কবিতায় যখন সে কথাটিই বলি তখন ছন্দ এবং সুরের কারণে এবং শব্দের বিশেষ বিন্যাসের কারণে বলার কথা শেষ হয়েও শেষ হয়না। এর পর রবীন্দ্রনাথ পদাবলীর দুটি চরণ উদ্ধার করেছেন যে চরণ দুটির কথা পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি—

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমঝিম শবদে বরিষে।"

রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন, "এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকাশ্রিত কোনও দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায়না। এই খবরটির উপর ছন্দ যে দোলার সৃষ্টি করে দেয় সে দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।" দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর সুর এবং ছন্দে বিশেষ উল্লাস বোধ করেছিলেন। এই উল্লাসে অবশ্য পদাবলীর ব্যাখ্যা আসেনা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পাই।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টি থেকে পদাবলীকে বিশ্লেষণ করেছেন এখানে সেই দৃষ্টি ধরা পড়ে। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখছেন বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ সম্পর্কে, "পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে। তার একটা কারণ, এ-গুলো একটানা গল্প নয়। এই পদগুলোতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিন মাত্রার ছন্দে। দ্বৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনও পর্যন্ত ঐ দুই জাতের মাত্রাকে নানা প্রকারে সাজিয়ে বাংলায় ছন্দের লীলা চলছে। আর আছে দুই এবং তিনের জোড় বিজোড় মিলিয়ে পাঁচ কিংবা ন'য়ের অসম মাত্রার ছন্দ।" দেখা যাচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছিল কয়েকটি কারণে, একটি হচ্ছে এ-গুলো একটানা গল্প নয়, দ্বিতীয়, এ-গুলোতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত আছে। তৃতীয়, বাংলা ছন্দের বিচিত্র বিন্যাস এই পদাবলীতে পাওয়া যায়। এভাবে আমরা দেখতে পাই পদাবলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ মূলতঃ কাব্যগত কারণে, তত্ত্বগত কারণে নয়। অর্থাৎ কবিতায় যে হৃদয়াবেগের আশ্রয় থাকে বৈষ্ণব পদাবলীতে কবি সে হৃদয়াবেগের আবিষ্কার করেছেন; দ্বিতীয়তঃ কবিতার যে গঠন প্রকৃতি বা আংগিক, বাংলা কাব্যধারায় সর্বপ্রথম আংগিকের নব নব বিন্যাস তিনি লক্ষ্য করলেন বৈষ্ণব-পদাবলীতে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাবে আধুনিক বৈষ্ণব-পদ রচনা করেননি এটাই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা। সুর, ছন্দ এবং হৃদয়াবেগের অভিসার-যাত্রায় তিনি পদাবলীর সংগে একাত্ম অনুভব করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অভিষিক্ত হয়ে পদাবলী নতুন অর্থে সমৃদ্ধমান হয়েছে। কবি যে ভাবে পদাবলীকে বিবেচনা করেছিলেন তত্ত্বজ্ঞরা সে ভাবে কোনও দিন বিবেচনা করেননি। তাই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আমরা পদাবলীকে নতুন তাৎপর্যে আবিষ্কার করেছি, এই আবিষ্কারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতারই নতুন বিশ্লেষণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

৯

কবিতায় যে শব্দ ব্যবহৃত হয় কবিতার অনুসঙ্গে সে একটা স্পন্দন সৃষ্টি করে। এই স্পন্দনটি কবিতার ভাব-কল্প নির্মাণের জন্য অপরিহার্য্য। আমরা সাধারণ অর্থে যাকে ছন্দ বলি তাতে পাঠকের কাছে একটি বহিরঙ্গ-গত উপাদান সাধারণভাবে বুঝায়, কিন্তু মূলতঃ ছন্দটা বহিরঙ্গগত উপাদান মাত্র নয়। যেহেতু কবিতা জীবনের অনুশীলন এবং জীবনের অনুভূতির ভাব-প্রকল্প, সুতরাং ছন্দের স্পন্দনের মধ্যে এই অনুভূতি এবং ভাব-প্রকল্প-গুলো আবর্তিত হয়। এই কারণে ছন্দ কবিতার সংগে অঙ্গাগিভাবে জড়িত। কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ প্রাণস্পন্দন নির্ণয়ে সহযোগী মাত্র নয়, ছন্দ কবির চেতনাকে ধারণ করে থাকে। আমরা গদ্যে যখন কথা বলি অথবা আবার প্রতিদিন সংলাপে যে শব্দগুলো ব্যবহার করি তাতে শুধুমাত্র অর্থ প্রকাশের দায়ভার থাকে, কিন্তু কবিতায় যখন সেই শব্দগুলোই আসে তখন সাধারণ অর্থের অনেক বেশী সে প্রকাশ করে, আবার কখনও কখনও সাধারণ অর্থকে সে স্পর্শ করেনা, অসাধারণ তাৎপর্য্য নিয়ে সে পরিস্ফুট হয়। এই যে অতিরিক্ত অর্থ-দ্যোতনা, এই অতিরিক্ত দ্যোতনা কবি কোন্ কৌশলে প্রকাশ করেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় যে, শব্দে যখন গতি আসে, একটা বিশেষ স্পন্দন আসে তখন সেই গতি এবং স্পন্দন বক্তব্যের অনির্বচনীয়তাকে ধারণ করে। কবি ছন্দের কৌশলে এই স্পন্দন এবং গতি কবিতায় এনে থাকেন। তবে মনে রাখতে হবে যে অনির্বচনীয় কখনও অভাবনীয় নয়। অভাবনীয় হচ্ছে কিছুটা অস্বা-ভাবিক, যা আমরা প্রত্যাশা করিনি তাই। কিন্তু অনির্বচনীয় হচ্ছে যার দ্বারা আমরা মুক্ত হই, বিহ্বল হই, এবং ব্যাখ্যা করে যার অর্থ বোঝাতে পারিনা অথচ নিজে বুঝি। এভাবে দেখলে দেখবো যে প্রতিটি বস্তুর দুটি দিক আছে—একটি হচ্ছে তার বস্তু-পদার্থ আর একটা হচ্ছে তার রসের অনুভূতি। একটির পরিচয় পাই বিশ্লেষণে, বুদ্ধিতে, আর একটির পরিচয় পাই গতিতে, স্পন্দনে, ইঙ্গিতে, সুরে এবং রূপকে। একদিকে

হচ্ছে বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা আর একদিকে হচ্ছে রস-নিবেদনের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার উদাহরণ দিয়ে কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করবো। কবিতাটি হচ্ছে "চৈতালীর"র 'মানসী'। এখানকার বক্তব্য অত্যন্ত সাধারণ মনে হয়। কবি বলছেন যে রমণী শুধুমাত্র যে বিধাতার সৃষ্টি তাই নয়, পুরুষ তাকে আপন কল্পনায় মহিমময়ী ও দুর্লভ করেছে। এই কথা ক'টির একটি সুন্দর আবর্ত তিনি নির্মাণ করেছেন ধ্বনি-স্পন্দনের মাধ্যমে। ১৪ চরণের এই স্বল্পকায় সনেটে ৪০ বার নাসিক্য-ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে এবং কতকগুলো শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের পুনরাগমন লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে আমরা দেখতে পাই যে একটি অপূর্ব ধ্বনি-স্পন্দন নির্মিত হয়েছে যা আমাদের শ্রুতিতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে। শুধুমাত্র এই ধ্বনির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিতে যে একটি প্রাণ-স্পন্দন নির্মাণ করেছেন তাকে অতুলনীয় বলা যায়। চৈতালীর অন্য একটি কবিতা 'নারী'। সেখানেও আমরা দেখবো যে একই ধ্বনি-স্পন্দন একই রূপে আবর্তিত। এখানে ৫৬ বার নাসিক্য-ধ্বনির পুনরাগমন ঘটেছে। অন্যভাবে কথাগুলোকে বিশ্লেষণ না করে শুধু এই ধ্বনি-তাৎপর্যের মাধ্যমে এ কথা বলা যায় যে কবি তাঁর বক্তব্যকে এই ধ্বনি-স্পন্দনের উপর ন্যস্ত করেছেন। সাধারণ কথায় একে উপস্থাপিত করলে মনের মধ্যে এ কোনও গুঞ্জরণ রেখে যেতনা। তাহ'লে বলতে পারি যে কবি তাঁর মনের আবেগ অথবা বিশেষ একটি অনুভূতি প্রকাশ করবার জন্য তাঁর কথার মধ্যে আবেগের ধর্মকে সচল করেছেন। আবেগের ধর্মই হচ্ছে বেগ অথবা স্পন্দন এবং কবিতায় শব্দ যখন চরণে চরণে বিন্যস্ত হয়ে সেই বেগকে ধারণ করে, তখন মানুষের হৃদয়ের সুরের সঙ্গে তার মিল ঘটে। আমাদের পৃথিবীতে সর্বমুহূর্তেই এই স্পন্দনের লীলা-বৈচিত্র। দিনরাত্রির মধ্যে কতবার রং‌এর বদল হচ্ছে, কতবার কত বিচিত্র সুরে বাতাস তরঙ্গিত হচ্ছে, কতবার দৃশ্যগোচর প্রকৃতিগুলো আমাদের দৃষ্টিতে রূপ-রূপান্তর গ্রহণ করছে। এভাবে যখন আমরা সমস্ত বস্তুকে অনুভব করতে শিখবো তখন দেখবো যে বস্তুর একটি বস্তুত্ব আছে সন্দেহ নেই কিন্তু বস্তু যখন বস্তুত্ব হারিয়ে বেগকে ধারণ করে তখনই তা কবিতার সম্বল হয়। যে শব্দ কবি কবিতায় ব্যবহার করবেন, যেহেতু সে শব্দ কবির অনুভূতির বাহন তাই তার মধ্যে স্পন্দন থাকতে হয়। কবিতায় ছন্দই সেই স্পন্দন নির্মাণ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ'

নামক গ্রন্থে বলছেন যে কবিরাই কথাকে যখন ছন্দে বাঁধেন তখন মূলতঃ অন্তরে তাকে মুক্তি দান করেন। এভাবে কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই ছন্দ। কবি সেতারের উপমা এনে বলছেন যে, সেতারের তার বাঁধা থাকে কিন্তু তার থেকে সুর ছাড়া পায়। ছন্দ হচ্ছে সেই তারবাঁধা সেতার। কবিতার অন্তরের সুরকে সে মুক্তি দেয়। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ ছন্দকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে ছন্দকে কবিতার একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পদ বলে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকটে ছন্দ কোনও কৃত্রিম প্রথা নয়। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্তের বিশেষ অনুভূতিকে বিশুদ্ধ মুক্তি এবং বিচিত্র আকারে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু কাব্যের উপকরণ হচ্ছে শব্দ তাই শব্দের মধ্যে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন স্পন্দন সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্পন্দন তাঁর কবিতায় বিচিত্র আবেগ এনেছে। সাধারণ অর্থে একটি শব্দ নিশ্চল। যেমন সে অর্থের দিক থেকে নিশ্চল তেমনি সে তার ধ্বনির দিক থেকেও নিশ্চল, কিন্তু যে মুহূর্তে শব্দটি অন্য একটি শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে এবং এভাবেই ক্রমশ প্রথমে একটি চরণ, পরে অন্যান্য চরণের সঙ্গে সমন্বিত হচ্ছে তখন শব্দটিতে একটি স্পন্দন জাগে। এই স্পন্দনের যোগেই শব্দের অর্থ অপরূপতা লাভ করে।

এই যে স্পন্দন সে স্পন্দন বস্তুর জড়ধর্মকে বোঝায়না, সে বস্তুর প্রাণধর্মকে প্রকাশ করে। এক কথায় বলা যায় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিতে যে প্রাণের একটি কম্পন চলছে সেই কম্পন কবিতার স্পন্দনে যেন ধরা পড়ল। এই কারণেই আমরা যখন কবিতার অনুপ্রাস অথবা ধ্বনিবৈচিত্রের দ্বারা অভিভূত হই তখন মূলতঃ এই কম্পনের শিহরণ আমাদের হৃদয়ে লাগে এবং আমরা যেন সে মুহূর্তে বিশ্বের প্রাণ-চৈতন্যের কলকল্লোল শুনতে পাই। রবীন্দ্রনাথ এ কথাকেই নানাভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন যে ছন্দের কারণে কথার মধ্যে অনির্বচনীয়তা জাগে, তার ফলে কথা শেষ হ'লেও সুরের লীলা শেষ হয়না। সে সুরের লীলা একটি অক্ষয় জীবন চৈতন্যকে ধারণ করে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছন্দের দ্বারা কবিতার বিষয়টি আবর্তিত হয়। যেমন গাছের পাতা, তার সঙ্গে শাখার যোগ আছে, ফুলের যোগ আছে, অবশেষে গাছের যে মূল কাণ্ড তার সঙ্গেও যোগ আছে। পাতাকে আলাদা বস্তু হিসেবে কখনও ধরা যায় না, কেননা তার সজীবতা, তার লাবণ্য, তার সবকিছু মজ্জাগত

হয়ে আছে গাছের কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখার মধ্যে। ছন্দ এই পাতার মতো।। শব্দকে সে ধারণ করে, শব্দকে সে বহমান করে এবং নিগূঢ় প্রত্যয়ে শব্দের সঙ্গে সে চিরকাল জড়িত থাকে। তাই কবিতায় ছন্দের প্রয়োজন অসম্ভব রকম বেশী। এ প্রয়োজনটা হচ্ছে শব্দের অথবা ধ্বনির চলন নিয়ে। একেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। 'ছন্দ' নামক পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন যে কবিতার ছন্দ হচ্ছে মূলতঃ তার গতি, তার চাঞ্চল্য এবং তার লাবণ্য। ছন্দ ব্যাকরণ নয়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাধনা বিশ্লেষণ করলে এ কথার তাৎপর্য্য আমরা অনুভব করতে পারবো। আমাদের বাঙলা ভাষায় তিনিই সর্বপ্রথম কবি যিনি ছন্দের এবং ধ্বনির স্পন্দন অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এই স্পন্দনের মাধ্যমে বক্তব্যকে নানাভাবে তিনি আবর্তিত করেছেন এবং রেখাঙ্কিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের বিভিন্ন ভাবকে পরিস্ফুট করবার জন্য ছন্দের মাধ্যমে বিচিত্র অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যে কবির যে ব্যক্তিত্ব আছে সে ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েছে কবির কবিতার ছন্দের স্পন্দে। 'কড়ি ও কোমল' থেকে আরম্ভ করে 'নৈবেদ্য' পর্যন্ত যদি আসি, তাহ'লে দেখবো কত বিচিত্রভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টি-প্রাচুর্য্যকে ছন্দের মধ্যে বহমান করেছেন এবং কবির চিত্তের বিভিন্ন ভাব অনুভাব ঐ ছন্দের আবর্তের মধ্যেই ধরা পড়েছে। রবীন্দ্র-নাথের চিত্তের সজীবতা এবং উত্তাপ তাঁর ছন্দের স্পন্দনের মধ্যে যতটা অনন্যভাবে ধরা পড়েছে এমন অন্য কোনটাতে ধরা পড়েনি। আমি 'চৈতালী'র উদাহরণ উপস্থিত করেছিলাম যেখানে রবীন্দ্রনাথ নাসিক্য-ধ্বনির সুর ও মূর্চ্ছনায় একটি রসাবেশ নির্মাণ করেছেন সেখানে আমরা দেখতে পাই যে এই ধ্বনিগুলো কবিতায় অন্যান্য ধ্বনির সম্পর্কে এসে একটি বিশেষ ব্যঞ্জনায় মুখর হয়েছে। অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিতে, অনুপ্রাসে অসাধারণ বিচিত্রতায় অনবরত ধ্বনি-সমন্বয় নির্মিত করেছেন। "ন", "ম", "ঙ", "ং" এককভাবে এ সমস্ত ধ্বনির নিজস্ব ব্যক্তি-স্বরূপ আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অন্যান্য ধ্বনির সম্পর্কে এসে এরাই সুর-ঝংকার ও ছন্দ-মাত্রার ভিত্তি হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ধ্বনি-বৈচিত্র্য কবিতার শরীর নির্মাণ করেছে। যাঁরা শুধু-

মাত্র ছন্দ নির্মাণ করেন যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অথবা 'দশ মহাবিদ্যার' কবি হেমচন্দ্র, এদের কবিতার ছন্দকে নিছক আবরণের মতো মনে হয়, যেন তা বর্ণিত বিষয়ের আচ্ছাদন মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ছন্দকে যদি আচ্ছাদন বলি তাহ'লে বলবো এই আচ্ছাদন কাব্য-দেহকে সুষম মাধুর্যে উদঘাটিত করেছে এবং এই আচ্ছাদনও কবিতার দেহকে স্বীকার করেই মূল্যবান। ছন্দ যদি আবরণ হয় তাহ'লে তাকে এমন আবরণ হ'তে হবে যেন সে দেহের সত্যকে বহন করে। আবরণ আকর্ষণ করবে আমন্ত্রণ জানাবে একটি আবেগের চর্চায়। যেভাবে নববধূ সুসজ্জিতা হয়ে একটি স্পর্শের অপেক্ষায় থাকে তেমনি কবিতা তার ছন্দে এবং ধ্বনির আচ্ছাদন নিয়ে পাঠকের বিশ্বাস ও আনন্দের স্পর্শের কামনায় আকুল থাকে। রবীন্দ্র-নাথের কবিতা আবরণ নিয়ে, অলঙ্কার নিয়ে, ভূষণসম্ভারে আলোকিত হয়ে আমাদের চিত্তগ্রাহী হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় যে প্রকাশ-চেষ্টাকে পরিদৃশ্যমান এবং স্পন্দনময় করেছেন তাকে আমরা বলতে পারি কবির পক্ষে বিশুদ্ধ আনন্দ-রূপকে ব্যক্ত করবার প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'তথ্য ও সত্য' নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে যেখানে কবি আপন সাংসারিক প্রয়োজনের রূপকে প্রকাশ করেননা কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দ-রূপকে ব্যক্ত করেন, সেখানে কবি রস সৃষ্টি করেন। কবিতার বিষয় যাই হোকনা কেন, দৈনিক একটি তুচ্ছ বিষয়ও হতে পারে, কবি শুধু সেই বিষয়টাকে শব্দ-চিত্রে নকল করেননা, তিনি ছন্দে সুরঝঙ্কারে, বাক্য-বিন্যাসে, উপমা সংযোগে একটি অনির্বচনীয় সমগ্র বস্তু নির্মাণ করেন। এই অনির্বচনীয়-তাকে নির্মাণ করার চেষ্টাতেই কবিতায় ছন্দ, এবং ছন্দ স্পন্দের প্রয়োজন হয়। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। 'সোনার তরী'র 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতাটি একটি সুন্দর রসাবেশের কবিতা। সেখান থেকে নিম্নে একটি অংশ উপস্থিত করছি:

"নূতন-জাগা কুঞ্জবনে
কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে
বিবশ দশ দিক।

বাতাস ঘরে প্রবেশ করে,
ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরির
গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক
গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিতস্বরে
বাঁশিতে উঠে তান।"

দেখা যাবে যে এই উদ্ধৃতিতে কবি দু'টি ধ্বনির ঐক্য নির্মাণ করেছেন। একটি হচ্ছে 'ন' আর একটি হচ্ছে 'শ'। এর মধ্যে অন্যান্য অনেক ধ্বনি আছে কিন্তু প্রধানত এ দু'টি একটি আর একটির সঙ্গে ক্রমশঃ মিশ্রিত হয়ে একটি তন্ময়তা নির্মাণ করেছে। এই বিশেষ কৌশলের কারণে এ কবিতায় একটা বিশিষ্ট রসাবেশ নির্মিত হতে পেরেছে। ঠিক এভাবেই আমরা "মানসসুন্দরী" কবিতাটিতে দেখি যে বক্তব্যের বিশেষ বিশেষ চেতনা নিয়ে কবিতাটির ছন্দস্পন্দ নির্মিত হয়েছে—কোথাও উচ্ছলতা, কোথাও বিনম্র বিশ্রাম, কোথাও দ্রুতগতি, কোথাও বেদনা-নিপীড়নে মুহ্যমান। যেমন একটি চরণঃ "তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে।" এখানে 'আ' ধ্বনি একটি বিশ্রাম-নির্ভরতা এবং পেলব সৌকুমার্যকে প্রকাশ করছে। তেমনি আবার "শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে শুয়ে আছে।" এখানেও স্বরধ্বনির মুখরতায় একটি কর্মশূন্য বিশ্রাম চিহ্নিত হয়েছে। আমি পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছন্দকে কবিতায় বিভিন্ন ভঙ্গির গতি-সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন এবং সে উপলক্ষ্যে কবিতার শব্দের প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ বলে দু'টি বস্তুর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কবি বলছেন যে এই প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ নিয়েই কবিতায় আবর্ত নির্মিত হয়, এবং প্রদক্ষিণের চাইতে পদক্ষেপের উপর ছন্দের বিশেষত্ব নির্ভর করে বেশী। উক্ত 'ছন্দ' গ্রন্থে আমরা লক্ষ্য করি যে কবি ব্যাকরণের নীতি-নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেননি, কেননা তাঁর বিবেচনায় ছন্দের নীতি নিয়ম বা ব্যাকরণের দ্বারা কবিতার মূল্য নিরূপণ করা যায় না। ছন্দ

একটি চলমানতার উপর শব্দগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে, যার ফলে কবিতা গতি পায় এবং বক্তব্য বিশেষ রসাবেশে আবর্তিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার রচনা থেকে আরম্ভ করে একেবারে শেষকালের রচনা পর্যন্ত যদি আমরা অগ্রসর হই তাহ'লে আমরা কবিতায় ছন্দের পদক্ষেপের বিচিত্র পরিচয় পাবো। এই পদক্ষেপ কখনও দু' মাত্রার, কখনও তিন মাত্রার, কখনও চার, পাঁচ, সাত বা আট মাত্রার। এর মধ্যে কোনটা সম মাত্রার, কোনটা অসম মাত্রার। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন যে এই যে ধ্বনির চলমানতা আছে কখনও মৃদু, কখনও দ্রুতগতি, কখনও আবর্তসঙ্কুল, এই চলমানতার দ্বারাই কবিতার বিশিষ্টতা নির্ধারিত হয়। আমরা দেখতে পাই যে কবি ছন্দের মাধ্যমে অকিঞ্চিৎকরকে অপরূপ করেছেন এবং ছন্দস্পন্দে তথ্যকে নয়, সত্যকে পেয়েছেন। নিত্য অভ্যাসের স্থূল পর্দায় শব্দের দীপ্তি আবৃত থাকে। ছন্দ অথবা সুর সেই পর্দা সরিয়ে দেয়, শব্দকে গতিতে মুখর করে এবং অবশেষে আমরা একটি সত্যলোকে উপনীত হই। কবি ছন্দের সাহায্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন একটি বিশুদ্ধ সুষমাকে প্রকাশ করবার। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দের ঐক্য-সূত্রেই তথ্যের মধ্যে আমরা সত্যের আনন্দ পাই। তথ্য সংগ্রহ কবির কাজ নয়, কবি ছন্দঃবন্ধে কবিতাটিকে একটি সম্পূর্ণ একান্ত করে প্রকাশ করেন, যার ফলে সামান্য তথ্যও অসাধারণ হয়ে আমাদের চিত্তকে দোলা দেয়, যেখানে খুটিনাটির বিক্ষিপ্ততা বাঁধা পড়ে এবং ছন্দ একটি সমগ্রতায় নিরতিশয় ঐক্যটিকে প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ কোথাও রীতি-অনুসরণ নয়, অর্থাৎ পর্ব-বিন্যাস ও চরণের মাত্রাগত দৈর্ঘ্য বিবেচনা করে তিনি কবিতা নির্মাণ করেননি। তাঁর কবিতায় ছন্দ নিজস্ব রূপে পরিস্ফুট হয়েছে এবং পর্ব ও চরণের মাত্রা বিন্যস্ত হয়েছে বক্তব্যের স্বভাবের অনুকরণে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবশ্যই ছন্দের বিশ্লেষণ করা চলে এবং তার রীতি ও প্রকরণ নির্দিষ্ট করা যায়, কিন্তু ধ্বনির যে বিচিত্র কল্লোলে এবং আবর্তে কবিতার আবহ নির্মিত হয় তার কোনও স্থির ও ধ্রুব স্বভাব নেই। বক্তব্যের অপরিহার্যতায় এক একটি কবিতায় এক একটি ছন্দঃস্পন্দ গড়ে ওঠে এবং এভাবে ছন্দের দ্বারা কবিতার অর্থব্যঞ্জনার কাজ সম্ভবপর হয়।

রবীন্দ্রনাথ ছন্দের জাতি নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন তার চলনের দিকে দৃষ্টি রেখে এ কথা পূর্বেই বলেছি এবং দেখা যাবে যে রবীন্দ্রকাব্যের ছন্দের

প্রকৃতি-ভেদ চলনের ভেদের উপরই গড়ে উঠেছে। এই চলনের পার্থক্য অনুসারে ছন্দ সমচলনের হয়, অসমচলনের হয় এবং বিষমচলনের হয়। এক্ষেত্রে দুই মাত্রার চলন হ'লে সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলন হ'ল অসম মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলন হ'ল বিষম মাত্রার চলন। বাংলা ছান্দসিকগণ ঠিক এই চলনের পরিমাপ গণনা করে ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করেননি। এখানেই তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য, যে পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকরণবিদদের সঙ্গে কবির পার্থক্য। কবি পয়ার ত্রিপদীর মধ্যেও সমমাত্রার চলন আবিষ্কার করেছেন এবং আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তা পাঠ করেছি এবং গ্রহণ করেছি। সমুদ্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ পরিমাপ করা যায়না কিন্তু একটি কথা বলা যায় যে সকল অবস্থাতেই সমুদ্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান থাকে। যখন সমুদ্র স্থির থাকে তখনও তার যেমন দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আবার সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে তখনও তার এই একই দৈঘ্য প্রস্থ। এই দুই অবস্থার প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে--এক ক্ষেত্রে হচ্ছে নিশ্চলতা আর এক ক্ষেত্রে হচ্ছে তরঙ্গিত বিক্ষোভ। এই যে তরঙ্গিত বিক্ষোভ যাতে ভঙ্গির বৈচিত্র সম্পাদিত হচ্ছে, এই বৈচিত্র নিয়েই কবিতার ছন্দ। সংক্ষেপে বলা যায় কবিতার দেহ-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু ছিলনা, কবিতার হৃদয়ের দিক ছিল রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বস্তু। তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ছন্দের অত্যাচার স্বীকার করেননি, অবশ্য পদক্ষেপের শাসন মেনেছেন। কবির যে কোনও কবিতা পাঠ করে আমরা দেখতে পাবো যে এই পদক্ষেপ বাইরের কোনও জিনিষ নয় তা কবিতার অন্তরের বস্তু। এই অন্তরের বস্তু একমাত্র কবিই উপলব্ধি করতে পারেন কিন্তু অকবি বাইরের শাসন মেনে চলেন বলেই শক্তির বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই শাসন থেকেই বাংলা কবিতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই তাঁর স্বভাব এবং স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে কবি শব্দের গতিবেগকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ আমি এখানে পর পর উপস্থিত করছি তাতে দেখা যাবে যে এক কবিতার চলনের সঙ্গে অন্য কবিতার চলন মেলেনা :

১. বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
 আগের মতো,
 জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা
 জীবনহত।

আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না—
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর।
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর।

২. ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহতপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত,
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি।
কখনো ফুল দুটো আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে পড়িত রে নিশাসি।

৩. একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারি দিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিনবায়ুভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া।

৪. আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে
বহায় যদি।
আবার দুটি নয়নে লুটি
হৃদয় হরে দিবে কে?
আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে?

৫. সকাল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্তছবি
কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী-পানে,
বিদায় নাহি চায়।

বাংলাশব্দ তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বলেছেন যে, বাংলা স্বরবর্ণ সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘ মানেনা কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় '৲' শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচচারণে জ এর 'অ' এবং চা এর 'আ' আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্তী '৲' এর ক্ষতিপূরণ করে থাকি। 'জল' এবং 'জলা', চাঁদ এবং চাঁদা শব্দের তুলনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। এই নিয়মটি বাংলায় ধ্বনির একটি স্বাভাবিক নিয়ম এবং চিরকাল বাঙালী কবিরা বাংলা ছন্দে প্রাক '৲' স্বরকে দুই মাত্রার বলে গণ্য করেছেন। তাই ওজনে জল অথবা পাতা একে অন্যের চেয়ে কম নয় বরঞ্চ সমান। ইংরেজীতে অবশ্য ব্যাপারটি অন্য রকম। তাতে জল এক সিলেবল কিন্তু পাতা দুই 'সিলেব্‌ল্‌' কিন্তু বাংলাতে কোনও দিন ইংরেজী 'সিলেব্‌ল্‌' এর গণনা গ্রাহ্য হয়নি কেননা বাংলার ধ্বনি-প্রকৃতি সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতি বিমুখ। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধে এ ব্যাপারে বিস্তৃত পরীক্ষা করেছেন এবং অবশেষে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন সে সিদ্ধান্ত বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সত্য সিদ্ধান্ত। তিনি বলেছেন যে আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতঃই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনও বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে মেপে এ কাজ করিনে, অন্ততঃ সজ্ঞানে নয়। এ ভাবেই আমরা দেখবো যে কবি ছন্দকে কবিতার জন্য আরোপিত কোনও ভূষণ হিসাবে গ্রহণ করেননি, শিল্পরূপের প্রয়োজনে কবিতার চলমানতা নির্মাণ করবার জন্য তিনি ছন্দের দ্বারা কবিতায় গতি এনেছেন। যেমন আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার কিন্তু তাকে চলমান করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ ; তেমনি কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের নিজস্ব ভার আছে কিন্তু কবিতার ছন্দের মধ্যে যখন শব্দগুলো বিন্যস্ত হয় তখন তা নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র হয় এবং এই বিচিত্র হওয়ার মধ্যেই তার সৃষ্টি-ধর্ম ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ছন্দের অর্থ করেছেন 'ইচ্ছা' বলে—'ছন্দ মানেই ইচ্ছা'। মানুষের ভাবনা রূপ গ্রহণের ইচ্ছা করেছে নানা শিল্পে, নানা ছন্দে। কত বিলুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে বিস্মৃত যুগের ইচ্ছার বাণী আজও ধ্বনিত হচ্ছে তার কত চিত্রে, জলপাত্রে, কত মূর্তিতে। মানুষের আনন্দময় ইচ্ছা সেই ছন্দোলীলার নটরাজ, ভাষায় ভাষায় তার সাহিত্যে সেই ইচ্ছা নব নব নৃত্যে আন্দোলিত। যে কোনো ভাষায় যে শব্দ থাকে তার অর্থ থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরও থাকে। ভাষায় শব্দগুলো অর্থ বহন করে কিন্তু স্বর-বৈচিত্রে বিভিন্ন ছন্দে তারা রূপ গ্রহণ করে। বাংলা ভাষার একটি শব্দের যা অর্থ ইংরেজীতে অথবা অন্যান্য ভাষায়ও অবিকল সেই অর্থ-বাচক শব্দ আছে। যেমন গাছ্ বললে অর্থের দিক থেকে আমরা যা বুঝি, ট্রী' বললেও অবিকল তাই বুঝি। কিন্তু 'ট্রী' একই সুরের নয় যদিও তাদের অর্থ এক। তেমনি আবার শুধু বাঙলা ভাষাতেও 'গাছ্' এবং 'বৃক্ষ' অর্থের দিক থেকে একই, কিন্তু সুরের দিক থেকে এক নয়। কবিতায় শব্দ যখন ব্যবহৃত হয় তখন শব্দের এই সুর কবিতায় শিল্প রচনা করে, সেই শিল্প আমরা ধ্বনির শিল্প বলতে পারি যাকে প্রচলিত অর্থে ছন্দ বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় শব্দের এই ধ্বনি-রূপকে বিচিত্রভাবে আবিষ্কার করেছেন এবং শব্দের অর্থকে এই ধ্বনির উপর নির্ভরশীল করেছেন। এর ফলে তিনি পণ্ডিতদের মতো অর্থের মহাজন হননি কিন্তু রূপরসিক বা সুররসিক হয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ধ্বনির সাহায্যে প্রাণের গভীর কথাকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

অবশ্য ছন্দের এই পদক্ষেপ যদিও কবির সৃষ্টিতে স্বাভাবিক কিন্তু তার মধ্যে কবিশিল্পীর শিল্পগত কৌশলও আছে। এই শিল্পগত কৌশলের কারণে ছন্দ-গতির স্বাভাবিকতায় কবিতার সৌষ্ঠব গড়ে ওঠে। এ কথাকেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন "শরীরে স্বাস্থের মতোই কবি ছন্দকে ভুলে থাকে, ছন্দ যখন তার যথার্থ আপন হয়।"

সমাপ্ত